প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

রেয়ার প্রিন্টস
৪-বি, সীতানাথ রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিন্টার্স

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

বাঁধাই
ইউনিভার্সাল বুক বাইণ্ডার্স

দাম : পাঁচ টাকা

এই উপন্যাসটি ঘটনা-প্রধান নয়, ভাবনা-প্রধান। নায়ক-বিচার করে দেখতে চেয়েছে, কোন্ অভিজ্ঞতা তাকে কী দিল! কে তাকে কোথায় পৌঁছে দিল! জীবন কেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই তার মনে উঠেছে এবং উত্তরও সে খুঁজেছে। এই জিজ্ঞাসা দিয়ে উপন্যাসের শুরু, সন্ধানে তার ব্যাপ্তি এবং সমাধানে সমাপ্তি। কিন্তু সে সমাধান হয়ত কতকটা মন-গড়া, তার যা-কিছু মূল্য, তা তার নিজের কাছেই। এই গ্রন্থের সব কথা নায়কের, এই ভূমিকামাত্র লেখকের।

ভাদ্র ১৩৬৬
কলিকাতা

সন্তোষকুমার ঘোষ

এই লেখকের :

কিনু গোয়ালার গলি
নানা রঙের দিন
মোমের পুতুল
পরমায়ু
পারাবত
শুক সারী
কড়ির ঝাঁপি
চীনে মাটি
দুই কাননের পাখি
কুসুমের মাস

বন্ধু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে

সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচনা
থেকে সমাপ্তি অবধি এই গ্রন্থটির
প্রতি যাঁর সাগ্রহ লক্ষ্য ছিল

এই গ্রন্থের রচনাকাল

পৌষ ১৩৬৫—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

না, নতুন কান্না নয়, পুরনো কান্নাটাই।

সৌরেশবাবু কলম থামিয়ে একবার শুনলেন। পুরনো কান্নাটাই। এখন আর তাকে কান্না বলে চেনা যায় না। ক্লান্ত করুণ গানের মত লাগছে। যেন অনেক দূরে, অন্ধকারে, কয়েকটি সরু তারে দুর্বল হাতে, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে, কেউ ছড় টানছে; টানছে, টানছেই। থামছেও, ভয়ে ভয়ে। অদৃশ্য অসংখ্য শ্রোতাদের মুখের দিকে চেয়ে জেনে নিতে চাইছে, কেমন হল। অশরীরী শ্রোতারা যেন মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'ভাল, ভাল, খুব ভাল।' উৎসাহ পেয়ে সে ছড় তুলে আবার টানল।

কিংবা, একটি স্বরের সুতোয় সে যন্ত্রণার কয়েকটি লাল পাপড়ি গেঁথে তুলছে।

কলম থামিয়ে সৌরেশবাবু যেন সেই যন্ত্রণার স্বরূপটা ধরতে চাইলেন। দৈহিক—এ কি শুধু দৈহিক যন্ত্রণা? একটি প্রাণকে পৃথিবীতে আনতে শারীরিক কষ্ট কি এত? কী জানি। সৌরেশবাবু ফের কলমটা তুললেন।

ভারী প্যাড, দামী কাগজ, নির্ঝর লেখনী। সৌরেশবাবুর লিখতে ভাল লাগছিল। তিনি এই লেখাটার নাম দিয়েছেন, 'দিনান্তলিপি'। আজ বিকালে ওরা যখন সতীকে কোণের ঘরে নিয়ে গেল, তখন বাড়ির আর সকলের মত সৌরেশবাবুও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। পিসিমাকে বলেছিলেন, "নার্স ডাকি? ডাক্তারকে খবর দিই?"

পিসিমা ওর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। সেই দৃষ্টিতে হয়তো কিছুটা কৌতুক মিশে ছিল।—"না, তোকে কিছু করতে হবে না, তুই চুপ করে বসে থাক্ দেখি। বন্দোবস্ত যা করবার, আমি করছি।"

সৌরেশবাবু আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছেন ভিতর থেকে। এই ঘরটা তাঁর নিজস্ব; তাঁর রুচি দিয়ে সাজানো। এখানে তিনি অবসর সময়ে বসে পড়াশুনা করেন। চেয়ারটাতে গা

ফেলে দিতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তিতির পাখির মত স্মৃতি উড়ে আসে, তারা ওঁর ভিতরটাকে ঠোকরায়, যন্ত্রণা দেয়। কখনও কখনও ওদের নরম পালকের ছোঁয়ায় সুড়সুড়িও লাগে, সুখাবেশে সৌরেশবাবুর চোখ বুজে আসে।

আজও, এই বিকালে সতী যখন ওদিকের কোণের ঘরে ছটফট করছে, সৌরেশবাবু জানলেন, তাঁর কিছুই করবার নেই, কেননা সব ভার পিসিমাই নিয়েছেন—সেই পিসিমা, যাঁর পরনে ধবধবে সাদা থান, আর খুব চওড়া, অসম্ভব ফরসা কপাল, বয়স আর বৈধব্য যাঁকে ব্যক্তিত্ব দিয়েছে, সেই পিসিমার কথায় আশ্বাস পেয়ে সৌরেশবাবু তাঁর ঘরে এসে স্মৃতিকে আবাহন করলেন, 'তিতির পাখির মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তোমরা আমার মনের আঙিনা ছেয়ে ফেল, আমাকে খুঁটে খুঁটে খাও।' এল ওরা একে একে, দলে দলে। আবার উড়ে গেলও। কেননা, সৌরেশবাবু মাঝে মাঝে নড়ে উঠছিলেন, যতবার সতীর গোঙানি কানে আসছিল ততবার চমকে উঠছিলেন, আর ভয় পেয়ে তিতিরি পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। সতী যে ঘরে আছে, আর সৌরেশবাবু যেখানে, দুটির মাঝখানে যোজকের মত একটি সরু বারান্দা। সতী কষ্ট পাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, কখনও স্ফুট, কখনও অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠছে, উৎকণ্ঠার আঁকশি বাড়িয়ে সেই শব্দের বিষফলগুলি সৌরেশবাবু পেড়ে আনছেন।

কেন? তিনিও চেখে দেখবেন বলে? দায় তাঁরও অর্ধেক, তাই যন্ত্রনার ভাগ নেবেন?

কিন্তু পিসিমা নিতে দেবেন না যে।

অগত্যা সৌবেশবাবুকে তাঁর লেখার খাতা খুলে বসতে হল। একবার কান খাড়া করে কী যেন শুনতে চেষ্টা করলেন সৌরেশবাবু, তারপর খসখস করে লিখে গেলেন।

"কখনও যদি জানতুম বয়েসের দুপুরে পৌঁছেই নিজের কথা লিখতে ইচ্ছে হবে তবে আগে থেকেই ডায়েরি-রাখা অভ্যাস করতুম। যা দেখেছি, যা ভেবেছি, সব তাতে লেখা থাকত। কলম হাতে নিয়ে নিজেকে এমন অসহায় মনে হত না।

"মন যদি সিন্দুক হত, সব স্মৃতি তাতে বন্দী থাকত। মাঝে মাঝে তাদের রোদে তুলে ধরতুম, নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিতুম পুরনো কালের। এখন দেখছি, আমার মন নেহাতই ছেঁড়া ঝুলি, কুড়িয়ে কুড়িয়ে সেখানে যা থুয়েছি, তাই হারিয়েছি, অনেক খুদকুঁড়ো আর কানাকড়ির সঙ্গে অমূল্য মণিও গিয়েছে।

যা অপ্রিয় তার বেশিটাই ভুলেছি, যা মধুর তারও অনেকটাই। মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন, কেন।

"তবু দু-একটা রয়ে গিয়েছে। ছোট ছোট নুড়ি, জানি নে তার দাম কী। তারই কয়েকটা আজ এই মরা-আলো বিকালে মুঠোয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কমবয়সী মেয়েরা যেমন কড়ি খেলে।

"এই খাতাটার নাম দিয়েছি 'দিনান্তলিপি।' একবার ভেবেছিলুম নাম দেব 'এই বিকালে'। কিন্তু সেটা খুব হালকা হত। পরে ভেবে দেখলুম, নতুন নামটাই উপযুক্ত।

"নামকরণের সমস্যা গিয়েছে, কিন্তু আমার সংশয় যায় নি। একে কী রূপ দেব—কাহিনীর? কিন্তু আমার জীবন নিয়ে কী কাহিনী হয়? একালের ক'জনের জীবন নিয়েই বা হয়! চমক কই, রুদ্ধশ্বাস কী হয়-কী হয় কই, এতো শুধুই স্রোতে ভাসা। এ-কালে বহু উপন্যাসই তাই নিরুপসংহার। প্রথম অধ্যায়ের নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে এখন কদাচ পরিণতিতে সন্ন্যাসী হয়ে ফিরতে দেখি নে। বিয়োগান্ত কাহিনীর কল্পনাও বদলেছে। শুধু মৃত্যু নয়, জীবন্মৃত্যু। যে-সে চিতা সাজালেই হবে না, জ্বালতে হবে রাবণের চিতা, যা অহর্নিশ জ্বলে।

"সেই চিতা, ভেবে দেখেছি, মন। জ্বলে, জ্বলে, জ্বলে। ছোট সুখ, ছোট তৃপ্তি, আশা-পুবনের ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোটার মধ্যেও জ্বলে। যেন আরও লকলকে হয়ে ওঠে। আগুন জ্বলে শুকন পাতায়, মন রগে রগে রক্তের চলায়। আশাও জ্বলে, ভয়ে ভয়ে নিবে নিবে, পাতার আড়ালে জোনাকির মত। বাসনা? জবাফুলের মত।"

আরও কী জ্বলে, সৌরেশবাবু কলম থামিয়ে ভাবলেন। ক্লিপের খাঁজে ভাবুক একটি ধারাল দাঁত, একটি খোঁজবাতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মনের ভিতরটা দেখলেন। মন আগুনের জ্বালার কথা লেখা কি সহজ!

একবার সৌরেশবাবু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, তাঁর আর সতীর ঘরের মধ্যে যেটা যোজক। এখন আর এখানে রৌদ্র নেই, কিন্তু খানিক আগেও ছিল, সেই স্মৃতিতেই বাঁধানো শানটা যেন তেতে আছে। শখ করে লাগানো লতাটি এখন পল্লবিত, ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে আধেক বারান্দায় ছাই-ছাই ছায়া রঙ দিয়ে আলপনা রচনা করেছে। এখন, ঠিক এখন, কোনও শব্দ নেই। সতীর গোঙানিও শোনা যায় না। কী হল সতীর?

, তাহলে এই সৌরেশ চমকে উঠলেন? সতীর কী হল। যে কষ্টটা এতক্ষণ ধ.র ফণা তুলে ফুঁসছিল, সে হঠাৎ এমন নেতিয়ে পড়ল কেন। সতী, সতী কি তবে সব যন্ত্রণার পারে পৌঁছে গেল? একটি জন্মের মাধ্যম হওয়ার দায়িত্ব যে নিয়েছিল, সেই সত্যরক্ষা না করেই সে চলে যাবে? বিশ্বাস হয় না।

তবু লম্বা লম্বা পা ফেলে সৌরেশ বারান্দাটুকু পার হয়ে গেলেন। এই ভয়টা নিতান্তই মায়ুজ। তিনি জানেন, পরান্ত বিচারশক্তির বুকের উপর দিয়ে সরীসৃপ দুর্বলতাটুকু হেঁটে যাচ্ছে, তবু থামতে পারলেন না। ভেজানো দরজাটা ঠেলে একেবারে ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সতী শুয়ে আছে। তার বুক অবধি চাদরে ঢাকা, চুলগুলি খোলা, চোখ দুটি নিমীলিত, ছোট বুকটিতে ছোট ছোট ঢেউ তুলে সে ঘুমচ্ছে। শুধু তার ঠোঁটের কোণে কালো একটি দাগ, এই খানিক আগেই বুঝি যন্ত্রণায় দাঁত দিয়ে সেখানটা চেপে ধরেছিল, কেটে গিয়ে কষের মত রক্তের একটি ধারা নেমেছে। সেই ধারাও বেশি দূর এগোতে পারে নি, চিবুকের কাছাকাছি এসে ক্লান্ত হয়ে সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

পিসিমা সতীর শিয়রে। ঝুঁকে পড়ে কী দেখছিলেন। ডাক্তার পাতলুনের পকেটে হাত রেখে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর একটি নার্স, যে তার নিঃশব্দ জুতোর গোড়ালিতে তৎপরতাকে জুড়ে দিয়েছে, কড়কড়ে ইস্ত্রি সাদা কাপড়টা দিয়ে কটিতে নিপুণতাকে কষে বেঁধেছে, সে অবাক হয়ে চাইল। ডাক্তারের চোখে তিরস্কার। সৌরেশ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না, সোজা এগিয়ে গিয়ে একখানি হাত রাখলেন সতীর পাণ্ডুর কপালে, শিউরে উঠলেন, এত হিম কেন।

"এত চুপচাপ হয়ে আছে কেন?" ফিসফিস করে নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রশ্নটা যে একটু বোকার মত হল, সেটা সৌরেশবাবু তাঁর কণ্ঠস্বর নিজের কানে যেতেই টের পেলেন। কনুয়ে হাসি লুকিয়ে নার্স জবাব দিল, "কষ্ট পাচ্ছিল, আমরাই তাই ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।"

পিসিমা বললেন, "তুই ঘরে যা খোকা। ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা তো রয়েছি।"

ভয় নেই। বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিজেই কথাটা আর-একবার উচ্চারণ

করলেন সৌরেশ, যেন ভয়-তাড়ানোর ওটা জপমন্ত্র। খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে লাগল। এবার শীত বুঝি তাড়াতাড়ি পড়বে।

লেখার টেবিলে ফিরে এসে ফের খাতাটা খুললেন। কী লিখবেন। তাঁর আজ বিকালের এই যুক্তিহীন ভয়টার কথা? নিজের কথা? পারবেন না। কেননা সব কথা লেখা যায় না। কনফেশান লেখা, সৌরেশ মনে মনে বললেন, আমাদের এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদের ধাতে নেই। আমরা নিজেকে বড় বেশি লুকিয়ে রাখি, কুন্ঠিত কিশোরী যেমন করে রাখে তার যৌবনচিহ্ন: কিংবা তাকে লোকোত্তর তুষারশিখরে তুলে ধরি। সাধারণ নিয়মের আমি ব্যতিক্রম, এ-স্পর্ধা আমার নেই, সৌরেশ বললেন নিজেকে, সমাজের হুঁকো বন্ধ হওয়ার ভয় আমারও আছে।

সেই মুহূর্তে প্রবল একটা হাওয়ার ঝাপটায় জানলা-দরজা থরথর করে কেঁপে উঠল। কনকনে হাওয়া লাগল মুখে চোখে। সৌরেশবাবুর আশঙ্কা হল, দম বন্ধ হয়ে তিনি মরে যাবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন লেখারও বিষয় পেয়ে গেলেন—মৃত্যু-ভয়। পাশের ঘরে একটি জীবনের আবির্ভাব যখন আসন্ন, তখন সৌরেশবাবু দিনান্তলিপিতে তাঁর মৃত্যুভয়ের কথা লিখতে বসলেন, এই ঘটনাটার মধ্যে কোথায় একটা পরিহাস্যতা আছে, সেটা তাঁর নিজের কাছেও ধরা পডল।

সৌরেশবাবু লিখলেন, "মৃত্যুর সাধ আমার জীবনে বার বার এসেছে। প্রথম যখন এসেছে, তখন জানতাম না, জীবন কি! এখনই কি জানি? জীবন কি দৃষ্টি-শ্রুতি-স্বাদ-ঘ্রাণ-স্পর্শ? শুধু ইন্দ্রিয়বোধ? না। রক্তস্রোত, শিরার কাঁপন, হৃৎস্পন্দ? তাও না। জীবন শুধু সুখস্বপ্ন বা তৃপ্তির মৃগয়াও না। সব পাওয়াতেই কি তার সার্থকতা? হয়তো। কিন্তু পাওয়ার সংজ্ঞা কই, সবের-ই বা ঠিকানা কী।

"আমলকী গাছটির এক রাশ পাতা আমার লেখার প্যাডটির উপর ঝরে পড়ল। ফুঁ দিলুম, উড়ে গেল, দূরে নয়, টেবিলের পায়ার কাছে, বারান্দার কোণে কোণে অল্প অল্প হাওয়ায় কাঁপতে থাকল। আনন্দের একটা রূপ দেখলাম, মৃত্যুরও। এই পাতাগুলো ঝরেছে, মরেছে, কিন্তু ফুরয় নি। এখনও হাওয়ায় কাঁপে, নাচে, উড়ে উড়ে বেড়ায়। নিরলম্ব, নিরাশ্রয়, নিবৃন্ত, কিন্তু নিবৃত্ত নয়। প্রাণোত্তর একটা জীবনের স্বাদ পেয়েছে। কাল সকালেই ঝাঁট পড়বে, এরা

জমা হবে আঙিনায়, শিশিরে ভিজবে, বর্ষায় পচবে, সার হয়ে মিশে যাবে মাটিতে, ফের বেঁচে উঠবে কচি কচি পাতায়। নতুন জন্ম পাবে।

"যে প্যাডের পাতায় আজ এত কথা লিখছি, কতদিন সেটাকেই টেনে নিয়ে কত দিন জীবনের শেষ চিঠি লিখতে চেয়েছি। শুভ্র মসৃণ শূন্য পাতায় ধীরে ধীরে অক্ষর পড়েছে, আমার এ কাজের জন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।' তার পরে আর এগয় নি। একটা পোকা উড়ে উড়ে আলোটার ঢাকনার উপরে বসেছে, তারও মৃত্যুর সাধ, সেই চঞ্চল প্রাণের বিন্দুটাকে প্রশ্ন করেছি, আর কী আর কী লেখা চলে। উত্তর পাই নি। চৌকাঠের ওদিক থেকে একটা ইঁদুর লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছে, তার পিছনে আর একটা, সিমেণ্টের মেঝে সাঁতরে সাঁতরে দরজার কোণের গর্তটায় ডুব দিয়েছে। আরও আছে নাকি। তাড়াতাড়ি পা দুটো টেনে চেয়ারে তুলে নিয়েছি, অসঙ্গতিটা মনের কাছে ধরা পড়তেই হেসে উঠেছি। মৃত্যু-সংকল্প নিয়ে শেষ চিঠি যে লিখতে বসেছে, তারও মৃত্যু-ভয়!

"এর পর আর মরা চলে না। পরদিনই মিস্ত্রী ডেকে দরজার কোণের গর্তটা বন্ধ করেছি।"

এক সঙ্গে অনেকখানি লিখে ফেলে সৌরেশবাবু ক্লান্তিতে পিঠটা হেলিয়ে দিলেন। হিম-ঝাপসা মাঠের ওপারে নীলাভ গাছের সারি। ছোট টেবিলটা সরিয়ে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন। আলোর শেডটা বাঁপল। এবার তিনি বিস্তৃত হয়েছেন, তাঁর ছায়া পড়েছে গোটা বারান্দা জুড়ে। আর দেয়ালের অত কাছাকাছি এসেছেন বলেই অসংখ্য, প্রায় অলক্ষ্য ছোট ছোট ছবি দেখতে পেলেন। এগুলো কে কবে কতদিন ধরে এঁকেছে কে জানে। একটা পেরেকের আঁচড়, একটু পানের কষের ছিটে, পেনসিলের শিষ ঘষার দাগ—সব মিলে অদ্ভুত একটা আকৃতি নিয়েছে। সৌরেশবাবুর পরিচিত কোন কিছুর সঙ্গে তার মিল নেই।

যে শব্দটা ঘুমিয়ে পড়েছিল সেটা আবার যেন জেগে উঠেছে। একটা তীব্র কর্কশ আওয়াজ শুনে সৌরেশ চকিত হয়ে উঠলেন। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

আবার এসে দাঁড়ালেন সেই রুদ্ধ ঘরের দরজায়। এবার ঢুকতে পেলেন না। সেই নার্স কী কাজে নিজেই বাইরে আসছিল, একেবারে তার মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

নার্স কথা বলল না, কিন্তু তার মুখের পেশি আর কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে এক

নজর চেয়েই সৌরেশ ওর মনের কথা পড়তে পেলেন।—"কী, আবার কী," নার্স জিজ্ঞাসা করছে নিঃশব্দে।

সৌরেশ, নিজেকে যিনি এতকাল ধী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করে এসেছেন, মনে মনে স্বীকার করলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব আসলে এক তাল মোম বই কিছু না, সামান্য ভয়ের আঁচ লেগে তা গলে যায়।

বললেন, "নার্স, ও কি—ও কি খুব বেশি কাবু হয়ে পড়েছে?"

নার্স বলল, "না তো।"

"কষ্ট পাচ্ছে না?"

"পাচ্ছে। অন্য সব মেয়ের চেয়ে বেশি নয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

শেষ করা কথাটা, নার্স বলল জোর দিয়ে যেন ধমকের সুরে। সৌরেশ একটু হকচকিয়ে গেলেন। অথচ মেয়েটি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট—বিদ্যায় মাথায়। ব্যক্তিত্বে কি বড়? সৌরেশ এক মুহূর্ত যেন বিচার করে দেখলেন। ভিতর থেকে আহত পৌরুষ গর্জন করে বলল, 'না, কখনও নয়।' তবু সৌরেশ অনুভব করলেন, এখন, সময়ের এই খণ্ড অংশে এই মেয়েটি তাঁর তুলনায় সবলা। সে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। সে যা বলবে, তাই তাঁকে শুনতে হবে। সে যদি সৌরেশকে ঘরে ফিরে যেতে বলে—সৌরেশ, যদিও তিনিই গৃহস্বামী, যাবেন।

তবু পশ্চাদপসরণ করবার আগে শেষ গুলি ছোঁড়ার মত সৌরেশ বললেন, "খুব বেশি চিৎকার করছে না কি?"

"ইঞ্জেকশন দিয়ে পেইনটা আমরাই বাড়িয়ে দিয়েছি" নার্স জবাব দিল। দাঁড়াল ভিতরে গিয়ে, ওটাই তার 'কোর্ট', বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সৌরেশের মুখের ওপর দরজা ভেজিয়ে দিল।

সৌরেশ জেগে ছিলেন।

চেয়ারে মাথা রেখেছিলেন, কিন্তু পা দুটি তুলে রেখেছিলেন সামনের একটি টুলে। ঘুমতে পারতেন, ইচ্ছে হলে। কিন্তু ইচ্ছা হয় নি। সামান্য একটু অসুবিধাও ছিল, কয়েকটা মশা ঘুরে ঘুরে আসছিল একবার ওঁর কানের গোড়ায়, একবার ঘাড়ের নীচে, একবার পায়ের পাতায় বসছিল। ঝিমুনি এলেও সৌরেশ মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে বসছিলেন, কেননা কখনও পায়ের পাতা কখনও ঘাড়ের কাছে জ্বালা করে উঠছিল। অন্যদিন বিরক্ত হতেন, মশা কয়টাকে মারবেন বলে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, আজ হলেন না। সৌরেশবাবু আজ জেগে

থাকতেই যে চান। মশা কটার প্রতি তিনি বরং কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলেন। ওদের সঙ্গে তাঁর ভাবনার চরিত্রগত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। যে রাত সর্পদষ্টের মত ক্লান্তিতে ঢলে ঢলে পড়ছে, তাকে ওরা দংশনে দংশনে জাগিয়ে রাখে সৌরেশের চিন্তা যেমন রাখছে তাঁকে।

সতী তখনও থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছিল। সৌরেশবাবু প্রত্যেক বার চমকে উঠছিলেন। সোজা হয়ে বসছিলেন। ভাবছিলেন, ভিতরে যাবেন কি না। যান নি। ভরসা পান নি। নার্সের ঠাণ্ডা দৃষ্টির কথা স্মরণ করে নিরস্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি গিয়েই বা কী করবেন! দরকার থাকলে ওরা তো ডাকতই, পড়লে তো ডাকবেই।

অন্য স্বামীরা এই সময়ে কী করে, সৌরেশ চিন্তা করলেন। তারা কি ঘুময়, চেয়ারে ঠেস দিয়ে টুলে পা তুলে, কিংবা বই পড়তে চায়? বই কি তখন পড়া যায়? ছাপার হরফে মন বসে? তার চেয়ে ভাবনা অনেক সহজ, ঘুমতে না পেরে, ঘুমতে না চেয়ে সৌরেশ এখন যা করছেন। তিনি মনে মনে সতীর ওই কান্নাটা বিশ্লেষণ করছেন। এই যন্ত্রণার স্বরূপ কী। এ কি মৃত্যুযন্ত্রণার সোদর? সতীর কাছে এখন তো যাবার উপায় নেই, সম্ভবত তার এখন জ্ঞানও নেই, নইলে সৌরেশ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতেন।

অসুস্থ অবসন্ন চেতনা নিয়ে আরও তলিয়ে গিয়ে সৌরেশবাবু প্রসব-বেদনার সঙ্গে জন্মান্তরবাদের একটা সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পেলেন। যে জাত তার মৃত্যু যেমন, মৃতের পুনর্জন্মও তেমনই ধ্রুব। প্রথমটি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, নতুন প্রমাণনিরপেক্ষ। দ্বিতীয়টি কেবল অনুমান। অন্যথা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না। যে ফাঁকটুকু থাকে, মানুষ তার কল্পনা দিয়ে সেটুকু ভরে দিয়েছে। এই ধারণা যদি খাঁটি হয়, তবে এই মুহূর্তে, যখন এই গৃহে একটি জন্ম আসন্ন, তখন অন্যত্র কোনখানে একটি আয়ু ফুরচ্ছে, মৃত্যু ঘটছে। আর সতী যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা জীবন আর মৃত্যুর মধ্যবর্তী চৌকাঠ, ওর মুখে চৌকাঠের ওপারের হিমের ঝাপটা লাগছে. নীল হয়ে যাচ্ছে সতী, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। তবু ফিরতে পারছে না, ওর যে নব-জীবনকে আবাহন করার দায়।

সৌরেশ আর ভাবতে পারছিলেন না। মাথা ঝিমঝিম করছিল। তিনি অভ্রান্তভাবে অনুভব করছিলেন, সতী মরবেই।

মরবেই, তবে সেই মৃত্যুটা একটু ভিন্ন রকমের হবে। প্রচলিত অর্থে

আমরা যাকে মৃত্যু বলি, অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়া, দেহ নিথর হওয়া, সে-রকম কিছু নয়। আমূল রূপান্তরেরও তো আর-এক নাম মৃত্যু। সতীর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে। অন্তত যে-সতীকে সৌরেশ চিনতেন, সে-সতী আর থাকবে না। বাইরের কাঠোমোটা হয়তো ঠিকই থাকবে, পরনের শাড়ি, মাথার ছোট্ট ঘোমটা, কপালের সিঁদুর আর গালের তিলটি দেখে সৌরেশবাবুর বার বার ভুল হবে, ভাববেন, এই বুঝি সেই। কিন্তু ছুঁতে গিয়ে বুঝবেন সে নয়, তার ভিতরে অন্য একজন এসেছে। তার কিছু কিছু আভাস, কোন কোন অভ্যাস পুরনো মানুষটার মতই, কিছু আবার অনেকটাই নতুনও। সেই সন্তানের ধাত্রী, বিবর্তিত মানবীকে ঠিক চিনবেন না সৌরেশবাবু, আঘাত পাবেন, অভিমান করবেন, তারপর সেই আঘাতেরও জ্বালা ধুয়ে গিয়ে প্রাচীন ক্ষতটা একটা চিহ্নমাত্র হয়ে থাকবে।

অতএব, পায়ের পাতার যেখানটা জ্বলছিল, সেখানে হাত বোলাতে বোলাতে সৌরেশ আপনাকে বললেন, একটি জন্ম মানেই একটি মৃত্যু। কিন্তু এই সামান্য কথাটা জানতে আমার এত দিন লাগল?

কিন্তু শুধু এক সতীর মৃত্যু, অন্য সতীর জন্ম কেন! যে-কান্নাটার জন্যে আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি, সেটা যখন শোনা যাবে, বারান্দার প্রান্তের ঘরে সদ্য-ভূমিষ্ঠ একটি অসহায়তা ভয়ে-বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠবে, সেই মুহূর্তে এবং তারপর থেকে এই আমিও কি আমিই থাকব?

থাকব না—মাথা নেড়ে নেড়ে সৌরেশ বললেন, ঠিক তখনই অন্য-আমি জন্ম নেবে। দেয়ালের ছায়া আরও জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিল।

কিন্তু মজা এই, সৌরেশ নিজের ছায়াকে বোঝালেন, আমি তখন টের পাব না, এই পরিবর্তনটুকু আমার চেতনায় ধরা পড়বে না। যেমন এই মুহূর্তে, নির্জন ঘরে, নিঃশব্দ প্রহরে আমার কাঁধে যদি কোন অশুভ আত্মা ভর করে, আমি বুঝব না, সেই আত্মাটাই আমি হয়ে যাবে, এই দেহবাসী চিন্তাশক্তিটাই যেমন আমি।

ওদের এত দেরি হচ্ছে কেন। অসহায় কান্নাটা বেজে উঠছে না তো। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়, যে গাম্ভীর্যকে মুখোশের মত মুখে এঁটে রেখেছে?

সৌরেশের ইচ্ছা হল, ডাক্তারকে এই ঘরে ডেকে আনেন, এক পেয়ালা কফি করে খাওয়ান। কিন্তু ভরসা হল না। লোকটার কেমন যেন 'রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে কে করে মানা' দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির আড়ালে একটু কৌতুকেরও আভাস আছে নাকি। ও যে সৌরেশবাবুর অনেক একান্ত কথা জানে। সৌরেশ মনে মনে ওকে যে গাল দিয়ে বললেন, 'ব্ল্যাকমেলার', সেটা উনি উত্তেজিত বলেই। সাধারণ মুহূর্তে তিনিও স্বীকার করতেন, এই নিপুণ চিকিৎসকটি ভদ্র এবং সামাজিক মানুষ, পরের রহস্য সে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে বটে, কিন্তু তা নিয়ে বেসাতি করে না।

সৌরেশ নষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে সতীকে মরতে দিতে, অন্য-সতী হতে দিতে চান নি। ওই ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলেন। পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার এই ঘবে এসেই বসলেন। মাঝখানে টেবিল, তিন দিকে তিনটে চেয়ার, ওপরে পাখা। সতী মাথা নিচু করে বসেছিল।

ডাক্তারবাবুর গভীর-কণ্ঠ। জেরা শুরু হল।

"আপনার স্বামী কী চান, শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"আপনার সম্মতি আছে?"

একটু যেন নড়ে বসেছিল সতী, উসখুস করেছিল, ভাঁজে ভাঁজে খসখস করে উঠে শাড়িটা একটা বিব্রত প্রায়-অব্যক্ত জবাব দিয়েছিল। ব্যস্তমানুষ ডাক্তারবাবু তার মানে ধরতে পারেন নি।

আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবার আরও স্পষ্ট করে, "বলুন, আপনি রাজী?"

"না।" সতী মৃদু গলায় বলেছিল।

না? চমকে চেয়েছিলেন ডাক্তারবাবু, চমকে চেয়েছিলেন সৌরেশ। সতী যেন নীতিগর্হিত, অবিশ্বাস্য কিছু উচ্চারণ করেছে। যেন বলেছে, ঈশ্বর নেই যেন বলেছে, পাপ-পুণ্য মানি না।

"না?" দুজনেই সমস্বরে বলে উঠেছিলেন।

সতী এবার স্পষ্ট গলায় বলেছে, "না।" তার স্বরে দ্বিধার সঙ্কোচের লেশও নেই।

পাখা বড বেশি শব্দ করছিল, ডাক্তারবাবু উঠে তার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। জানলার পাল্লা কাঁপছিল, সৌরেশ একেবারে খুলে দিলেন।

স্বাভাবিক হাওয়া আসুক ঘরে। ঘাম শুরুক, বারে বারে রুমালে যেন মুখ মুছতে না হয়। তারপর যতটা নিলে ডাক্তারবাবুর চোখে বিসদৃশ না লাগে সতীর ততটাই কাছে মুখ নিয়ে এসে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, "তুমি বুঝছ না। তোমার শরীর অসুস্থ, এই তো সেদিন অসুখে ভুগেছ, তার ওপর··· হলে বিপদ হতে পারে। ডাক্তারবাবুও তাই বলছেন।"

"কী বলছেন?" সতী শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে।

"বলছেন, প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

"না।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সতী বলেছে, "তবুও না।" আর দাঁড়ায় নি, শাড়ির খসখসে উদ্ধত প্রতিবাদের সুর স্পষ্ট হয়েছে।

নিরুপায় দৃষ্টি বিনিময় করেছেন সৌরেশ আর ডাক্তারবাবু।

"অতএব?" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন অনেক পরে, সিগারেট ধরিয়ে, সৌরেশেরটা ধরিয়ে দিয়ে। নিজেই জবাব দিয়েছেন, কতকটা কৌতুকে, "যা হওয়ার তাই হক?"

তখন সতীর পক্ষ নিয়ে সৌরেশকেই বলতে হয়েছে, "ও একটু ভাবপ্রবণ, একটু অবুঝ। ডাক্তারবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সতীর সেন্টিমেণ্টটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? আমাদের ভালবাসার প্রথম সন্তান—"

এতক্ষণে ডাক্তারবাবুর মুখের রেখায় পরিহাস স্পষ্ট হয়েছে। হাসি লুকিয়ে তিনি বলেছেন, "আপনিও, মশাই, ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন। ভালবাসার সন্তান-টন্তান সেকালে হত, ওসব পাট কবে চুকে গেছে।"

ঈষৎ বিবর্ণ মুখে সৌরেশ তখন বলেলেন, "তবে কী বলবেন আপনি। ভালবাসা না বলুন, কামনা-বাসনা এই সব বলবেন তো?"

"না, তা-ও না।" গাম্ভীর্যের মুখোশটা শোলার টুপির মতই নামিয়ে রেখে ডাক্তারবাবু পা দুটি অল্প অল্প নাচিয়েছেন। সেই সঙ্গে নেচেছে ওঁ'র চোখের মণিও।—"না, তা-ও না।"

"তবে?"

"এরা সব বর্ন্ অব মিসক্যালকুলেশন।"

হাসতে হাসতেই বলেছেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু কথাটা অপ্রিয় একটা রায়ের মত শুনিয়েছে। তিনি নিজেও টের পেয়ে থাকবেন যে, কথাটা একটু বেশি চটকদার তাই তার দুর্বলতাটুকু ঢাকতেই যেন আবার বলেছেন, "ইয়েস, ঈচ্ অব্ দেম।

ভাবুন তো, নতুন যে জেনারেশন এল, তারা প্রেমজ নয়, কামজও নয়—প্রত্যেকেই অবাঞ্ছিত, হিসাবের ভুলের ফল। কাদের হাতে আমরা এই পৃথিবীকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি বলুন তো!"

হিসাবের ভুল, হিসাবের ভুল। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পরও সেদিন অনেকক্ষণ ধরে সৌরেশ কথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেবেছেন। আর ভেবেও ঠিক করতে পারেন নি, এই ভুলটাকে, জীবনের আশঙ্কা আছে জেনেও, কেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সতী। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এটাও মৃত্যু-ইচ্ছারই একটা পরোক্ষ রূপ। সতীও তবে মরতে চায়?

আপাতসুখী, লোকচক্ষে সুন্দরী এই মেয়েটির আত্মবিলোপের আকাঙ্ক্ষার উৎস কী, সৌরেশ ভেবে পান নি। তিনিই কি?

আবার সৌরেশবাবুর এ-ও মনে হল, তিনি কেন হবেন। সতী কেন তাঁর হাত এড়াতে চাইবে! সজ্ঞানে তিনি ত তাকে অসুখী করেন নি। একটি মেয়ের যা চাই—ঘর পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য সাধ্যমত সবই তাকে জুগিয়েছেন। সবই? ভালবাসাও?

এইখানে সৌরেশ একটু হোঁচট খেলেন। সতীকে তার বিবাহিত জীবনের এই কয়টা বছরে তিনি যা দিয়েছেন, তার লৌকিক রূপ অবশ্যই ভালবাসার, কিন্তু বস্তুটি আসলে কী, তা তো কোনদিন নিকষে ঘষে দেখেন নি। কর্তব্য, সহানুভূতি, আবেগ, কামনা—এই সব যোগ দিলে যে ফল মেলে তারই নাম কি ভালবাসা?

বিচার করে দেখতে হবে। আজই, এখনই। এই ঘরটা অন্ধকার, আলোকচিত্রের স্ফুটনকক্ষের মত। সেখানেই আত্মস্থ হয়ে একটি কঠিন সম্পর্কের বিচার প্রশস্ত।

ও-ঘরে এখনও নতুন কোনও কান্নার রব নেই, কিন্তু রব উঠতে হয়তো বেশি বাকিও নেই, ওঠবার আগেই সৌরেশ নিজের কাছ থেকে জেনে নিতে চান সতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্বরূপ কী।

যেন সম্পর্কটা একটা গোলক, তাকে কোলে নিয়ে তার মসৃণ পরিধিতে হাত বুলিয়ে শুধু অনুভব দিয়ে সৌরেশ তার প্রকারটা জানতে চাইছেন। করতলগত গোলকটা নিমেষে ঘুরে গেল, সৌরেশ সঙ্গে সঙ্গে টের পেলেন, প্রশ্নটার অন্য দিকও আছে। তিনি সতীকে ভালবাসেন কিনা, সেইটুকুই একমাত্র প্রশ্ন

নয়, জানতে হবে সতীও কি তাঁকে ভালবাসে? দুটি গোলার্ধ যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসার বৃত্ত হয়ে উঠেছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেকটা সম্মোহিতের মত ক্লান্ত আচ্ছন্ন কণ্ঠে সৌরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, "ভালবাস?"

"বাসি।"

"ভালবাস?"

সেই প্রশ্নটাই আবার। একই উত্তর এল। আরও একবার জিজ্ঞাসা করে এবং প্রার্থিত উত্তরটি পেয়েও সৌরেশ নিশ্চিত হতে পারলেন না, অসুস্থ বিকারগ্রস্তের স্বরে বলে উঠলেন, "কাকে, সতী, কাকে?"

"তোমাকে।"

আর তখনই সৌরেশ অসহায় হয়ে চারদিকে চাইলেন, যেন এই সহজ কথাটাও তাঁর বোধগম্য হয় নি। সতী যাকে ভালবাসে বলছে, সেই তিনি কোথায়! যে হেলান-চেয়ারে, অল্প অল্প জ্বর নিয়ে, উৎকণ্ঠা আর ভয় নিয়ে, হিমগুণ্ঠিত রাতে কুঁকড়ে শুয়ে একটুকু হয়ে আছে, তাকে ভালবাসার কী আছে। আয়না নেই, আলোও নয়, তবু সৌরেশ সেই মানুষটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, মাথায় অল্প কয়টি চুল, মাঝে মাঝে পাক-ধরা, রেখাকীর্ণ বয়সশীর্ণ মুখ, বীতদ্যুতি চোখ। এই কি তিনি?

তিনিই। এখনকার সৌরেশ। নিজের কাছেই হতাদর সৌরেশ অস্ফুট স্বরে বললেন, "গত দু ঘণ্টায় আমি অনেক বদলে গিয়েছি। আমার সাহস নেই, পৌরুষ নেই। মলিন একটা খোলসমাত্র আছে।"

কিন্তু মোটে কি গত দু ঘণ্টায়? তার আগে নয়, আগে থেকে নয়? বরাবরই কি নয়? সেই যখন আমি ছোট্টটি ছিলুম তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তেই কি আমি বদলে যায় নি ভিতরে বাইরে? শিশু আমি, কিশোর আমি, যুবক আমি—এতগুলো টুকরো টুকরো আমিকে তৈরি করল কে! যেই করুক, একটি অদৃশ্য সুতোয় সে সকলকে বেঁধেও রেখেছে।

সে কে? হঠাৎ সৌরেশের মনে হল, সে আর কেউ নয়, সময়। সময়ই সেই কারিগর। আচ্ছন্ন অনুভূতি নিয়ে সময়কে সৌরেশ নতুন আলোয় প্রত্যক্ষ করলেন। সকাল-বিকালের আকাশের মত সে ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, সে চলে। ছোট ছোট ক্ষণের পুঁতির মালায় নিজেকে সাজায়।

এও কি সম্ভব যে, আর কিছুই বদলায় না, শুধু সময়ই বদলায়? কালের

স্রোতে ভেসে ভেসে কিংবা স্রোতের নীচের নুড়ির মত ভেঙে ভেঙে আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে চলি। চলিই। এক সময় একটু থামে না? আহা, থামুক না। এই স্রোতের টান এক নিমেষের তরেও যদি থামত, যদি ভেসে থাকার জন্যেই এতটা কসরত করতে না হত, তবে আমি উজান ঠেলে উৎসে ফিরে যেতাম, খুঁজে ঠিক বের করতাম পুরনো আমিটাকে। সেখানে সে হয়তো অবিকৃতই আছে। কিন্তু কত দূরে কোন্‌খানে?

কেন, সেই নদীটির ধারে!

সেই নদীটিকে সৌরেশের মনে পড়ল। কাচের মত তার জল স্বচ্ছ, দুই তীরে খালি বালি আর বালি। তারই কাছাকাছি একটি শহরে সৌরেশের শৈশব আর কৈশোর কেটেছে।

আজ গভীর রাত্রে, সব শব্দ যখন অন্ধকার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে, সৌরেশ ইস্টিমারের ভাঙা ভাঙা কিন্তু মোটা গলার সিটি শুনতে পেলেন। সেই শব্দে একটি ভীরু শিশু ঘুমের মধ্যে চমকে উঠল। তাকে সৌরেশ চিনতে পারলেন। সে-ও, অন্তত নামে, সে-ও সৌরেশ। শোবার ধরনেই বোঝা যায় সে কত অস্থির অশান্ত। সেই সৌরেশের মুখের একটি রেখাও বদলায় নি তো!

শহর বটে, কিন্তু বিশেষ জোলুস ছিল না।

আজও চোখ বুজলে সৌরেশ জেলা শহরে যাবার সেই পাকা রাস্তাটা দেখতে পান। অশথ-বটের ছায়ায় খানিক-ঢাকা খানিক-খোলা পথটার এপাশে ওপাশে আদালত কাছারি, গোটা দুই স্কুল, ডাকঘর, খেলার মাঠ। বাজারটা বেশ বড়ই ছিল। আর ছিল রেল-স্টেশন, ঢিলেঢালা, অলস জীবনপ্রবাহের মধ্যে যা-কিছু ব্যস্ততা সেখানেই। বিজলী আলো ছিল না, সেকালে ছিল না, শৌখিন স্বচ্ছল ঘরে হ্যাজাক জ্বলত। দু-একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডায়নামো বসিয়েছিলেন। অন্য সর্বত্র কেরোসিন লণ্ঠনের অপ্রতিহত প্রভাব। জোরাল আলো জ্বলত উৎসবে ব্যসনে, যাত্রার আসরে কিংবা বাঁধানো স্টেজে, শখের থিয়েটারে। একটা পাবলিক লাইব্রেরি ছিল, আর ছিল শহর থেকে কিছু দূরে গোলঘর ছাড়িয়ে পুরনো বরফ-কল পেরিয়ে একটা রাজবাড়ি। তখনই তার জীর্ণদশা শুরু হয়েছে, তার নোনাধরা ইঁটে সেকালের গন্ধ আর রহস্য, তার আস্তর-খসা খিলানের নীচে দিয়ে অন্দর-মহলে যেতে গা যেন ছমছম করত। ধুলোমলিন জাজিমে, শান-চটা মেঝে নিজেকে লুকিয়েছে। কিন্তু দেয়ালে দেয়ালে তখনও পুরো দেহের ছায়া-ধরা বড় বড় আয়নার ফাঁদ। সেখানে পা রাখতে না রাখতে একটি মানুষ বহু হয়ে যেত।

পুরনো অ্যালবামের পাতা উল্টে উল্টে সৌরেশবাবু যেন পর-পর সাজানো ছবিগুলি দেখে গেলেন।

নদী ছিল আরও দূরে; ভাল রাস্তা ছিল না। নদী দেখতে হলে চাপতে হত রেলে, ছ-সাত মাইল দূরে যে গঞ্জ আর বন্দর, সেখানে যেতে হত। শ্রাবণের শেষে সেই নদীই কূল ছাপিয়ে যেত, ফসলের খেত তখন জলে থৈ-থৈ, উঠন পেরিয়ে ঘরের দাওয়ায় ঢেউ ফণা তুলে ছোবল মারত। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতেও তখন সাঁকো চাই, ইস্টিশনে যেতে নৌকো বা কলাগাছের ভেলা, বেপরোয়া, অসুরশক্তি রেল-ইঞ্জিনগুলোও যেন ভয় পেয়ে পা টিপে টিপে এগত।

সেই কুলত্যাগিনী স্রোতোধারা আবার আপন ঘরে ফিরে যেত, তখন ভাদ্রের শুরু। তার উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন হিসেবে রেখে যেত কিছু কচুরিপানা, ঘরে ঘরে জ্বরজারি। জমিদার-বাড়ির নাটমণ্ডপে প্রতিমার খড়মাটির কাঠামোয় তখনই প্রলেপ পড়া শুরু হত। ইস্কুল পালিয়ে অন্য অনেক ছেলের সঙ্গে সৌরেশও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুমোরদের কাজ-করা দেখতেন। মনের সব রূপকল্পনা মাটি খড় রঙ তুলি তেল আর ডাকের সাজে ছেয়ে থাকত। আড়ালে গোপনে সৌরেশ নিজেও কতবার যে মাটি ছেনেছেন, মূর্তি গড়ে গড়ে ভেঙেছেন, তার হিসাব নেই। তাঁর প্রথম মানসী অতএব মৃন্ময়ী, আর সেই নিপুণ মৃৎশিল্পী তাঁর দেখা প্রথম রূপকার।

নিরানন্দ ছিল শীতকালটা। সন্ধ্যা হতে-না-হতে সব কেমন অস্পষ্ট অনিশ্চিত হয়ে যেত। হিম পড়ত সারারাত জুড়ে, বিছানায় নিজেকে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে শুয়ে সৌরেশের শিশুসত্তা রোজ ভাবত, আজ একটা কিছু-না কিছু অঘটন ঘটবে; কেউ-না-কেউ আসবে। আসবেই। নইলে সব কেন এমন কালো হয়ে গেল, সব কেন এমন চুপ, উঠনের কুকুরটা এত ভয় পেয়েছে কেন, তেঁতুলগাছ থেকে পেয়ারাগাছের ডালে কেন বাদুড়গুলো ঝটপট করে উড়ে এসেই ফিরে যাচ্ছে। একটা গোলমেলে কিছু ঘটবে বলেই তো, ভয়ঙ্কর কেউ আসবে বলেই তো?

কিছুই কিন্তু ঘটত না, রাত ফুরত, কুয়াশার কাঁথার নীচে অলস সকাল কাটিয়ে নিস্তেজ রুগ্ন শিশুর মত সূর্য অনেক বেলায় দক্ষিণ আকাশে চোখ মেলত।

চিরদিনের মত যাকে ছেড়ে এসেছেন, স্মৃতির সরু সুড়ঙ্গপথে মাথা হেঁট করে ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজতে, নতুন করে পেতে সৌরেশের আজ ভাল লাগল।

আর সেই ছেলেটি! সৌরেশের মনে পড়ল, তার ডাকনাম ছিল টুলু। ছিল, তার মানে এই নয় যে, এখন সে অন্য একটা নাম পেয়েছে। আসলে তার এখন আর কোনও ডাকনামই নেই। 'টুলু' নামে কেউ তাকে ডাকে না। যারা ডাকত, ডাকতে পারত, তারা কাছে নেই, অনেকে এই পৃথিবীতেই নেই। সে নিজেও কি আছে? বুঝি নেই। কপালের কাছে চুলের থাকে গোটা দুই ঢেউ, ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা, চলার সময় গোড়ালি উঁচু করা আর ঠোঁটের কোণ সামান্য বেঁকিয়ে হাসা—এই দিয়ে কি পুরো মানুষ হয়! যদি হয় তবে সে আছে, এখনও আছে, সৌরেশের মধ্যেই আছে। যদি না হয়, তবে সে নেই, সৌরেশের মধ্যে নেই, কোথাও নেই।

টুলুকে সৌরেশ অনেক দিন পরে দেখলেন। তারা রোগা, দুর্বল আর নিরীহ। কালো রঙ ফ্যাকাশে হলে যা হয়—চীনে-বাদামের খোসার মত মুখের রঙ। হাঁটুর নীচে কাটা দাগ, কনুইয়ের কাছে ছাল-ছাড়ানো। কবে বুঝি পেয়ারাগাছ থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল। নিরীহ ছেলেটি বাহাদুরি করতে গিয়েছিল কেন, সেই জানে।

শিয়রে খালি বা ভর্তি হরেক সাইজের শিশি সাজানো। থার্মোমিটার একটা, আর আধখানা-ছাড়ানো একটা কমলালেবু—শীতের হাওয়ায় তার কোয়াগুলো সিটিয়ে গিয়েছে, সাদা সরু শিরাগুলো উঁচু হয়ে আছে। টুলু নিষ্প্রভ আড়চোখে একবার দেখল কমলালেবুটাকে, বিতৃষ্ণা একটুখানি মুখবিকৃতি হয়ে ঠোঁটের কোণে খেলে গেল, তারপর সে চোখ ফিরিয়ে নিল। পাঁচটা কোয়া খাওয়া শেষ, এখনও চারটে বাকী। কমলালেবুতে নটি কোয়া আছে, সব লেবুতেই তাই থাকে। কখনও কখনও আটটাও হয়, কখনও দশটাও, তবে খুব কম, বেশীর ভাগ কমলাই এই এখনকারটার মতন—ন-কোয়া দুটি কোয়া কখনও কখনও একসঙ্গে একেবারে জুড়ে থাকে—যমজ শিশুর মত।

এসব হিসাব টুলুর মুখস্থ। সে জানে এই ঘরে কটা টিকটিকি আছে। তিনটে। তারা কখন পোকা শিকারে বেরয়? ঠিক সাড়ে ছটায়। কেমন করে শিকার করে? একটু দূরে থেকে তাক করে, পা টিপে টিপে এগয়, দাঁড়ায়, দম নেয়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইঁদুর আছে কটা? চারটে—তিনটে নেংটি, একটা ধাড়ি। তর তর করে ছোটে, পালায়, দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের গোপন চলাফেরার একটা পথ আছে। কাপড় কাটে, কাগজের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে খসখস শব্দ করে। সংখ্যায় এরা বেশীও হতে পারত, কিন্তু টুলু একসঙ্গে কোনদিন তিনটের বেশী দেখে নি। এ পাড়ায় নেড়ি কুকুর আছে ছটা, বিড়াল চারটে। কাচ্চাবাচ্চাগুলোর অবশ্য হিসাব নেই। কারণ ওরা বাঁচে না, হুলোরা ধরে ধরে খায়, বড় বড় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। একটা বেড়ালকে বাচ্চা সমেত নীলুরা অনেক দূরে পার করে দিয়ে এসেছিল। ওরা বিশ্রীভাবে ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে, নেড়ি কুকুরগুলো পাড়ায় অপরিচিত কেউ এলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, তবে নেহাত ক্ষেপে না গেলে কামড়ায় না। শুধু একবার সতীশ বহুরূপীকে তাড়া করে পায়ের পাতায় দাগ বসিয়ে দিয়েছিল। দোষ তো সতীশেরই। সে ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল কেন? না করলে অঘটনটা ঘটত না।

একটা বেড়াল টুলুর ঠিক পোষা না হলেও গা-ঘেঁষা। মাঝরাতে কতদিন মশারিতে ফাঁক পেয়ে ওর লেপের নীচে ঢুকে গুটিসুটি হয়ে শুয়েছে। আঁচড়ায় নি কোনদিন, তবে বিছানাপত্র দু-একবার নোংরা করেছে। বেড়ালটা থিয়েটারও করত ভাল। 'রাতকানা' প্লে-তে ঠিক সময় বুঝে স্টেজে লাফিয়ে পড়ে মাছের মুড়ো মুখে তুলে উইংসের দিকে ছুটেছিল।

আর কতকগুলো হিসাব রাখা তো সোজা। এ-পাড়ায় কার কার বাড়িতে গরু আছে, কোন্ গরুর দুধ ঘন। জমিদার-বাড়ির বেতো ঘোড়াটাকেও টুলু ভোলে নি। পোষা ছাগল তো তাদের নিজেদেরই আছে। আর যে দুটো কাক উড়ে এসে ঝড় হোক, জল হোক, সাত-সকালে উঠনের তারে বসে ডাকে তাদের সঙ্গে টুলুর একরকম চেনাশোনাই হয়ে গিয়েছিল। বেপাড়ার চারটে কবুতর রোজ চাল-বাছার সময় উড়ে এসে পিসিমাকে বিরক্ত করে, টুলু তাও জানে। এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক-কিছুই দেখা যায় যে।

টুলু চোখ বুজে বলে দিতে পারে তার শিয়রে দাগ-কাটা, শেক-ভ্য-বটল্-লেবেল-আঁটা কটা শিশি জমেছে—কোন্‌টা নীল, কোন্‌টা সবুজ, কোন্‌টা সাদা একেবারে। এই টিনের ঘরটায় কটা খুঁটি আছে। কম্প দিয়ে প্রবল জ্বর এসে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে আর ঝাপসা করে না দিলে এসব হিসেব টুলুর বেশ মনে থাকে। বেশী কিছু না তো শুধু দশ অবধি গুনতে পারা চাই।

যে হিসেবটা টুলু কোনদিন করে উঠতে পারে নি, তা হল সন্ধ্যার পর সে ঘুমিয়ে পড়লে এই ঘরে কটা মশা আসে। সে জেগে থাকলে আকাশে কটা তারা ওঠে। খুব ভোরে শিউলিগাছটায় কত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে। আর রাস্তার পাশের ওই কাঁঠালগাছটায় কটা পাতা আছে। গুনতে কখনও চেষ্টা করে নি, তা নয়; কিন্তু টুলু জানে, গুনে কোনদিন শেষ করাও যাবে না।

শুধু যে ম্যালেরিয়াতেই ভোগে টুলু, একটানা চার দিন কি পাঁচ দিন বড় জোর। এত কম সময়ে এত বড় হিসাব করা যায় না। যদি কখনও টাইফয়েড হত, টুলুকে এক মাস কি তারও বেশী বিছানায় পড়ে থাকতে হত, তবে হয়তো এই শক্ত শক্ত কাজগুলোও করা হয়ে যেত, চোখের মণি ঘুরিয়ে ফিরিয়েই যা করা চলে। গাছের পাতা গোনা হত, এই জানলার ফাঁকের চৌকো আকাশে যে-কটি তারা ভাসে, ডোবে, হাসে, তাদের সংখ্যাও অজানা থাকত না। এমন কি, খুব ভোরে বেড়ার ফুটো দিয়ে চোখা তীরের মত

যে রোদটুকু ঘরের পাশে ঠিকরে পড়ে, তার সঙ্গে মিশে-থাকা ধুলোর প্রতিটি কণাকে টুলু চিনতে পারত। ফিরে-ফিরে-অসুখে-পড়া ছেলের চোখ দুটি তো আর চোখ থাকে না, অণুবীক্ষণ হয়ে যায়।

সেই রুগ্ন ছেলেটি জানে, আকাশের পারে কী আছে। বিজ্ঞানের বই থেকে নয়, বিজ্ঞানীরা কতটুকুই বা মাপতে পেরেছে! সে জানে জ্বরে যখন অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন। অনেক কিছু দেখে, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বিড়বিড় করে যা দেখে, সব বলে। শিয়রের-কাছে-পাখা-হাতে-করে-ঠায়-বসে-থাকা পিসিমা ভয় পান। একে ডাকেন, ওকে ডাকেন। বলেন, টুলু ভুল বকছে। মাথায় জলপটি দেন।

সেরে উঠে, তখনও মাথা ঝিমঝিম করে, শরীর দুর্বল, টুলু সব শুনতে পায়। জ্বরের বিকারে সে যা যা বলেছে, সব। সব ভুল? শুক্ত দিয়ে মাখা পুরনো চালের ভাত কচলে কচলে মুখে তুলতে তুলতে তার নিজেরও মনে হয়, বুঝি ভুলই। সে ঠিক জানে না। একটুখানি খটকা থেকেই যায়। কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা ভুল? যে-টুলু লিকলিকে লোভী হাত বাড়িয়ে পান্‌সে ঝোল-ভাত মুখে তুলছে, যার চোখ এই উঠনটার বেড়ায় ঠেকে থমকে গেল, সে যা বুঝছে তাই ঠিক আর যে-টুলু অনায়াসে পাখির চেয়েও হালকা আর হাওয়ার চেয়েও অদৃশ্য হয়ে চরাচর বিশ্বভুবনের খবর জেনে এল, তার কথাই ভুল? কেন? তার ভাষা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বলে? তার অসুখের-সময়ে-দেখা জিনিসের সঙ্গে সেরে-ওঠা-চোখ-দিয়ে-দেখা জিনিসের কিছুমাত্র মিল নেই বলে? অসুখটা যদি ভুল না হয়, তবে অসুখে-জানা জিনিসগুলোই বা কেন ভুল হবে!

পিসিমার হিসেব টুলু বোঝে না।'

পিসিমাও তো রোজ দু বেলা পুকুরে চান করেন। ডুব দিয়ে তিনি কি টের পান না, জলের ওপরে যে-জিনিস যেমন দেখতে, জলের নীচে ঠিক তেমনটি নয়? সাপলার ডাঁটাগুলো কি তাঁর চোখে বাঁকা-বাঁকা ঠেকে না, শ্যাওলাগুলো অতিকায় সবুজ শুঁয়োপোকা হয়ে ওঠে না? তাঁর নিজের হাতের আঙুল কি কলার মত ফোলা-ফোলা লাগে না? আর তাঁর পিতলের কলসী? জলের ওপরে যেটাকে নাড়াচাড়া করতে এত কষ্ট, সেটা বুঝি সহসা শোলার মত হালকা হয়ে যায় না? যায়। কেন না, জলের ওপরে যে-নিয়ম, জলের নীচে সে-নিয়ম খাটে না। পাতালের আইনকানুনই আলাদা।

তেমনি, একবার যদি মেঘের চাঁদোয়াটা ফুঁড়ে উড়ে যাও পিসিমা, দেখবে, সেই না-কিনারা মহাকাশের নিয়মও আলাদা। এই সোজা কথাটা বোঝ না কেন ?

আর, জর হলে সেই নদীটিও টুলুকে ডাকত। তার জল সাদা, পাড়ের বালি আরও সাদা, সেখানে অন্য সময়ে যেতে মানা ছিল, আর এই রোগা লিকলিকে শরীর আর ভীতু মন নিয়ে টুলু যেতে সাহসও পেত না ; কিন্তু জরের ভিতরে চলে যেত, মুঠো মুঠো বালি তুলত আর ছড়াত, ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে, তারপর স্রোতের টানে ভেসে ডুবে ভেসে পৌঁছে যেত মোহানায়। সেখানে দিনের বেলায় চড়ায় উঠে কুমির রোদ পোয়ায়, অন্ধকার হলেই বন বনে। যাদের শরীর রোদ আর নদীর রঙ দিয়ে আঁকা, সেই বাঘগুলো রাগী গলায় ধমক দিয়ে অন্য পশুদের ঘুম পাড়ায়।

জর মানেই মুক্তি, সেরে-ওঠা মানেই কয়েকটা ভয়ের শাসনের নিয়মের কয়েদ হওয়া। রোদ্দুরে না বেরনো, জলে না ভেজা, বিস্বাদ পথ্য গেলা আর সন্ধ্যায় লণ্ঠন জেলে বই পড়া।

অসুখ ভাল হওয়াতে টুলুর কোনও সুখ ছিল না।

সেই বয়সের অস্পষ্ট কয়েকটা ছবি মনে আছে। একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে টুলু শুনতে পেল, চারদিকে শাঁখ বাজছে। ওকে টেনে নিয়ে সকলে দাঁড় করিয়ে দিল উঠনে। দরজা-জানলা ঠক ঠক করছিল, ঘরের চাল দুলছিল, মাটি কাঁপছিল। তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নি। চোখ কচলাতে কচলাতে টুলু শুনল, ভূমিকম্প হচ্ছে। কথাটা আগেই জানা ছিল, জিনিসটা কী, সেটা টের পেল এই প্রথম। একটু পরেই মাটি নিথর হল, সকলে মিলে ফের ঢুকলেন ঘরে।

এইটুকু মোটে মনে আছে। না, আরও একটু। সে-দিন ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ঘটনাটার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। না তখন, না পরবর্তী জীবনে। তবু তুচ্ছ ক্ষণিক একটু উত্তেজনা আর বিস্ময়ের স্মৃতিটা কী করে যেন টিকে গিয়েছে।

ভাল লাগত না, ভাল লাগত না। স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজত, টুলু দুর্বল শরীরটাকে কোনক্রমে বাড়ি পর্যন্ত টেনে এনে পিসিমার কাছে জমা করে দিত। বাইরে ঘোরা বারণ, চুপচাপ বসে থাকত বাইরের বারান্দায়, আকাশে নানা রঙে কত ছবি নিরন্তর লেখা আর মোছা চলে, টুলু দেখত। পাখিদের

ঘরে ফেরার সময় ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। একটা লোক মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে যেত। তখন নিয়ম—পড়তে বসতে হবে।

কতকগুলো নিয়ম আর বারণের যোগফল, এই কি জীবন? টুলু জানত, তাই বেঁচে থাকবার সাধটাও তার ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসছিল। এই ক্ষীণ শরীর নিয়ে ধুকধুকে ভয় বুকে পুরে, নানা মানা মেনে মেনে বেঁচে থেকে লাভ কী! বিশেষ করে সেই বাঁচা যদি শুধু ভোরে ওঠা, পড়া, নাওয়া খাওয়া আর ঘুমনোর সমাহার হয়! কোনদিন এতটুকু বাড়াবাড়ি করবার অধিকারও যদি না থাকে! স্বাদহীন বর্ণহীন দুধের বাটিটায় আঙুল নেড়ে নেড়ে একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে ফের নামিয়ে রেখে টুলু নানা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কল্পনা নিয়ে খেলা করছে।

"যদি মরে যাই," টুলু বলছে মনে মনে, "তবে যেন পরজন্মে ফড়িং হয়ে জন্মাই, যাতে ঘাসে ঘাসে শিষে শিষে প্রাণের ফুর্তিতে লাফিয়ে চলতে পারি; ব্যাঙ হতেও আপত্তি নেই, বর্ষার দিনে মহানন্দে ডাকতে পারব। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি হই একটা টাট্টু ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেতে পারব, আমার মুখে ফেনা ছুটবে, খুরে উড়বে ধুলো, আমি ছুটব—ছুটব—ছুটব। এ-সব কিছু না হয়ে হই যদি একটা পাখি, তবে ডালে ডালে, আকাশের নীলে নীলে উড়তে পারি, সুরের মায়ায় বাতাস ছেয়ে ফেলি। আমার একটা ছোট্ট ফুলগাছ হতেও আপত্তি নেই, যদিও তখন আমার চলবার স্বাধীনতা থাকবে না, তবু তো ফুটে উঠব, পাপড়ি পল্লব পাতায় সুন্দর হব, হাওয়ার ডাকাত লুঠপাট করতে এলেও ভয় পাব না। এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সব-কিছু ভাল।

একটি রুগ্ন বালক বেঁচে থাকার অর্থ আর আনন্দ না পেয়ে প্রাণী-পতঙ্গ-উদ্ভিদ-জীবন কামনা করেছিল। মানুষ হয়েও টাট্টু ঘোড়া বা পাখিকে ঈর্ষা করেছিল।

সেই সাধটা তার মন থেকে অন্তত তখনকার মত নিরঙ্কুর করেছিলেন মোহিতদা।

মোহিতদা দোনলা বন্দুকটা সাফ করছিলেন, আর আড়চোখে চাইছিলেন। টুলু একটু দূরে ভিজে বেড়ালটি হয়ে বসে ছিল, দেখছিল। সাফ করার কাঠিটা যেই টেনে বাইরে আনছিলেন মোহিতদা, তেল-কালিতে-মাখা ন্যাকড়াটা দেখে টুলুর গা ঘিনঘিন করছিল। ওপর থেকে যে মুখটা এমন চকচকে নীলচে, তার প্রাণে হিংসা আর আগুন আছে সে কথা তো টুলুর জানা-ই; কিন্তু তার মনেও এত কালি? একবার ঘাড় ফিরিয়ে মোহিতদা বাহাদুর-বাহাদুর চোখে ওর দিকে চাইলেন, টুলুর মনে হল, মোহিতদার চোখের কোণেও কালি। ক্যাঁচ

করে শব্দ হল, বন্দুকটাকে দু-ভাঁজ করে ভেঙে ফেলেছেন মোহিতদা, খুব খুঁত-খুঁতে ছোট-করা এক চোখ রেখেছেন নলের মুখে, সন্তোষজনক ভাবে সাফ হল কি না পরখ করছেন। কই, এখন তো কালি নেই মোহিতদার চোখে! টুলু অতএব ধরে নিল, মোহিতদা এতক্ষণ যে চশমা পরে ছিলেন, তার ফ্রেমের ছায়াই ওঁর চোখের কোলে ছায়া ফেলছিল। চশমাটা খুলে রেখেছেন, এখন কালিটুকুও সঙ্গে সঙ্গে মুছে গিয়েছে।

মোহিতদা ওকে শিকারের কৌশল শেখাচ্ছিলেন। দুটি বিন্দু দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দুটোর সঙ্গে যেটাকে তাক করছি সেটা যদি এক লাইনে এসে মেলে অমনি ঘোড়া টিপে দিবি, বাস্, আর দেখতে হবে না, শিকার একেবারে হাতের মুঠোয়। বুঝলি?"

টুলু কিছু বোঝে নি, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল।

মোহিতদা বলছেন, "কিছু ভাবিস নি, তোকে কাল সকালে আমি শিকারে নিয়ে যাব।"

কাল? কাল সকালে? টুলুর চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিবে গিয়েছে। ম্রিয়মাণ গলায় বলেছে, "কিন্তু কাল—কাল যে আমার জ্বর আসবে মোহিতদা।"

কথাটায় কোথাও কিছু হাস্যকরতা ছিল, কণ্ঠস্বর খানিকটা করুণ হয়ে গিয়েও থাকবে, মোহিতদা সকৌতুকে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন: "কাল জ্বর আসবে? তুই ঠিক জানিস? পরশু নয়, তরশু নয়—কালই?"

"হ্যাঁ, কালই।" টুলু আবও দৃঢ় গলায় বলেছে।

"কী করে এত নিশ্চয় করে জানলি?" মোহিতদা হাসি লুকিয়েই বলেছেন, তবু একটা ঠাট্টার ভঙ্গি ওঁর স্বরে থেকেই গিয়েছে।

"বাঃ রে, কাল অমাবস্যা না?"

"ও!" মোহিতদা এবার বন্দুকের দিকে চোখ আর মন ফিরিয়েছেন: "অমাবস্যা হলেই জ্বর হবে বুঝি?"

"হবে," আস্তে আস্তে টুলু বলছে, "হবেই। ফি অমাবস্যা, পূর্ণিমা আর একাদশীতে আমার জ্বর আসে, পিসিমা তখন আমাকে বাইরে যেতে দেয় না। তুমি শোন নি মোহিতদা?"

সারা গায়ে সরষের তেল ডলে ডলে মাখছিলেন মোহিতদা, নাইতে যাবেন বলে। তেল-চোয়ানো পাঁচটা আঙুল চাপড়ে চাপড়ে মারছিলেন চওড়া কাঁধের

উঁচু পেশীতে, চিতনো বুকে, হাত ঘুরিয়ে পিঠে ঘষছিলেন। কড়ে আঙুল তেলের বাটিতে ডুবিয়ে নাভিতে ছোঁয়াচ্ছিলেন। টুলু এবারও দেখছিল। ওর চোখে হিংসা কি জলজ্বল করছিল? মনে নেই। মোহিতদার তেলমাখা প্রকাণ্ড শরীরটা রোদে চকচকে হয়েছিল।

ওঁর পিছেপিছে টুলু পুকুরঘাট পর্যন্ত গেল, হাতে শুকনো কাপড় আর গামছা। পাড়েই দাঁড়িয়ে রইল।

"তুই নামবি না?" মোহিতদা একবার জিজ্ঞাসা করলেন।

টুলু মাথা নেড়ে জানাল, না। সে পরে ঘটি ডুবিয়ে মাথা ধুয়ে নেবে আর-কিছু বলেন নি মোহিতদা, ধুতিটা হাঁটু অবধি তুলে ফেরতা দিয়ে কোমরটা আরও কষে বেঁধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অনেকক্ষণ তাঁকে দেখা গেল না। যখন মুখ তুললেন, তখন একরাশ চুল চোখ ছেয়ে ফেলে মুখে কপালে লেপটে গিয়েছে, মোহিতদা এক হাতে সব পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে ফের ডুব দিলেন। পরের বার যখন মাথা তুললেন তখন তিনি প্রায় ওপারে চলে গিয়েছেন, দু হাতে জল কেটে কেটে ফিরে আসতে লাগলেন এ-পারে। আসতে আসতে কতবার যে ডুব দিলেন, মাথা তুললেন কতবার—হিসাব নেই। শেষবারে টুলু দেখতে পেল, মোহিতদা এক হাতে একগুচ্ছ সাঁপলা তুলে ধরেছেন, সেগুলো টুলুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এগুলো ধর্, ভাজা করে খাব।"

আরও অনেকক্ষণ ধরে মোহিতদা স্নান করেছিলেন। যখন জল ছেড়ে উঠে এলেন তখন ওঁর চোখ দুটো টকটকে লাল। জ্বর হলে টুলুর চোখও টকটকে লাল হয়, জ্বালা করে, কিন্তু সেটা আলাদা রকমের লাল।

জলে ঘটি ডুবিয়ে মাথায় ঢেলে টুলু ঘরে ফিরে এল।

খেতে বসে মোহিতদা বললেন, "কাকিমা, তোমার এই ভাইপোটিকে একেবারে একটা ব্যাঙাচি বানিয়ে রেখেছ। এ-ভাবে ও বাঁচবে কী করে? ওকে ছেড়ে দাও, ঘুরুক, ছুটুক, দেখুক, তবে তো ও মানুষের মত হবে।"

পিসিমা গম্ভীরভাবে বললেন, "ওর শরীরে কিছু সয় না।"

ঢক ঢক করে এক বাটি অম্বল নিঃশেষ করলেন মোহিতদা, টুলু যা কখনও আঙুল দিয়েও ছুঁতে পায় না, এক চুমুকে এক বাটি ঘন দুধ নিঃশেষ করলেন।

তারপর খাওয়া শেষ হলে তাঁর তৃপ্ত প্রসন্ন দীর্ঘ ঢেকুর তোলার শব্দ শুনে টুলু চমকে উঠল।

রাত্রে মোহিতদার সঙ্গে এক ঘরে শুতে হয়েছিল। মোহিতদা বলেছিলেন,

"আমি এখানে বেশীদিন থাকব না তো, নইলে তোকে পাঞ্জা লড়া আর যুযুৎসুর প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়ে যেতাম। তুই সবল হয়ে উঠতিস। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আর জ্বর আসত না।"

কাঁথায় গলা অবধি ঢেকে টুলুব সত্যিই মনে হচ্ছিল, তার জ্বর আসছে—আসছে। তাকে কেউ ঠেকাতে পাববে না। সে আসবেই, নিঃশব্দে হঠাৎ হানা দেবে, শরীরের সবটুকু রক্ত নিমেষে শুকিয়ে দিয়ে পিপাসা হয়ে গলায় জলবে, যেন দেশলাইয়েব কাঠি ছুঁইয়ে জ্বালিয়ে দেবে চোখের পাতায়, তারপর নিষ্ঠুর হাতে ছোট ছোট ছুঁচ মগজে ফুটিয়ে দেবে। তার রীতিনীতি টুলুর ভাল-মতই জানা আছে। তবু সে আসুক, টুলু তাকে ঠেকাতে চায় না। সে এলেই টুলু যে হঠাৎ স্বাধীনতা পায়, যা-খুশি ভাবার অলৌকিক ক্ষমতা তাকে ভর করে, মোহিতদা সে-খবর জানাবেন কোথা থেকে?

ফিস ফিস কবে টুলু তাই বলল, "মোহিতদা, আমি ভাল হতে চাই না। ভাল না-থেকেই আমি ভাল থাকি।"

মোহিতদা সে-কথা শোনেন নি।

শেষ রাত্রে ঠেলে ঠেলে টুলুর ঘুম ভাঙিয়েছিলেন।

"এই, শোন্, শীগগির উঠে পড়্। আমার সঙ্গে শিকারে যাবি।"

একটু আগেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টুলু স্বপ্ন দেখছিল, সে গরম জলের গামলায় পড়ে গিয়েছে। এইটুকু ছোট গামলায় সে পড়ল কী করে, অতটুকু গামলায় তাকে ধরবেই বা কেন?—এই সব বিস্মিত প্রশ্ন মনে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল, কারণ সে যে পড়ে গিয়েছে, তাতে তো ভুল নেই। পড়েছে, হাত-পা ছুঁড়ছে, উঠতে পারছে না। চিৎকার করতে চায়, গলায় স্বর ফোটে না। গরম জলে গায়ে ফোস্কা পড়ল, চামড়া কুঁচকে গেল, সমস্ত দেহটাই ঝলসে গিয়েছে। সমস্ত দেহে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে টুলুর ঘুম ভাঙল। মাথায় বালিশটা নেই, দুটো পাশবালিশের মাঝখানে টুলু আটকা পড়ে আছে। মোটে এই! কপালে হাত রাখল টুলু। কই, গরম নয় তো, বরং ঘেমেছে। ঘাড়ের কাছটায় ব্যথা-ব্যথা লাগছে, হয়তো শোবার দোষে। কিন্তু জ্বর নয়, জ্বর নেই, টুলুর এই বিছানার ত্রিসীমানায় নেই।

তবু মোহিতদার আচমকা প্রস্তাবে টুলু অবাক না হয়ে পারল না। চোখ কচলে ঘুম-জড়ানো গলাতেই বলল, "শিকার—আমি শিকারে যাব, মোহিতদা? আমি?"

মোহিতদা বললেন, "তুই।"

"শিকারের আমি কী জানি?"

"কিছু জানবার দরকার তো নেই। তুই আমার সঙ্গে থাকবি।"

"পিসিমা—পিসিমা বকবে না?"

"বেরিয়ে তো পড়্, কাকিমাকে বলবার দরকার কী?"

"আমার—আমার যদি জ্বর আসে?"

মোহিত জবাব দিলেন না, এমন চোখে তাকালেন, যাতে অনুকম্পা কৃপা অবজ্ঞা সবই ছিল।

তিনি নিজে তৈরী হয়ে নিচ্ছিলেন। হাফশার্ট পরে নিলেন চট করে, ট্রাউজারের পায়ের কাছটায় ক্লিপ লাগিয়ে শক্ত করে এঁটে নিলেন, গলায় ঝুলিয়ে নিলেন একটা থলে, তাতে গুনে গুনে গোটা কয়েক টোটা পুরলেন। খালি ফ্লাস্কটা টুলুর হাতে দিয়ে বললেন, "এটা তুই ধর্—রাস্তায় জল ভরে নেব। তৈরী?"

টুলু আর তৈরী কী হবে, হাফপ্যান্ট তো পরাই ছিল, একটা শার্ট শুধু পরে নিল চুপে চুপে। তারপর ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। মোহিতদার চোখের নিঃশব্দ ইশারায় টুলু আস্তে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল। তখনও ভাল করে ভোর হয় নি।

বিরক্ত দুটো নেড়ি কুকুর মুখ তুলে ওদের একবার দেখেছে, কিন্তু চেনা গন্ধ পেয়ে চেঁচায় নি। কয়েকটা কাক সবে জেগে উঠে ডাকতে শুরু করেছিল, কিন্তু আকাশে আলো নেই বলে ভরসা করে বাসা ছেড়ে বেরয় নি। পালেদের গোয়ালে ডাঁশ-মশার জ্বালায় উত্ত্যক্ত গরুটা মাঝে মাঝে আর্তস্বরে ডেকে উঠছিল, আর কোনও শব্দ বা সাড়া ছিল না।

টুলুর পা দুটো কাঁপছিল। শীত পড়ে নি, তবু হাওয়ায় হিম তো আছে। দুই হাত সে বুকের কাছে জড়ো করে রেখেছিল।

মোহিতদা ফিরে চেয়ে বললেন, "একটু পা চলিয়ে চল্, তা হলে আর শীত করবে না। পা চলিয়ে চল, কান দুটো দেখবি গরম হয়ে গেছে।"

পাকা রাস্তা শেষ হলে ওরা মাঠে নামল। চষা ক্ষেত, সবে ধান উঠে গিয়েছে, তবু উঁচু-নিচু পায়ে লাগে। টাল সামলাতে বেগ পেতে হয়। টুলু সন্তর্পণে আল ধরে হাঁটছিল, কিন্তু মোহিতদা বার বারই ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁর পা ফেলবার ধরনটা হুবহু ড্রিল-মাস্টারের মত, থপ থপ করে জুতোর শব্দ করে যেন বলছিলেন, জোরে—আরও জোরে।

কিন্তু কত জোরে আর ছুটবে দুর্বল টুলু—বছরে সাত মাস বিছানায় পড়ে থাকা টুলু? তার গায়ে সত্যিই ঘাম ছুটছে, কী জোরে যে নিশ্বাস পড়ছে! ভয় করছে টুলুর নিজেরই। পেটের ভিতরে, যেখানে অতিকায় একটা পিলে আছে সে জানে, থেকে থেকে তা টন টন করে উঠছে, আর যেখানটায় কেউ অতি দ্রুত নিয়মিত হাতুড়ি পিটছে, তার নাম হৃৎপিণ্ড। সেখানে প্রায়ই এমন হাতুড়ি পড়ে—টুলু ভয় পেলে কিংবা তার খুব পরিশ্রম হলে।

“এখানে এ সময়ে কী কী পাখি আসে, তুই জানিস ?”

টুলু জানত না।

“টীল, ডাক, স্নাইপ ?”

টুলু মানেই বুঝল না।

বিরক্ত হয়ে মোহিতদা বললেন, “তুই কী রে! এখানকার মানুষ, কিন্তু কোনও খবরই রাখিস না ? আচ্ছা, কতদূরে গেলে পাখির ঝাঁক মিলবে, তা তো জানিস ?”

টুলু তাও জানত না।

রাতের নদীতে চড়া পড়ে পড়ে একটু একটু করে দিন জেগে উঠছিল। মোহিতদা আফসোস করে বলে উঠলেন, “ইস, বেশী দেরি হয়ে গেলে সব উড়ে যাবে, একটাকেও পাল্লায় পাব না। টুলু, তুই কোনও কাজের নোস।”

কুয়ো থেকে জল তুলে ফ্লাস্কটা ভরে নিলেন মোহিতদা। গ্রামের একজন লোক সেদিকেই আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করে পাখিদের ঠিকানা জেনে নিলেন।

পথে একটা নলখাগড়ার বন পড়ল, তার পর উঁচু মতন একটা ডাঙা, সেটা ঢালু হতে হতে যেখানে গিয়ে মিশেছে, সেটা আসলে একটা বিল। আর চারদিক খোলা—শুধু খোলা। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে যত দেখল টুলু, অবাক হয়ে গেল। একটা জায়গায় খান-তিনেক পোড়া ইট উনুনের মত সাজানো—এতদূরে এসে কারা কবে চড়িভাতি করেছিল ? ওই জামগাছটা পাতা মেলে খানিকটা অন্ধকার ধরে রেখেছে, ফল নেই,—এই সময়টায় জাম ফলে না। একটা গাছে অজস্র থোকা-থোকা কুল—কিন্তু কুল তো টুলুর খেতে নেই। আর ছোট ছোট ঝোপ-ঝোপ গাছে লালচে ছোপ-ধরা এই ফলগুলো কী ? করমচা ? করমচাও তো টক। টুলুর খেতে মানা।

আকন্দের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ল টুলু, টিপে টিপে দেখল দুধ-রঙ বেরয় কি না! আর কাশ। রোগা লম্বা কাঠিসার মাথা একেবারে সাদা, তবু থেকে থেকে নড়ে—বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে, এখনও ওদের এত আনন্দ ?

বন্দুকটা বুকের কাছে তুলে এদিক-ওদিক তাক করছিলেন মোহিতদা, একবার গুড়ুম করে একটা আওয়াজও হল, কিন্তু পাখি পড়ল না। কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল ওরাই জানে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে সার বেঁধে উড়ে গেল—বসল গিয়ে খানিক দূরে আর-একটা জলার ধারে। একটা প্রবীণ বক শুধু নির্বিকারভাবে তখনও পদ্মপাতার আসনে সমাসীন।

টুলুকেই ওখানে বসিয়ে রেখে মোহিতদা ওদিকের জলাটার ধারে গেলেন, সেখানেও খানিক পরে একটা জোর আওয়াজ হল, ত্রস্ত টুলুকে কানে আঙুল দিতে হয়েছিল। খানিক বাদে মোহিতদাকে হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে দেখা গেল। খাকী জামার বুকের দিকটা একেবারে ভিজে গিয়েছে, গাল-চোয়াল বেয়ে দরদর ঘাম ঝরছে।

টুলু বুঝি চোখ বিস্ফারিত করে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিছু পেলে?" মোহিত ঠোঁট উল্টে বললেন, "না, কিচ্ছু না। হোপলেস জায়গা এটা। শেষ পর্যন্ত কি একটা দুটো শেয়াল আর খরগোশ শিকার করে ফিরব?" পকেট থেকে রুমাল বার করে মোহিতদা মুখ মুছেছিলেন, আর টুলু—চির-রুগ্ন টুলু, সকলে যাকে করুণা করে, করুণা করে বলে ঘেন্নায় যার নিজেরই মাঝে মাঝে মরতে সাধ যায়, সেই টুলুও মোহিতদাকে করুণা করেছিল। হায় রে, সে যদি বন্দুক ছুড়তে জানত, কিংবা কোন জাদু জানা থাকত তার, তবে একসঙ্গে আকাশ থেকে কয়েক ঝাঁক পাখি পেড়ে আনত।

থলে থেকে পাঁউরুটি বের করলেন মোহিতদা, পিঁপড়ে ঝেড়ে ঝেড়ে তাতে মাখন মাখালেন। টুলুব হাতে দু টুকরো তুলে দিয়ে বললেন, "খিদে পায় নি?"

পেয়েছিল, খুবই পেয়েছিল, টুলু এতক্ষণ সঙ্কোচে বলতে পারে নি। দু টুকরো রুটি খেয়েও খিদে গেল না। এদিকে ওদিকে কুলগাছের ডাল নুয়ে নুয়ে আছে, টুলু চেয়ে দেখছিল। মোহিতদাও দেখছিলেন, তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন, "আয়।" একটা কুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ডাল ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন।

টপ টপ করে কুল পড়তে থাকল, বৃষ্টির সময় যেমন শিল পড়ে—কখনও টুলুর মাথায়, কখনও ঘাড়ে, কখনও নাকের উপরে। টুলু কুল কুড়তে শুরু করেছিল। কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করল এক ধারে, একটু পরে মোহিতদাও সেখানে এসে বসলেন। নিজে দুটো কুল ফেলে দিলেন গালে, দুটো টুলুর কোলে ছুড়ে দিলেন।

"খাব মোহিতদা, আমি খাব?" টুলু জিজ্ঞাসা করল অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে।

"খাবি না কেন?"

"ফুল যে টক!"

"তাতে কী, খেতে তো ভাল লাগে," মোহিতদা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "তা হলেই হল। টুলু, তোকে এইসব বাজে ভয় ছাড়তে হবে।"

বাড়ি ফেরবার পথে একটা পুকুরধারে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মোহিতদা বললেন, "টুলু, তুই মাছ ধরতে জানিস?"

লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে টুলু বলল, "না।"

"গাছে চড়তে?"

"না।"

"সাঁতার কাটতেও তো জানিস না। সাইকেলে চড়তে নিশ্চয়ই শিখিস নি? নৌকো বাইতে জানিস? ঘুড়ি ওড়াতে?"

কান লাল হয়ে উঠেছিল, টুলু জোরে জোরে তিনবার বলে উঠল, "না—না—না।" তারপর মাটিতে চোখ রেখে পড়া-না-পারা ছাত্রের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু কিছু জানে না বলেই নয়, হঠাৎ উত্তেজিত হয়েছিল বলেও ও লজ্জা পেয়েছে।

মোহিতদার দিকে টুলু চোখ তুলে তাকাতেও পারছিল না। ও জানে, মোহিতদা ওকে ঘৃণা করছেন। সমবয়সী সব ছেলে যা পারে, তুমি তার কিছুই পর না টুলু, তুমি কি একটা মানুষ?

মোহিতদা ওকে কথাটা অন্যভাবে বললেন। বললেন, "টুলু, তোকে আমি সব শেখাব, যে কদিন এখানে আছি, তার মধ্যে যদি পারি। বাকীটা তোকে নিজের আগ্রহে আর চেষ্টায় শিখে নিতে হবে। তবে তুই জানবি, বেঁচে থাকা কাকে বলে।"

সেদিন পিসিমার কাছে টুলু অনেক বকুনি খেয়েছিল। কাঁদে নি। রাত্রে সমস্ত শরীরের গিঁটে গিঁটে অসহ্য ব্যথা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, জ্বর আসে নি।

পরদিন ওকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে মোহিতদা ডুব-জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পেটে অনেক জল গেল টুলুর, অনেকবার দম যেন বন্ধ হল, তবু সেদিনও জ্বর এল না।

পেয়ারাগাছে উঠে হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গিয়ে কপালের কাছে অনেকটা কেটে গেল, সে দাগ আজও আছে। চোখ বুজে টুলু অনেকক্ষণ পড়েই রইল, নিজেকে বলল, "আর আমি উঠতে পারব না, আমি মরে গেছি।" কিন্তু তবু, আশ্চর্য, খানিক পরেই শ্বাস নিতে, চোখ মেলতে পারল।

অবাক টুলু এক-আকাশ রৌদ্রের দিকে চেয়ে মরতে মরতে দৈবক্রমে বেঁচে গিয়ে বাঁচবার অর্থ কী, প্রথম জানল।

বেঁচে থাকার সুখ কী টুলু তাও জেনেছিল।

লিলিদিকে প্রথম থেকেই তাব ভাল লাগে নি।

[এ বিষয়ে সৌরেশবাবু বহু পরে তাঁর 'দিনান্তলিপি'তে লিখেছিলেন: "কোন্‌টা ভাল লাগে নি—লিলিদিকে, না তাঁব পোশাকটাকে, এখন বলতে পারব না। তখনও পাবতাম না। তখন অস্পষ্ট একটু বোধমাত্র ছিল। লিলিদি যে ধরনে শাড়ি পরতেন, হয়তো সেই ধবনটাকে। পায়ের পাতার কাছ থেকে পাক খেতে শুরু কবে শাড়িটা কাঁধ অবধি উঠত, কাঁধটাকেও এক পাক জড়িয়ে বুকের কাছে থেমে থাকত। ধবনটাকেই কি সেই বয়সে মানুষ বলে ভুল করেছিলাম? জানি নে। হয়তো যে-সব বঙের শাড়ি পরতেন লিলিদি, তাও আমার অপছন্দ ছিল। হয়তো তিনি বিনুনিটাকে খোঁপায় সংবৃত না করে যে-ভাবে পিঠে ফেলে রাখতেন, আমার তাও ভাল ঠেকত না। আমাব খারাপ লাগত তাঁব বার বার কবে বুকেব আঁচল সামলানো আব সবানো, এখনও বুঝতে পারি নে, লিলিদি ঠিক কী চাইতেন—আঁচল বুকে রাখতে, না এক পাশে সরিয়ে রাখতে। যে এসেন্স মাখতেন লিলিদি, তাব গন্ধ ভাল নয়, যে পাউডার মুখে ছড়াতেন, তা তাঁব ময়লা রঙে মোটে মানাত না। এই সব কতকটা অজ্ঞাতসারেই অনুভব কবে সেদিন তাঁকে অপছন্দ কবেছি। আজ বিশ্লেষণ কবেই দেখি না, সুবিচার কবেছি কি না। আসলে তো আমি লিলিদিকে জানি নি, জানতে চাই নি—দেখি নি, দেখতে পাই নি। আমি এমন সব-কিছু নির্বোধ নজবে লক্ষ্য করে বিরূপ হয়েছি, যা আসলে লিলিদিই নয়, ধার-করা জিনিস। কোনটা তাঁকে দিয়েছে স্নো-সাবানেব দোকানদার, কোনটা শাড়ি-ফিরিওয়ালা। মাত্র এইটুকু দেখে মানুষকে বিচাব কবব কেন?

"আমিও তো কোনদিন ক্রীমবঙেব শার্ট পবি, সেদিন আয়নায় নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। নতুন গাবাডিনেও কোটটায় আমাকে চমৎকার মানিয়েছিল, সবাই বলেছে। আর উই দেন জাস্ট হোআর্ট আওয়ার টেলস' মেক্ অভ আস্? অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়। তবু বাইবের লোকের কাছে অনেকটাই তাই।

"অনেকটাই তাই, সেইজন্তেই চাই রুচি। রুচি দিয়ে বাইরের অনেকখানিকেই

সুন্দর করে তুলতে পারি। লিলিদিও পারতেন। কিন্তু তাঁর রুচি ছিল না। অন্তত টুলু তার কোনও প্রমাণ পায় নি।

"কিন্তু রুচি থাকলেই বা কতটা হত! বড় জোর বাইরের আবরণটাই চলনসই হত। অন্তরের রূপ তাতে বাড়ত না। দেহের রূপের ঘাটতিই বা কি মিটত? রুচি দিয়েও তো লিলিদি তাঁর গড়নের খুঁত ঢাকতে পারতেন না, কিংবা গায়ের চামড়ার সেঁকা-সেঁকা রঙ মোছা যেত না; এগুলো যে দৈবায়ত্ত কিংবা পিতৃমাতৃদত্ত। লিলিদি তাঁর ময়লা রঙ হয়তো পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছ থেকে, কাঠ-কাঠ লম্বা গড়নটা হয়তো তাঁর বাবার। ছোট ছোট চোখ দুটি কে জানে, সম্ভবত তাঁর মায়ের। আবার বেমান রকমের খাড়া নাকটা হয়তো তাঁর বাবার দেওয়া।

"এজন্যে লিলিদির মনে কি কোন ক্ষোভ ছিল? নিশ্চয়ই ছিল। অভিযোগ?—কার বিরুদ্ধে? কেন, বাবা আর মার! মনে তো হয় না। বাবা তাঁর জন্যে যথেষ্ট টাকা রেখে যান নি বলে লিলিদি হয়তো তাঁকে মনে মনে অনেকবার দায়ী করেছেন। কিন্তু সুরূপা করেন নি—এ দোষটাও যে বাবার, এটা লিলিদি হয়তো কোনদিন ভেবেই দেখেন নি। কেউ দেখে না। আমরা নিজেকে দেখি আয়নায়, দেখি অন্যের চোখে। দেখতে দেখতে কবে যেন রূপটাকে সত্তারই একাংশ বলে ভাবতে শিখি। তাকে প্রথমে অনিবার্য বলে মেনে নিই, অবশেষে তাকে ভালবেসে ফেলি। সে আমাব, সেই আমি। তার তিলমাত্র সৌন্দর্যকেও বড় করে দেখি, তাল-প্রমাণ কুশ্রীতা চোখে পড়ে না।

"শুধু রূপ কেন, স্বরূপও কি আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত নয়! আশা বাসনা নৈরাশ্য নীচতা আসক্তি—যা নিয়ে আমি, তারও কি অনেকটাই আমার বাবা বা মার কাছ থেকে পাই নি? তবু সেই দোষ আর গুণ মিলে সবটাই এখন আমার হয়ে গিয়েছে।"]

একেবারে খট খট করে চলতেন লিলিদি, সোজা-করে-রাখা মাথাটা সাপের ফণার মত এদিক-ওদিক হেলত, কিন্তু প্রথম দিন তিনিও যেন একটু জড়সড় হয়ে গিয়েছিলেন।

চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েক মিনিট, ভিতরে আসতে পারছিলেন না।

পিসিমা বলেছেন, "এস, এস না, লিলি।"

সহজাত বুদ্ধি দিয়েই টুলু বুঝতে পেরেছিল, লিলিদির সঙ্কোচ মোহিতদার

জন্যে। সে নীরব দুই চোখ দিয়ে মোহিতদাকে অনুনয় করে বলছিল, মোহিতদা, উঠো না, উঠো না, বসে থাক। তা হলেই চৌকাঠে আরও বারকয়েক পা ঘষে লিলিদি আজকের মত বিদায় নেবে। আমাকে পড়তে হবে না।

কিন্তু মোহিতদা তার চোখের ভাষা সম্ভবত বুঝলেন না, চট করে শার্ট পরে বললেন, "কাকিমা, আমি একটু ঘুরে আসি।"

"এই ঠাণ্ডায় বেরুবি?"

"ঠাণ্ডা কোথায়! বেশী দেরি করব না তো, বড় জোর ঘণ্টাখানেক। ক্লাবে গিয়ে আজকের কাগজটা শুধু দেখে আসব।"

লিলিদির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মোহিতদা। লিলিদি আরও আড়ষ্ট হয়ে এক ধারে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে ভিতরে এসে চেয়ারে বসে তিনি যা কখনও করেন না তাই করলেন, হাতের পাতায় কপালের ঘাম মুছে ফেললেন।

"অঙ্ক কটা কষেছ?" জিজ্ঞাসা করলেন আস্তে আস্তে।

ঘাড় নেড়ে টুলু খাতাটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে দিল। অন্যমনস্কভাবেই লিলিদি খাতাটাকে টেনে নিলেন, চোখ বুলিয়ে গেলেন পাতায় পাতায়। দুটো অঙ্ক ভুল হয়েছিল, পাশে কাটা-চিহ্ন দিলেন, কিন্তু বকলেন না। রোজ কিন্তু বকতেন। আসলে টুলু টের পেয়ে গিয়েছিল, লিলিদির আজ পড়ানোয় মন নেই, থেকে থেকে উসখুস করছেন, নমো-নমো করে পড়ানো শেষ করে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন আধ ঘণ্টাও পুরো হয় নি।

পিসিমা কাছেই ছিলেন, বললেন, "আজ এখুনি উঠলে?"

"শরীরটা ভাল নেই, মাসিমা," লিলিদি জুতো পরতে পরতে বলেছেন আর দাঁড়ান নি।

মোহিতদা অনেক দেরি করেই ফিরেছেন। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটা কে কাকিমা?"

"সন্ধ্যাবেলা যে এসেছিল? ও হল লিলি—এখানকার হাসপাতালের মিডওয়াইফ নিভাদির মেয়ে। টুলুকে পড়ায়।"

মোহিতদার চোখে কৌতুক ফুটল: "মেয়ের কাছে পড়িস বুঝি তুই? তাই এত মেয়েলী হয়েছিস।"

টুলু নিজেও লিলিদিকে পছন্দ করে না, তাঁর কাছে পড়াও না। তবু মোহিতদার তাচ্ছিল্যের ভাবটা তার ভাল লাগে নি। তার শিক্ষয়িত্রীকে মোহিতদা সম্মান দিচ্ছেন না, এটা যেন তাকেও বাজল।

টুলু তাড়াতাড়ি বলতে গেল, "কেন, লিলিদি তো—"

মোহিতদা ততক্ষণে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছেন।

লিলিদি পরদিনও এলেন, রোজই আসতেন, কেননা টুলুর অনেক দিন আর জ্বর আসে নি। মোহিতদা লিলিদি এলেই শার্টটা গায়ে দিতেন, বেরিয়েও যেতেন ঠিক। লিলিদি ভীরু বিব্রতভাবে ততক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

প্রায় নিয়মের মত হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে মোহিতদা অবশ্য তাড়াতাড়ি ফিরেও এসেছেন, তখনও হয়তো টুলুর পড়া শেষ হয় নি, বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে লিলিদির বকুনি শুনেছে। এবার মোহিতদার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পালা।

পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে যেত টুলু। শুনতে পেত, মোহিতদা আস্তে আস্তে কাশছেন। বাইরে ঠাণ্ডা, বাইরে হিম। তবু মোহিতদা কেন ভিতরে এসে বসছেন না! টুলু বুঝত না।

কিন্তু একদিন মোহিতদা বাইরে যেতেই পারলেন না।

সেদিন লিলিদি প্রায় বর্ষা মাথায় করেই এসে পৌঁছেছিলেন। অকালের বৃষ্টি, চারধার কালো হয়ে এসেছিল, হাওয়া ছিল না। হ্যারিকেনের শিখাটা থেকে থেকে শিউরে উঠছিল।

পিসিমা বললেন, "এর মধ্যে আবার কোথায় যাবি? ভিতরেই বোস্ না! লিলি, তুমি এই বৃষ্টি মাথায় করে এলে?"

লিলিদি বললেন, "বাড়ি থেকে বের হবার সময় কিছু টের পাই নি মাসিমা, বৃষ্টিটা একেবারে হঠাৎ এল।"

মোহিতদা ইতস্তত করছিলেন। লিলিদিকে মৃদুস্বরে বলতে শোনা গেল, "বসুন না, উনিও বসুন না মাসিমা।"

গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে টুলু খাটের উপরে গিয়ে বসে ছিল। পিসিমার কাঁধের কাছে মুখ নামিয়ে সে বলল, "আজ আর পড়ব না।"

"পড়বে না?" স্বভাব-শিক্ষয়িত্রী লিলিদি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন: "পড়বে না, তবে আমি করব কী! সমস্তক্ষণ এইভাবে বসে থাকব?"

বসে থাকতে হয় নি। দু-একটা কথার পর পিসিমাই বলেছিলেন, "খুব ভাল গান জানে যে লিলি। একটা গাও না!"

লিলিদি প্রথমে রাজী হন নি। অনেক পীড়াপীড়িতে শেষে তাঁকে গলা খুলতে হয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে শুনছিল টুলু। রুক্ষ-স্বভাব রোগা লিলিদি, যে

বিশ্রী পোশাক পরে, সে যেন মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। এই খানিক আগেও যে খটখটে জুতো পরে টুলুকে পড়াতে এসেছিল, এ যেন ঠিক সে নয়, তার থেকে কিছু আলাদা। টিনের চালে ঝর-ঝর ফোঁটায় তাল পড়ছে, নিবু-নিবু হ্যারিকেনে ঘরটা অন্ধকার আর আলোর মাঝখানের সীমায় একটি সুরে বিদ্ধ হয়ে সুখে কাঁপছে, এই চিত্রটি অনেকদিন টুলুর মনে ছিল। সেই একটা দিন সে লিলিদিকে একটুখানি ভালবেসে ফেলেছিল কিনা।

গান শেষ হতেই লিলিদি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

"এবার যাই, বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।"

তখনও একেবারে বৃষ্টি থামে নি, পিসিমা তাই একটা ছাতা দিলেন ওঁর হাতে। মোহিতদাকে বললেন, "একা অন্ধকারে এতটা পথ যাবে। যা না তুই, ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।"

কুণ্ঠিত লিলিদি বলেছিল, "না না, উনি কেন আবার—"

পিসিমা সে আপত্তি শোনেন নি।

টর্চ হাতে নিয়ে মোহিতদা নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছনে লিলিদি। দুজন মানুষ প্রথমে ছায়া, পবে অন্ধকাব হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল।

ফিরে এসে মোহিতদা বলেছিলেন, "কাকিমা, লিলির তো বাবা বেঁচে আছেন।"

"আছে। কিন্তু এক সঙ্গে থাকে না।"

"লিলিও তাই বলল।"

আর-কোনও কথা হল না। হয়তো কোনও কথা ছিল না। কিংবা টুলু ছিল বলেই ওঁরা প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। অতএব টুলু কিছু বুঝল না, তখন বুঝল না।

অনেক দিন পরে গৌরেশ 'দিনান্তলিপি'তে লিখেছিলেন : "সেই বয়সটাই ছিল কিছু না-বোঝার বয়স। আমাদের আলনায় অনেকগুলো পোশাক আছে—এক-একটা সময়ে আমরা এক-একটা পোশাক পরি। পোশাকগুলো যাঁর হেপাজতে, তাঁরই খেয়াল-খুশিমত পরি—কখনও নির্বোধের, কখনও বিষয়ীর, কখনও পাণ্ডিত্যাভিমানীর, কখনও কামুকের বা উদারচরিতের। কিংবা বলা যায়, আমাদের মধ্যেই কয়েকটা পুতুল আছে, যখন যেটাকে সুতো ধরে নাড়া হয়, তখন সেটাই সামনে এগিয়ে আসে, হাত-পা তোলে, নামায়, নাচে। সেই পুতুলটাই তখনকার মত আমাদের সত্তা হয়ে যায়। অন্তত

সেইরকম ভান করে। সেই কম বয়সে সেই পুতুলটাই বেণীর ভাগ সময় সুমুখে এসেছে, যার মুখ নির্বোধের মত, ভাবলেশহীন, রেখাহীন। আঁকা দুটি চোখ মেলে সে সব দেখে, কিন্তু ঠোঁট নড়ে না, চোখের পলক পড়ে না। কিছু বোঝার শক্তি তার নেই, তাকে কিছু বুঝতে নেই।"

এর পরের কয়েকটা ছবি অস্পষ্ট মলিন। দু-একটা ছবি হয়তো নেইও। একটু ভুল হল। আছে নিশ্চয়ই কোথাও আড়ালে, কোন কোণে চাপা পড়ে গিয়েছে, সৌরেশ দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে আমরা কত কিছুই তো পাই না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আছে। দেখতে না পাওয়ার একটা কারণ, নজর পৌঁছয় না। বহু আলোকবর্ষের পারের তারা দেখি না। আহ্নিকগতিহীন গ্রহ বা উপগ্রহের অপর পিঠও অজানা থেকেই যায়। এমন কি, কাছের পাহাড়টারও ওই দিকে কী, আমরা কজন জানি! আর দেখা জিনিসটা নির্ভর করে যে দেখবে সে কোথায় দাঁড়িয়েছে তার উপরে। ছাদে দাঁড়িয়ে যতটা দেখব, মাটিতে দাঁড়িয়ে ততটা দেখব না, নদীর বাঁকে বসে দূরের নৌকোর শুধু পালই দেখতে পাব।

যার কপালের ডান ধারে কাটা দাগ, আব চুলও পাতলা হয়ে এসেছে তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে চাইলে মনে হবে, লোকটা ক্রূর এবং প্রৌঢ়, আবার ওদিকে গিয়ে হয়তো দেখব, সে তরুণ, তার চিবুকের ভঙ্গিটি মধুর। পিছন থেকে যার গ্রীবা আর কবরী মুগ্ধ করেছে, সামনে গিয়ে দেখেছি সে শ্রীহীনা, কুদর্শনা।

আবার খালি চোখ যতদূর পৌঁছয়, রঞ্জনরশ্মি যায় তার ঢের গভীরে, কিন্তু কাঠের সিন্দুকটার ভিতরে কী আছে সেও জানে না। মন বুঝি কিছুটা রঞ্জনরশ্মির গুণ পেয়েছে, তাই চোখ যা দেখে, মন দেখে তার অনেক বেশী। এক মন দিয়ে আমরা অন্য মনের তলায় পৌঁছে যাই। একেবারে তলায়? বোধ হয়, না। দৃষ্ট জগৎ থেকে অদৃষ্ট জগৎ বড। অদৃষ্টের বাইরে আছে অভাবনীয়। ভাবনার বেড়ে সেই বিরাট ধরা দেয় না।

সারা সকাল যে ঘরের কর্ত্রী, বাজারের পয়সা বুঝে নেবার সময়ে বিষয়ী, রান্নাঘরে নিপুণা পাচিকা, বিকালে সে-ই পাট-ভাঙা একটা শাড়ি আর কপালে একটি টিপ পরে অপরূপা হয়ে ওঠে। ঠিকে ঝি একদিন কামাই করলে

যে রোজ-হিসাবে ছ'পয়সা মাইনে কাটে, ভাল একটা ছবি দেখে বেরিয়ে এসে সেই হঠাৎ-খুশির ঝোঁকে ভিখারীকে ছু আনা দিয়ে বা দিতে চেয়ে মহীয়সী হয়ে যায়। তাই বলে কাল দেবে না। পোষা সাপ ফণা আর কতবার তোলে! বেশীর ভাগ সময় তো ঝাঁপির ভিতরে নেতিয়েই থাকে। দিনের মোহিনীকে রাতের বাঘিনী হতে সকলেই তো দেখেছেন।

অতএব দেখা গেল, আত্মসমাহিত সৌরেশ আপনাকেই বললেন, কোথায় দাঁড়িয়ে দেখব সেটার গুরুত্ব যত, কখন দেখব তার গুরুত্বও ততটাই।

কিন্তু সেই ছবিগুলো? যাদের সৌরেশ এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন না? তারাও আছে। রঙ ধুয়ে গিয়েছে, আলো মুছেছে, তবু আছে কণা হয়ে, ধুলো হয়ে,—ইন্দ্রিয়ের, এমন কি স্মৃতির অগোচর হয়ে। আরও সূক্ষ্ম হয় যদি মাত্র স্পন্দন বা তরঙ্গে পরিণত হয়, তখনও থাকবে।

লিলিদিকে একদিন কাঁদতে দেখেছিল টুলু, একদিন হাসতে। ছুটো ছবিই মনে আছে।

ছবি ঠিক নয়, আসলে চলচ্চিত্র। ফুটবল খেলা দেখে ফেরবার পথে হাসপাতালের সম্মুখে একদিন থমকে দাঁড়ালেন মোহিতদা।

"এই পাশের কোয়ার্টারটাই তো লিলিদের, না? একবার দেখা করে যাই। তোকে তো ও তিন-চার দিন পড়াতে আসে নি। কেন, একবার জেনে যাবি না?"

কোয়ার্টারের সামনে কেয়ারি-করা একটা বাগান ছিল, মোহিতদা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, টুলু ভিতরে খবর দিতে গেল। সৌরেশ এতদিন পরেও রোগা সেই ছেলেটিকে ফটক ঠেলে তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছুটতে দেখলেন।

সে বেশী দূর যেতে পারল না, ছু ধাপ সিঁড়ির পরেই খোলা বড় বারান্দা, সেখানেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। বাঁ ধারের ঘরটাই লিলিদির, টুলু জানত। কিন্তু দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ, না বাইরের ছিটকিনি লাগানো—আলো নেই বলে সে ঠিক ধরতে পারল না। হয়তো এগিয়ে যেত, হয়তো টোকা দিত কিংবা বাইরে থেকেই ঠেলে বা টেনে দেখত একবার; কিন্তু তখনই ডাঁন ধারের ঘরে কারা জোর গলায় কথা বলছে শুনতে পেল।

সেই ঘরের দরজা ভেজানো, ভারী পর্দাটা না থাকলে টুলু ভিতরটাও দেখতে পেত।

ভিতরে চেঁচামেচি, তাই টিকতে না পেরে, অথবা ভয় পেয়ে খানিকটা

আলো পর্দার নীচে দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে পালিয়ে এসেছে। দেবদারু-গাছটার ছায়ার সঙ্গে বারান্দাটা দখল করেছে ভাগাভাগি করে।

কিন্তু ভিতরে কারা কথা বলছে! কয়েক সেকেণ্ড কান পেতেই টুলু বুঝেছিল, কথা তো বলছে না, ওরা ঝগড়া করছে। ঝগড়া কাকে বলে টুলু জেনেছিল। লোকে যখন চটে যায়, রাগ করে, তখন কথা আর কথা থাকে না, ঝগড়া নামে একটা বিশ্রী চেঁচামেচি হয়ে যায়। নিজেদের বাড়িতে কোনদিন ঝগড়া হতে টুলু দেখে নি, কিন্তু রাস্তায় বা খেলার মাঠে অনেকবার নমুনা দেখেছে।

টুলু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। দুটি গলার একটিকে সে চিনতে পারছিল—লিলিদির মার। মোটাসোটা ময়লা এই লেডি ডাক্তারকে টুলু বরাবরই ভয় পেয়েছে। একবার দুবার ওদের বাসাতেও এসেছিলেন, পিসিমার সঙ্গে কথা বলেছেন। সে গলা মোটেই মেয়েলী নয়, মানে পিসিমার মত নয়। কেমন যেন ধরা-ধরা, রাগী-রাগী, একটু যেন অহঙ্কারীও।

আজ কিন্তু লিলিদির মার গলার গাম্ভীর্যটুকু নেই। মনে হল, তিনি ভয় পেয়েছেন। প্রাণপণে চিৎকাব করছেন বটে, আমরা ভয় পেলে, হঠাৎ ভূত দেখলে বা সাপ দেখলে যেমন চেঁচিয়ে উঠি। এ চিৎকারে জোর নেই, সাহস নেই।

আর-একটি গলা, সে-গলা পুরুষের, জোব তারই বেশী। অমন যে রাশভারী ডাক্তারনী, লোকটা ধমক দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে চুপ করিয়ে দিচ্ছে। তার কণ্ঠস্বব গাঢ়, দুধ-কলা-মাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলে কথা বলতে গেলে টুলুর গলাও ওই রকম হয়ে যায়। বেশী চড়ছে না, তবু তার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটা গমগম করে উঠছে।

তখনও নয়, আর-একটু বড় হয়ে টুলু লোকের গলা শুনেই মনে মনে তার ছবি আঁকতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ছবিগুলো সব সময়েই যে ঠিক হত তা নয়, তবে প্রায়ই আসলের ধার ঘেঁষে চলে যেত। মজা পেত টুলু, এমন কি যখন সে সৌরেশ হয়েছে, তখনও মজা পেয়েছে। এই খেলাতে নেশার আকর্ষণও পেয়েছে।

কিন্তু সেদিন কার্তিকের বিরস জরজর সন্ধ্যায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে টুলু লোকটার মুখের আভাসটুকুও মনে আনতে পারে নি। এমন ভারী গলা যার সে যে নিশ্চয়ই খুব লম্বা-চওড়া হবে, তার কবজি আর বুক নিশ্চয়ই খুব ঘন আর কালো লোমে ঢাকা, এইটুকু মাত্র আন্দাজ করতে পেরেছিল। কিন্তু লোকটার গায়ের

রঙ কালো কি না, নাকটা কতখানি থ্যাবড়া, মাথাটা কি ঘড়ের উপরেই বসানো, না কি ঘাড় নামে বিঘত-প্রমাণ একটা যোজক আছে, মাথার চুল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া, নাকি শৌখিন কেতায় ছাঁটা—এসব কিছু সে অনুমান করতে পারে নি। তবু বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে মনে মনে সেও ভয় পেয়েছিল। লোকটা কে? কড়া লেডি ডাক্তারকে যে শুধু গলাবাজি করে জব্দ করছে, টুলুকে সে তো তুড়ি মেরে হাওয়া করে দিতে পারে। টুলু ভয়ে কাঁপছিল, দেবদারুগাছটার ছায়ার দিকে এক-পা দু-পা করে পিছিয়ে আসছিল।

লোকটা বলছিল, "আমাকে টাকা দেবে না তুমি?"

"বলেছি তো, টাকা নেই।"

"মিথ্যেবাদী।"

"বিশ্রী গালাগাল দেবে না, খবরদার। টাকা থাকলেই বা তোমাকে দেব কেন?"

"দাম দেবে।"

"দাম! কিসের?"

"আমার পদবী যে ব্যবহার করতে পারছ, তার দাম। ভাড়াও বলতে পার। বেশী না তো, বছরে মাত্র এক হাজার টাকা।"

"এত?"

লোকটা জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এত। বরং সস্তাতেই পাচ্ছ বলতে পার। আমি তোমার স্বামী, প্রমাণ এখনও আমার পকেটে আছে, কোর্টেও তার নকল পাবে, কিন্তু সেই অধিকাবে বেশী কিছু দাবি তো করি নি, অন্য কোন অধিকার খাটানোর লোভই আমার নেই, ওই তো তোমার শবীর আব বয়সে তো তুমি বুড়ী।"

"ছোটলোক!"

টুলু সব দেখে নি, বোঝে নি, সব তার মনেও ছিল না; কিন্তু সৌরেশ আজ দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন, বিস্মৃতির অতল থেকে সব কথা বুদ্বুদের মত ভেসে উঠছে। টুলু অবোধ ছিল, অন্ধও; কিন্তু সৌরেশ তা নন, এখন নন, তাই স্পষ্ট দেখতে পেলেন, লোকটা একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্রুদ্ধ মহিলাব মুখে অনায়াসে ধোঁয়া ছড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে গেল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমার পদবীর মাশুলটা দিয়ে দাও। নইলে—"

"নইলে কী?"

"নইলে পদবীটা ফিরিয়ে নেব।"

"কী করে?"

"খুব সোজা রাস্তা। হাসপাতালের কমিটি জানবেন, যাকে তাঁরা মিসেস লাহিড়ী বলে জানেন, সে গুহ-পদবীধারী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, বসবাসও করেছিল বছরখানেক একসঙ্গে। তারপর গুহ যখন নেশা শেষ হতে ওকে ফেলে পালাল, তখন সে লাহিড়ী নামে লোকটার পায়ে উপুড় হয়ে কেঁদে বলল—"

"ইস! একেবারে পায়ে?"

"আজ তোমার মনে নেই, সেদিন পায়েই ধরেছিলে। আমার পদবী ভিক্ষা চেয়েছিলে। কারণ—থাক্, সে কারণটা না হয় লিলিকেও বলব।"

"কী বলবে তুমি লিলিকে?"

"বলব যে, আমার পদবী ধার দেবার উদারতা দেখিয়ে সেদিন শুধু তার মায়ের সম্মান বাঁচাই নি, তাকেও সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর পরিচয় দিয়েছি। লিলি লাহিড়ী আসলে লিলি গুহ।"

"অসভ্য, ইতর!" টুলু তীক্ষ্ণ-তীব্র স্বর শুনে চমকে উঠেছিল, দেখতে পায় নি, কিন্তু সৌরেশ দেখতেও পেলেন। ক্ষোভে রোষে ঘৃণায় লিলিদির মা ফুঁসছিলেন। জলভরা একটা গ্লাস ছিল, সেটাকে হাতে তুলে নিলেন। এক মুহূর্ত শুধু যেন ইতস্তত করলেন। রুদ্ধশ্বাস সৌরেশ অপেক্ষা করে আছেন, গ্লাসটা লোকটার মাথায় পড়ল বলে, তারপর টুকরো টুকরো কাচ হয়ে মাটিতে পড়বে ছড়িয়ে, জলে রক্তে ঘরটার মেঝে ভেসে যাবে।

ঠিক এক মুহূর্ত কাটল, তারপর কোথায় তাক করবেন—লোকটার কপাল না চোখ না নাক, সেটা যেন স্থির করতে না পেরেই লিলিদির মা ঢক ঢক করে সবটুকু জল খেয়ে ফেললেন।

জল খেয়ে সুস্থির হয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "বেশ, তুমি দাঁড়াও। লিলিকে ডেকে আনছি। লুকোচুরিটা একেবারে শেষ হয়ে যাক।"

তখনই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল, লোকটা যেন বিব্রত হয়ে হঠাৎ সবে-ধরানো দ্বিতীয় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল। তাড়াতাড়ি বলল, "আজ থাক্। আজ না। কাল সকালে আমি আবার আসব।"

লোকটা সত্যিই বুঝি চলেই আসছিল, লিলিদির মা ঢকঢক করে সবটুকু

জল খেয়ে ঘাড়ের পিছনে দু হাত নিয়ে খুলে ফেললেন গলার হার, সেটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "নিয়ে যাও এটা। কাল সকালে এসো না। আর কোনদিন এসো না। আমাকে একটু শান্তি দাও।"

লোকটা হেসে উঠল নির্লজ্জের মত। লোভ নামে তৃতীয় রিপু ওর দ্বিতীয় রিপুকে নিমেষে বশ করেছে।—"শান্তি? বেশ, নাও। একদিন শুধু পদবী চেয়েছিলে, আজ আবার শান্তিও চাইছ? বেশ, তোমাকে ওটা উপরি দিলাম।"

সৌরেশ দেখলেন, টুলুও দেখতে পেয়েছিল, লোকটা বারান্দায় এল, দাঁড়াল কি দাঁড়াল না, বোধ হয় সিঁড়িটা ঠাহর করল, তারপর রাস্তায় নেমে গেল। টুলু যেমন ভেবেছিল, রোমশ পরুষ চেহারা—কই, আদৌ দেখতে তেমন নয় তো! লম্বা রোগা গালের-হাড-বের-করা চেহারা এই লোকটারই গলায় অত জোর ছিল?

টুলু দেখেছিল, লোকটার হাতে হারটা আধো-অন্ধকারেও চকচক করছে। আড়ালে যা ঘটল, সেটার প্রকৃত তাৎপর্যটুকু বুঝতে পারে নি, তবু টের পেয়েছিল, হারটা হাতছাড়া না করে লিলিদিব মার সেদিন উপায় ছিল না।

যদি সৌরেশের মত অভিজ্ঞ চোখ থাকত তার, তবে টুলু সেদিনই টের পেত, লিলিদির মা কী ভুল করেছেন! যদি সাহস করে সেদিন লিলিদিকে ডেকে আনতেন, দাঁড় করিয়ে দিতেন লোকটাব মুখোমুখি, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটাই বদলে যেত। লোকটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। পথ পেত না ঘর থেকে মাথা নিচু করে পালিয়ে যেতে। রহস্য ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে যারা টাকা আদায় করে, রহস্য শেষ পর্যন্ত ফাঁস তারা প্রাণ গেলেও করে না, কেননা ওই রহস্যটুকুই তো তাদের ব্যবসার একমাত্র পুঁজি, একবার হাতছাড়া হলে পরে আর ভয় দেখাবে কী দিয়ে! গোপন কথাটি বলে দেবে মুখে যতই বড়াই করুক, আসলে তাকে যখের ধনের মতই বুক দিয়ে আগলে রাখে।

এই তথ্যটি যদি জানা থাকত লিলিদির মার, তিনি মরবার জন্যে যদি তৈরি করতে পারতেন নিজেকে, হয়তো চিরদিনের মত বেঁচে যেতেন।

লোকটা যখন বেরিয়ে এল, টুলু তখন অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে একেবারে মিশে ছিল। তখন তার খেয়াল হল, এবার তাকেও যেতে হবে। আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন মোহিতদা?

পা টিপে টিপে চলে আসবে টুলু, তখনই লিলিদিকে দেখতে পেল।

ঐ-পাশের ঘরের দরজা হঠাৎ বুঝি একটুখানি খুলে গিয়েছে—টুলু দেখল লিলিদি বিছানায় শুয়ে আছেন। দু হাতে চোখ ঢাকা, মনে হল কাঁদছেন।

অন্য দিন লিলিদির শাড়ির রঙ থেকে সাজের ঘটা টুলুর মনে বিতৃষ্ণা এনে দেয়। আজ সে-সব কিছু হল না, কিংবা লিলিদি আজ হয়তো সাজগোজই করেন নি, সাদা ব্লাউজের ওপরে সাদাসিদে একটা শাড়ি পরে আছেন। এটুকুও টুলুর তখন লক্ষ্য করবার কথা নয়, কেননা লিলিদি কাঁদছিলেন। টুলু বিচলিত হয়েছিল। কাছে যেতে সাহস হয় নি, তা হলে ধরা পড়ে যাবে। বিমূঢ় বিহ্বল টুলু চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান্নাটার কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করেছিল।

এমন হতে পারে, একটু আগে পাশের ঘরে যে ঘটনা ঘটে গেল, তার সঙ্গে এই কান্নার কোন যোগ আছে। হয়তো লিলিদিও সব শুনেছেন আড়াল থেকে, হয়তো কিছুটা দেখেছেন। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলে না, টুলু ঠিক করল, মানেটা সে মোহিতদার কাছে জেনে নেবে।

মোহিতদাকে সব বলেছিল টুলু। সব মানে, যতটা সে দেখেছিল, যতটা মনে রাখতে পেরেছিল ততটা। অনেকটাই সেদিন তলিয়ে গিয়েছিল কি-না, সে সব ভেসে উঠেছে পরে, অনেক—অনেক বছর কেটে গেলে।

মোহিতদা চুপ করে শুনলেন, শোনার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে আস্তে আস্তে বললেন, "সব বুঝলাম। টুলু, তুই কাল ভোরে লিলিকে একবার ডেকে আনতে পারবি?"

টুলু বলল, পারবে। এদিকে সে মরে যাচ্ছিল। মোহিতদা সব বুঝেছেন, সে কিছুই বোঝে নি, অথচ বুঝতে চায়।

ঔৎসুক্য তো খুব বেশী নয় টুলুর, সে জানতে চায় না দিন ফুরিয়ে কেন রাত হয়, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে কেন, গাছের পাতা কেন সবুজ! এসব শক্ত জটিল জিজ্ঞাসা দিয়ে মোহিতদাকে সেদিন সে বিরক্ত বা বিব্রত করে নি। আস্তে, খুব ভয়ে ভয়ে বলেছে, "কিন্তু লিলিদি কাঁদছিল। কেন, মোহিতদা?"

ঠিক ততটাই আস্তে মোহিতদা ওকে বলেছেন, "কাঁদে। না থাকতে পেরে মানুষ অনেক সময়ে এ রকম কাঁদে। বেঁচে থাকার সুখ-দুঃখ দুইই আছে, টুলু, তুই তা এখন বুঝবি না।"

একেবারে বোঝে নি তা নয়, টুলু সেদিনই বুঝেছে, অস্পষ্টভাবে। পরদিন লিলিদির হাসিটাও তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে নি।

খুব সকালেই সে ও-বাসায় গিয়েছিল।

আড়ালে ডেকে লিলিদির হাতে যখন মোহিতদার চিঠি দিল, লিলিদি একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, "বেশ, যাব। তুমি একটু দাঁড়াও।"

লিলিদি সেই প্রথম টুলুকে 'তুমি' বলল।

লিলিদির একটু দেরি হচ্ছিল। টুলু অধৈর্য হয়ে একবার ওর ঘরের দরজা ঠেলল, ঠেলেই বুঝল কাজটা ঠিক হয় নি। লিলিদির তখনও সাজগোজ পুরো হয় নি। মুখে পাউডার মেখেছেন, আবার আলগোছে আঁচলটা দিয়ে মুখটা মুছেও ফেলেছেন।

চিরদিনের মত মেয়েদের প্রসাধন-প্রিয়তা সম্পর্কে একটা ধারণা টুলুর মনে আঁকা হয়ে গেল: মেয়েরা সাজতে যতটা ভালবাসে, সেজেছে যে সেটা লুকিয়ে রাখতেও ততটাই ভালবাসে।

পিসিমা রান্নাঘরে, টুলুও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল, মোহিতদা লিলিদির সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ খানিক পরে একবার ভিতরে যেতে হয়েছিল টুলুকে, কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। লিলিদির হাত মোহিতদার হাতের মুঠিতে, লিলিদির মাথা মোহিতদার কাঁধে। চোখ দুটি খোলা না বোজা টুলু দেখার সময় পায় নি, কিন্তু লিলিদি হাসছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল টুলু। ওই হাসিটা বেঁচে থাকার সুখের প্রকাশ কি না, সেটা মোহিতদাকে জেরা করে আর জেনে নিতে হয় নি।

সেদিন অতটা ভাল লাগে নি, অস্বস্তি হয়েছে, অস্বাভাবিক লেগেছে। পরে কিন্তু টুলুর মন থেকে বিরাগের ভাবটা একেবারে উবে গিয়েছিল।

মোহিতদা অবশ্য লিলিদিকে বিয়ে করেন নি। টুলু যতটা জানে কয়েকটা চিঠি লেখালেখিতেই সম্পর্কটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, মোহিতদা আর ফেরেন নি, লিলিদি অন্ত্রঘটিত কী একটা ব্যায়ে ভুগে ভুগে কাঠিসার হয়ে শেষ অবধি খিটখিটে হয়েছিলেন এবং চিরকুমারী থেকে গিয়েছিলেন। তবু বয়স হবার পর টুলু দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। মনে মনে কতবার বলছে, "মোহিতদা, আমাকে বেঁচে থাকার স্বাদ তুমিই প্রথম দিয়েছ, ঘুরিয়েছ মাঠে মাঠে, টেনে নিয়ে গিয়েছ বিলের ধারে, জলে সাঁতার দেবার সাহস জুগিয়েছ। তাই তো আমি রুগ্ন তবু বাঁচতে চাইলাম, নইলে শুধু মরে যাবার ইচ্ছে নিয়েই আমি কবে মরে যেতাম। আর লিলিদি, তোমার হাসি আর কান্না দেখে প্রথম জেনেছি, বেঁচে

থাকার সুখ আর দুঃখ কী! জেনেছি, জীবন যদি ফুল হয়, তার পাপড়ি আর কাঁটা দুইই আছে। পাপড়ির ছোঁয়ায় রোমাঞ্চ পাই, কাঁটা ফুটলে লাগে।

"তবে সেদিন যা জানি নি, যা জানতে আমার আরও অনেক বছর লেগেছে সেটা এই যে সব সুখেরই ক্ষয় আছে, সব দুঃখেরও লয়। তাই পরে আর কোন পাওয়া বা হারানো নিয়ে খুব বেশী বিচলিত হয়ে পড়ি নি।"

লিলিদির মা আর তাঁর স্বামীকেও টুলু বহুদিন ভোলে নি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা যে ফাঁকিও হয়, আর সেই ফাঁকিটা দুজনের কাছে জানাজানি হয়ে গেলে কী বিশ্রী একটা ঠাট্টা হয়ে ওঠে, সেই একটি সন্ধ্যাতেই এবং সেই প্রথম সে আভাসে বুঝেছিল।

এরই কিছু দিনের মধ্যে টুলু দুটি স্বপ্ন দেখে। প্রথমটি এই: সন্ধ্যা হয়-হয়, সব ছেলে বাড়ি ফিরে গিয়েছে, কিন্তু রোগা আর নিরীহ একটি ছেলে খেলার মাঠের এক ধারে একটা পাথরে তখনও বসে আছে। একটা তিন-পরত কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধা। কানামাছি খেলায় যেমন থাকে, সেই অন্ধকারেই চুপে চুপে পা ফেলে তার পিছনে এসে দাঁড়াল আর-একজন, স্বপ্নেই টুলুর গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নতুন ছেলেটা চিমটি কাটল প্রথম ছেলেটার উরুতে। চমকে ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, একমাত্র মৃত্যু-ভয়েই মানুষ অমন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু চোখ বাঁধা, কিছুই তার ঠাহর হল না, অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে সে যেন আশ্রয়, আত্মরক্ষার উপায় খুঁজল। ততক্ষণে দ্বিতীয় ছেলেটি তার টুঁটি টিপে ধরেছে। শুরু হল ধস্তাধস্তি, কিন্তু প্রথম ছেলেটি রোগা, দ্বিতীয়টি তার চেয়ে মাথায় অনেক ঢ্যাঙা, তার সঙ্গে যুঝে পারবে কেন? একটু পরেই সে হাঁপিয়ে পড়ল।

টুলু দেখছিল। কী করে বা কোথা থেকে, সে নিজেই টের পাচ্ছিল না, কিন্তু দেখছিল। চোখ-বাঁধা ছেলেটির মুখ ক্ষতবিক্ষত, দরদরধারায় রক্ত নেমেছে। টুলু আর স্থির থাকতে পারল না, বলে উঠল—আমি তোমাকে বাঁচাব। কিন্তু ছুটে যেতে পারল কই? কেউ কি জাদুবলে তার দুটো হাঁটুই এমন অবশ করে দিয়েছে যে, টুলুর এক-পা নড়বার সাধ্য নেই। ছেলেটি পাথরে পড়ে গিয়ে গোঙাতে শুরু করেছে, দ্বিতীয় জন তখন হঠাৎ এক হেঁচকা টানে তার চোখের বাঁধনটা খুলে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। তার গলা বিশ্রী কর্কশ ভাঙা-ভাঙা। টুলু শুনল। টুলু তাকে দেখতে পাচ্ছে—বেশী বয়স নয়, কিন্তু

গাল ভাঙা, মুখের নানা জায়গায় কালচে দাগ শুকনো ব্রণের। প্রথম ছেলেটি আর উঠল না, যে কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার চোখ বাঁধা ছিল, সেটা পাশেই পড়ে আছে। সেও পড়েই রইল, আর তার শত্রু হো-হো করে হাসতেই থাকল।

দ্বিতীয় স্বপ্নটা এই : নদীর ধারে একটি ছেলে বসে ছিল, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল জলে। পড়ল আর ডুবল, গলায় পাকে পাকে ফাঁস জড়িয়ে গেল, কত জল যে পেটে গেল, ঠিক নেই। টুলু ওর যন্ত্রণা নিজেই অনুভব করল, ও মরছে টুলু নিশ্চিত জানল।

একটু পরেই, খানিকটা ভাঁটিতে যে মাথা তুলল, সে আর-একজন। তার চোখ লালচে, ঠোঁটের উপরে ঈষৎ গোঁফের রেখা। দু হাতে জল কেটে কেটে সে আরও ভাঁটির দিকে এগিয়ে গেল, টুলু তাকে আর দেখতে পেল না। প্রথম ছেলেটির কী হল, তাও জানল না।

এই দুটি স্বপ্নই একদিন দুর্বোধ ছিল। পরে সৌরেশ দুটিরই অর্থ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। সে-ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত হোক বা না হোক, দুটিই তাঁর নিজের কাছে অন্তত সঙ্গত বোধ হয়েছিল।

"আমি জানি" সৌরেশ স্বগত বলেছেন, "যে-ছেলেটি রক্তাক্ত হল, পাথরে পড়ে গিয়ে গোঙাতে গোঙাতে চিরদিনের মত চুপ করল, সে আমি। তাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করেছিল যে, সেও আমি। আর ওই কাপড়ের টুকরোটা, ওটা বোধ হয় আমার অবোধ অনভিজ্ঞতার প্রতীক—বরাবরের জন্যে ঘুচে গেল।

"পরাভূত ছেলেটির করুণ বোবা চোখের ভাষা আমি পড়তে পেরেছিলাম। সে বলছিল, 'আমি তোমার নিষ্পাপ শুদ্ধ শৈশবসত্তা। আমাকে তুমি মারলে, হারালে। আর কোনদিন ফিরে পাবে না।' তার শোকে আমিই তখন কাঁদলাম।"

আর সেই দ্বিতীয় স্বপ্নটা! তারও একটা মানে আছে বই কি। ওই নদীটা হল সময়ের স্রোত। সময়ই অতলে টেনে নিল টুলুকে, তার বদলে কিংবা তাকেই বদ্‌লে, খানিক দূরের ভাঁটিতে ফিরিয়ে দিল অন্য জনকে। যদি ওই স্রোত আর সময় না থাকত তবে টুলু ডুবত না, মরত না, যেমন ছিল তেমনই থাকত, জন্মই হত না এই সৌরেশের।

তা হলে এই স্তব্ধ মধ্যরাতে একটি শিশুর জন্মের জন্য অনিদ্র অপেক্ষার প্রহরে, একটি জীবন আসলে অনেকগুলি জন্ম আর মৃত্যুর সমষ্টি কিনা, নীল-নিশ্চল আকাশের পটে এই মূঢ় জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে মরত কে?

কেউ না। সময় নেই তো স্রোত নেই। আর স্রোত যদি নেই, তবে নদীতে

দিগিতে তফাত কী! কালস্রোতে কেবল কি জীবন-যৌবন-ধন-মান—চরাচর বিশ্বই তো ভাসছে। কাল যদি না চলত, গাছের পাতা পড়ত না, আবার নতুন পাতাও দেখা দিত না, অথবা একটিও ভীরু কুঁড়ি। তখন না থাকত দিন, না রাত্রি, ঋতুর মিছিল আর বর্ণ-চক্র, সব স্তব্ধ। দূরত্বের জ্ঞানও লুপ্ত হত, কেননা আমাদের স্থানজ্ঞান কালনির্ভর, কত দূরে বলতে আমরা কতক্ষণে পৌঁছনো যাবে তাই বুঝি। জন্ম-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু—কিছু থাকত না। সেই চির-অচলতা একটা অসহনীয় বিকারে পরিণত হত।

হত, হতে পারত, কিন্তু হয় নি। কারণ সময় থামে নি, কখনও থামে না, থামতে জানেই না। সব-কিছু ভেঙে-চুরে মুছে বদলে সে চলে, কেবল চলেই।

এই অন্ধকারটুকু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই ভাল। ততক্ষণেই সৌরেশ আপনাকে পাবেন। যাকে অনেক দিন পরে খুঁজে পেয়েছেন, সেই টুলুকে কাছে রাখতে পারবেন। রাত্রি শেষ হলে টুলু হারাবে।

টুলুর কাছ থেকে এখনও অনেক কথাই জেনে নেওয়া বাকী। তার গালে হাত রেখে সৌরেশ পরখ করবেন, কতখানি তাপ সে আজও ধরে রাখতে পেরেছে। ধীরে ধীরে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কী দেখে টুলু কী শিখল, কোথায় ঠেকে কোথায় ঠকে সে এত বড় হল? সে কী হারিয়েছে, পেয়েছে কী? শুধুই কি হেরেছে, না পেয়েছেও কিছু কিছু? সেই হারজিতের শেষ হিসাব আজ সৌরেশের কাছে জমা করে দিক।

কিন্তু রাত পোয়ালে তো জানা যাবে না। জেরা করবার জন্য চাই কিছুটা নিভৃতি আর কিছু অন্ধকার। দিনের আলো টুলুকে সৌরেশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

দিনের আলোর নিয়মই ওই। অত্যাচারীর মত সে সব লুঠ করে কেড়ে নেয়। তার নাদিরশাহী কৃপাণ গলগল আলোর রক্তস্রোত বইয়ে দেয়।

কিংবা সে যেন দুরাচার স্বামী। নতমুখী রাত্রির কাছে ভোরবেলা এসে হাজির হয়। তার হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলে, 'তোর হাতবাক্সে কী আছে? সব উপুড় করে আমাকে দে।' তার লুব্ধ রক্তিম চোখ ধক ধক করে জ্বলে। কেড়ে নেয় আকাশের সব তারা, জোনাকির আলো মুছে দেয়। তার কড়া ধমকে ঝোপে-ঝাড়ে ঝিঁঝিপোকা ভয়ে ভয়ে চুপ করে। ভয় পেয়েই পাখিরা দিগ্বিদিকে ওড়ে। পাতায় পাতায় শিশির শুকিয়ে যায়।

তারপর সেই দস্যু সোল্লাসে অন্ধকারের ওড়না কুটিকুটি করে ছেঁড়ে। ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো ছড়িয়ে দেয় বট-অশ্বত্থের ঘন পাতায় পাতায়, কয়েক টুকরো ছুঁড়ে দেয় পাহাড়ের গুহায় গাছের কোটরে। শহরে স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরের কোণে সেই অন্ধকারেরই খানিকটা এক ফালি ছেঁড়া ময়লা নেকড়ার মত পড়ে থাকে।

সৌরেশ এইসব কথাই ভাবছিলেন।

দিন লোভী। সব রঙ চেটেপুটে নেয়। নিরাসক্ত রাত্রি সব রঙ ফিরিয়ে দেয়। তমস্বিনীর, তপস্বিনীর কিছুতে প্রয়োজন নেই।

আমরা তলিয়ে দেখি না, তাই দিনকে বলি অকপট, রাত্রিকে গোপন-স্বভাব। অথচ কপট তো দিনই। দিনে মানুষ ত্রস্ত, ব্যস্ততার কৃত্রিমতার মুখোশ পরে ছুটোছুটি করে মরে। তখন তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায় বলে সে বড় সতর্ক, হিসাব করে হাসে, ওজন করে কথা বলে, হয়তো অনেক হাসি আর কথাই মেকী। যে-কাজের দোহাই পাড়ে, সেই কাজ আসলে পর-পীড়ক দিনেরই চর। সন্ধ্যায় সেই কাজের ছায়া-মূর্তি যেই সরে যায়, অমনই মানুষ নিজেকে ফিরে পায়। একটি ছুটি করে তারা ফোটার মত তার নিজস্ব লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে শুরু করে। মুখোশ খসিয়ে কৃত্রিমতা ধুয়ে সে আবার সহজ হয়। রাত্রির কাছে কোন লজ্জা নেই, তাই অনায়াসে পোশাক ছেড়ে আমরা বিছানায় গা ঢেলে দিতে পারি। রাত্রির মত শয়নসঙ্গিনী কে? তারপর, জেনে নেবার জাদু যে জানে, রাত্রির সব রহস্য তার কাছে একে একে অনাবৃত হয়। রহস্য শুধু রাত্রির না, নিখিলেরও—তার নিজের। "যেন তুমি অন্ধকারে এক বনস্পতির পত্রচ্ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছ, তোমার মুখ আকাশে, আর সারা রাত ধরে টুপ টাপ করে পড়ার মত তোমার সব বিস্ময়ের, সব জিজ্ঞাসার উত্তর তোমার চৈতন্যের ওপরে ঝরে পড়ছে।" এই অনুভূতিটা আজ সৌরেশের মনে এল, সহজেই এল, কেননা তিনি আজ নিজেকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পেরেছেন।

তাই তিনি আবার ভাবলেন, "এই রাত্রিকে শীতল কালো পাথরে বাঁধানো ঘাটের শেষ সিঁড়ি বলেও কল্পনা করতে পারি। ছলছলাৎ করে জল আমার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে, আমার কোমর কনুই বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে, আমার ভাল লাগছে, চোখ বুজে আছি, ভাবছি কতক্ষণে ওই জলধারা আমাকে একটু একটু করে টেনে নেবে, কখন আমি পিছলে পড়ে যাব দহের গভীরে—

যেখানে চিরতৃপ্তি, চিরশান্তি। কিন্তু কোনদিন পড়ি না, মোহাচ্ছন্ন ভাব কাটে, রোজই একটা অতৃপ্তি নিয়ে জেগে উঠি। একটু হতাশা নিয়েও।

"এই হতাশাই ধীরে ধীরে আমার জীবনে একটা জ্বালা হয়ে উঠেছে, প্রতি রাত্রেই যাকে ছুঁতে ছুঁতেও ধরতে পারি নি, সেই মৃত্যু আমাকে কেবলই টেনেছে।"

টেনেছে কিন্তু স্পষ্টভাবে নয়, হাতছানি দিয়েও নয়, অনেক দূর থেকে চোখের পাতা কাঁপিয়ে, ঈষৎ ইশারায়। সেই ইশারা সৌরেশ কখনও বুঝেছেন, কখনও বোঝেন নি। যখন বোঝেন নি, তখন তীব্রভাবে বাঁচার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। কাঁটা থাক্, পড়ে গিয়ে যতই আঘাত লাগুক, জীবনের সব কটি বিষফলকে উচ্চতম ডাল থেকে পেড়ে আনবেনই।

কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা।

'দিনান্তলিপি' থেকে উদ্ধৃতি: "মৃত্যু-ইচ্ছা আমাকে যেমন বিবশ করেছে, বেঁচে থাকার সাধও মাঝে মাঝে পাগল করেছে তেমনই। বাঁচারও আমি একটা বিকৃত ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলুম। কাম, কামনা আর ভোগের কোনও উপচার বাদ দিই নি। নীতির নিষেধ অমান্য করেছি, সুরুচিকে খোলামকুচির মত পায়ের তলায় দিয়েছি গুঁড়িয়ে, সামাজিক বা লৌকিক বিচারে যাকে পাপ-পুণ্য বলে, তার কোনও সীমারেখা মানি নি। আসলে ক্ষণিক উত্তেজনাকেই জীবন বলে ভুল করেছি। কিন্তু উত্তেজনা গ্লাসের উগ্রতরল পানীয়ের মত কাঁপে, কেবল কাঁপে। নিস্তেজ-স্নায়ু হাতে কলমের মত কাঁপে (যেমন এখন কাঁপছে)। মাঝে মাঝে আরক্তিম চোখ তুলে দেখেছি প্রাণের প্রদীপে আসক্তির তৈলসিক্ত সলতেয় মৃত্যু-ইচ্ছা জ্বলছে। কিন্তু সে-শিখাও কাঁপে কেন, থেকে থেকে আড়াল হয় কেন! সে যদি স্থিরভাবে জ্বলত, যদি ধ্রুবতারা হত, তবে আমার ভুল হত না, বেঁচে থাকার আঁকা-বাঁকা গলিতে না ঘুরে সোজা তাকেই লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতাম। যেমন বুলু গিয়েছিল।"

বুলুর কথা বলতে হলে আবার টুলুর কথাতেই ফিরে যেতে হয়। তারও আগে বলতে হয়, মৃত্যু-ইচ্ছাটা সৌরেশের পরিবারগত, ব্যক্তিগত।

সৌরেশের বাবা এবং মা দুজনেই আত্মহত্যা করেছিলেন।

এ-কথা টুলু জানত না। তাকে কেউ বলে নি। পিসিমা আভাসটুকুও দেন নি। তাঁদের ছবি অবশ্য টুলু দেখেছে, ওর পড়ার টেবিলের সামনের দেয়ালে পিসিমাই ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। নামও টুলু জানত, শুধু বাবার কেন,

তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত। পিসিমাই মুখস্থ করিয়েছিলেন। এ-ছাড়া বাবার হাতের লেখা ছিল পিসিমাকে দেওয়া স্নেহোপহার একটা বইয়ে।

উঠনের কোণের গন্ধরাজগাছটা নাকি তিনিই লাগিয়েছিলেন। স্থলপদ্মের চারাও এনেছিলেন একটা, কিন্তু সেটা বাঁচে নি। এ-ছাড়া তরিতরকারি সব্জি ফলানোর শখও তাঁর ছিল। বাড়ির পিছন দিকটা কুপিয়ে কুপিয়ে কয়েকবার বেগুন পেঁয়াজ টমাটো ইত্যাদির চাষ করেছিলেন। নিজের হাতেই কোদাল ধরতেন তিনি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালাতেন, ঘামতেন তবু শ্রান্ত হতেন না, ক্লান্ত হতেন না।

এ-সবই অবশ্য পিসিমার কাছে শোনা। খুব পীড়াপীড়ি করলে বলতেন। অনেক সময় নিজে থেকেও। সাহসের অভাব, সব কাজে নিস্পৃহতা ইত্যাদি চরিত্রের বিবিধ রক্তাল্পতার জন্য টুলুকে লজ্জা দিতেও বলতেন। টুলু কতখানি লজ্জা পেত, বলা মুশকিল। প্রথম দিকে হয়তো পেত কিছু কিছু। শেষের দিকে তাও পেত না। কেননা, দেখেছিল লজ্জা পেয়ে কোন লাভ হয় না। ও-বস্তুটি তার ক্ষেত্রে অন্তত প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয় না। টুলু যা, টুলু তাই। টুলু যা হবে, টুলু তাই হবে। বাবার মত হবে না।

আবার বুঝি হবেও খানিকটা। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে টুলু কতদিন মিলিয়ে দেখেছে, তার মুখের গড়নে কতখানি ছাপ আছে বাবার! না, তার কানের লতিতে চুল নেই। চিবুকের দুটো থাক নেই। কিন্তু তবু নাক যেন অনেকটা একই রকম। কপালের কাছে চুলের মোড়েও যেন খানিকটা আভাস আছে মিলের। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমরণ টুলুকে তার বাবার অবয়বের কয়েকটি লক্ষণ বহন করতেই হবে। একটু একটু করে বয়স বাড়বে, সে আকৃতিতে একটু একটু করে তার বাবার মত হবে।

হয়তো প্রকৃতিতেও। কিন্তু অবিকল নয়। বাবার মত বাজি রেখে মধ্যরাত্রে সে শ্মশান ঘুরে আসার সাহস পাবে না। টুলু স্বভাব-ভীরু। বাবা এক চাকরি ছেড়ে আর ধরতেন, আজ এক ব্যবসা শুরু করে কাল অন্যটায় হাত দিতেন। টুলু হয়তো অতদূর যাবে না। তবু একটা মিল থেকে যাবে অলক্ষ্যেই। টুলু বেপরোয়া না হোক বেহিসাবী হবে, বাবার খামখেয়ালিপনা না পাক অস্থিরতার উত্তরাধিকার পাবেই।

এই একটুখানি তফাত থাকে বলেই পরম্পরা চলে। উত্তরপুরুষ আর পূর্বপুরুষ অবিকল যেদিন এক হবে, সেদিন পুরুষানুক্রমের কোন অর্থ থাকবে না, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্টি পর্যবসিত হবে।

মার কতখানি পেয়েছে টুলু? তাও সে মিলিয়ে দেখেছে। না, মুখের নরম গোলগোল ছাঁদটুকু নয়। হয়তো ভ্রূভঙ্গির খানিকটা। আর ঠোঁটের কোণে একটুখানি চাপা হাসির আভাস।

যদি এই ছবি দুটো না থাকত, তবে হয়তো টুলুকে তার বাবা আর মার চেহারা মনে মনে কল্পনা করে নিতে হত। আসলের সঙ্গে তার হয়তো মিল থাকত না, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা প্রয়োজন তো টুলুর নিজেরই, তার কাজ চললেই হত।

মার হাতে তৈরী একটা আসন সে দেখেছে। একটা কার্পেটের টুকরোয় তিনি দুটো বেড়াল বুনেছিলেন।

বুলুর কথা শুনেছে পিসিমার কাছে। এক মাস কঠিন একটা জ্বরে ভুগে সে মারা যায়।

এই ঘটনা কবেকার? টুলু জানত না। যদি পিসিমার মৃত্যুর পর পুরনো চিঠিপত্রে তার হাতে না পড়ত, তবে আজও জানা হত না।

অনেক পরে টুলু তাদের পরিবারে প্রায় পর পর তিনটি মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিল। বিবরণীতে অনেক ফাঁক ছিল, কিন্তু মনে মনে টুলু যে কাহিনী রচনা করে নিয়েছিল তাতে ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন, বুলু—তার দিদি—মরল কেন? টুলুর চেয়ে সে মোটে পাঁচ বছরের বড় ছিল, আর টুলুর জন্মের এক বছরেব মধ্যেই সে মারা যায়। তার কোন ছবি নেই।

ছবি নেই, তবু চোখ বুজে টুলু একটি অসুস্থ অভিমানী শিশুকে দেখতে পায়। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদে না—শূন্য দৃষ্টিতে টুলুর দিকে চেয়ে থাকে। দৃষ্টির কোন ভাষা নেই, চোখের পলক পড়ে না। টুলুব গায়ে কাঁটা দেয়, সৌরেশেরও দেয়, সৌরেশ আজও চোখ বন্ধ করে ফেলেন। কিন্তু যে-চাহনি সত্যি সত্যি বাইরে নেই, আছে নিজের মনেই, তার কাছ থেকে কি চোখ বুজেই রেহাই মেলে! বেঁধে—সে-চাহনি কেবলই বেঁধে।

বুলু কি টুলুকে হিংসা কবত? বোধ হয় করত। কেন? তারও একটা ব্যাখ্যা টুলুর মনে-মনে-লেখা গল্পটাতেই ছিল। টুলু বিশ্বাস করত তার ছোট্ট দিদি হঠাৎ যে-অসুখে মারা গেল, সে-অসুখটা আকস্মিক বা অকারণ নয়, বুলু মরতে চেয়েছিল, তাই অসুখে পড়ল, মরল।

পিসিমার কাছে যে বর্ণনা শুনেছে, তার থেকে টুলু ধরে নিয়েছিল, বুলু তার

মত চিররুগ্ন ছিল না। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, এক-মাথা ফাঁপানো কোঁকড়া চুল, উঠনে ঘরে সারাক্ষণ ছুটোছুটি করে বেড়াত। তার আবদারের শেষ নেই— আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বলত না, কিন্তু প্রজাপতি পুষতে চাইত। মার মুখ থেকে ছেঁচা পান কেড়ে নিয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে করতে ভালবাসত। সকলে বলত, দস্যি—দস্যি। প্রকৃতিতে নাকি ছিল টুলুর একেবারে বিপরীত।

তখনও অবশ্য টুলুর জন্ম হয় নি।

টুলুর জন্মের পরই কি বুলু বদলে গেল? না, ঠিক পরেই না। প্রথমে বুলু খুশী হয়েছিল। যখন শুনল—লোকে তো ওর সম্মুখেই বলাবলি করত— বুলুর এবার ভাই হবে। বুলু মানে বোঝে নি, তবু খুশী হয়েছিল। এতদিন সে শুধু পুতুল নিয়ে খেলেছে। সে-সব পুতুল ভাল না, সাড় চড়ে না কাড়ে না, পাশ ফেরে না। খানিকক্ষণ খেলেই বুলু ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

তার অন্তত এই ধারণা হয়েছিল, এবার একটা পুতুল আসবে, লোকের কথা শুনে তো মনে হয়, তার মা-ই আনবে, সেই পুতুলটা একটু আলাদা রকমের হবে। আকারে হবে তার পুতুলগুলোর মতই। বুলু তাকে নিজের কাপড় পরাবে শোয়াবে ঘুম পাড়াবে—বুলু জীবন্ত একটা পুতুল পাবে। পুতুলটা তার হবে, একেবারেই তার হবে—একেবারেই তার একার, বুলু হয়তো তাই ভেবেছিল।

"ও আমার কাছে শোবে, না মা?"

"হ্যাঁ।"

"আমিই ওকে খাইয়ে দেব?"

মা হেসে এবারও বলেছেন, "হ্যাঁ।"

ভাইকে নিয়ে আর কী কী করবে কয়েকদিন শুধু তাই ভেবে ভেবেই বিভোর হয়েছে বুলু। পুতুলগুলো বাড়ে না, বড় হয় না, তার ভাই হবে। তাকে নিয়ে বুলু বেড়াতে বের হবে। আরও বড় হলে ভাইকে নীচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তর তর করে গাছে উঠবে বুলু, পেয়ারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবে, ভাই কুড়বে। ভাইকে চান করিয়ে দিয়ে মাথায় সিঁথি করে দেবে, বাবার যেমন সিঁথি আছে। ভাই ধুতি আর পাঞ্জাবি পরবে, না শার্ট আর প্যান্ট—বুলু ঠিক করে উঠতে পারে নি। মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, পিসিমাকেও, তাঁরা বলেছিলেন, তোমার যা ইচ্ছে সে তাই পরবে।

ইচ্ছে, ইচ্ছে। ইচ্ছে দিয়েই বুলু বুঝি ভাইকে এনেছিল, ভালবেসেছিল, বড় করে তুলেছিল। ভাই বড় না হলে অসুবিধে যে তারই। একা সে অন্ত

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না—না গায়ের জোরে, না গলায়। তাই পাশে থাকলে তার জোর বাড়বে।

বুলু হয়তো দিন গুনছিল। মার গলা জড়িয়ে ধরে একদিন বলেছিল, "ভাই কবে আসবে মা, বল না!"

মা হাঁসফাঁস করছিলেন। ঘেমে গিয়েছিলেন ওইটুকুতেই। বুলুকে জোরে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, "ছাড়্ ছাড়্। আমাকে মেরে ফেলবি নাকি?"

বুলু ছেড়ে দিয়েছিল। একটু দূরে সরে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। আরও কত-কতবার সে তো মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গলা ধরে ঝুলেছে। কই, মা তো কোনদিন এ ভাবে ঠেলে বা নামিয়ে দেন নি? আজ কী হল মার?

কী হল, সেটা পিসিমা বলেছিলেন। 'মার শরীর খারাপ, মার শরীর ভারী, এভাবে কখনও টানাটানি করতে আছে? তুমি কিছু বোঝ না বুলু।'

মার শরীর খারাপ? কই, দেখে তো মনে হয় না। খারাপ কেন?

"ভাই আসছে যে।"

বুলু আর-কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। ভাই আসবার একটা দিকই এতদিন দেখেছে সে। অন্য দিকটা আজ দেখল।

টুলু কল্পনা করতে পারে সেদিন বুলুর মুখের সব হাসি মিলিয়ে গিয়েছে, একটুখানি হিংসা জ্বলেছে চোখে। যে-ভাই আসবার আগেই মার শরীর খারাপ করে দেয়, বুলুকে ঠেলে সরিয়ে দেয় মার কাছ থেকে, তেমন ভাই বুলু চায় না—চায় না।

পিসিমা ধারাবাহিকভাবে তো কিছু বলতেন না, বলার সাধ্যও তাঁর ছিল না। মাঝে মাঝে ছোট দু-একটা ঘটনা বলতেন, মন্তব্য করতেন কখনও কখনও, টুলু সেইগুলোই জুড়ে জুড়ে গোটা একটা ছবি তৈরি করে নিয়েছিল।

বুলুর কথা ভাবতে তার ভাল লাগত। এই বাড়িতেই তারও আগে একজন এসেছিল, রোদ্দুরে সে এই উঠনেই খেলা করেছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে, এই খাটে পাতা বিছানাতেই শুয়েছে, ওই রান্নাঘরেই পিঁড়িতে বসে খেতে খেতে সে ঢুলত।

সে যা করেছে টুলুও অবিকল তাই করে। যেন একজন প্রমোশন পেয়ে উপরের ক্লাসে উঠে গিয়েছে। তার কাছ থেকে বই চেয়ে এনে টুকে এখন পড়তে হচ্ছে। সেই বইয়ের পাতায় পাতায় পুরনো মালিকের নাম লেখা।

অনেকদিন টুলু চমকে উঠত। সন্ধ্যার পর খাটের যেখানে তার বিছানা পাতা সেখানটায় চোখ পড়লে গায়ে কাঁটা দিত। স্পষ্ট মনে হত ওখানে আর-একজন শুয়ে আছে। অনেকটা টুলুরই মতন, শুধু আর-একটু যেন রোগা, মুখের ছাঁদ আরও একটু মেয়েলী।

যাকে কখনও দেখেছে বলে আদৌ স্মরণ হয় না, তাকে টুলু দেখতে পেত।

সেই মেয়েটির ঠোঁট নড়ে নড়ে উঠত। কোন শব্দ নেই, কিন্তু সে কী বলছে টুলু স্পষ্ট শুনত। বুলু বলত, "ভয় নেই, আয়, আমার কাছে আয়। বিছানায় এইখানটাতে আমার পাশে বোস্। আমি সরে শোব এখন, ঢের জায়গা হবে! শুতে চাস তো তাও পারিস। আমার বালিশটা ছেড়ে দেব।"

জোর নয়, জবরদস্তি নয়, খুব নিচু ঠাণ্ডা গলায় ডাকা। সেই ডাক টুলু এড়াতে পারত না। গা ছমছম করত, তবু পড়ার টেবিল ছেড়ে পা টিপে টিপে বিছানার দিকে এগত।

বুলু তখন হাত বুলিয়ে দিত ওর পিঠে। টুলুর ভাল লাগত, ভয়ও হত, প্রথম দিকে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকত।

টুলু ওর চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বলত, "মাথায় তেল দিস নি বুঝি? আয়, আঁচড়ে দিই।" আস্তে আস্তে টুলু সহজ হয়ে যেত।

"আমি তোকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম," বুলু ওকে বলত আস্তে আস্তে, "এরা ভালবাসতে দেয় নি।"

টুলু জিজ্ঞাসা করতে চাইত, "কেন, কেন?" কিন্তু টের পেয়ে অবাক হত যে, তার গলাও সেই মুহূর্তে শোনা যায় না।

যে-কথা টুলু বলতে চাইত, সেটা এই: "তুমি তো আমাকে হিংসে কর।"

আর বলতে চাইত, "তুমি একটুও ভাল না। কেন আমার বড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না? আমরা দুজনে কত খেলতে পারতুম বল তো! আমাকে বাড়ির বাইরে সঙ্গী খুঁজতে হত না।"

আর: "তুমি জান না দিদি, আমি একা, কী ভীষণ একা!"

বলতে বলতে টুলুর চোখ জানলার বাইরে চলে যেত, বাঁশগাছের যে ঝাড়টা এখন এই অন্ধকারে-অন্ধকারে অনেক দূর সরে গিয়েছে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে বলত—"কারুর সঙ্গে আমার ঠিক-ঠিক মিল হয় না, আমার একজনও বন্ধু নেই। আমি কথা বলি এই ছোট পেয়ারার চারাটার সঙ্গে। কিন্তু দিদি, গাছের সঙ্গে মানুষের কখনও সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয়? আর, রান্নাঘরের পিছনে

ওই যে মানকচুর ঝোপ দেখছ, ওরা তো আমার শত্রু। কঞ্চি হাতে পেলেই আমি ওদের পাতাগুলো সাফ করে ফেলি।"

আশ্চর্য, বুলু ওর কথা ঠিক শুনতে পেত। জবাবও দিত ধীরে ধীরে, "তোকে হিংসে করি, ওরা তাই বুঝিয়েছে বুঝি? ভুল, সব ভুল। পাগল, নিজের ভাইকে কেউ হিংসে করে?" খুব চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস কানে আসত টুলুর।—"তোকে ভালবাসতে দিল না বলেই তো আমার মরতে ইচ্ছে হল।"

বুলু তো রোগা, বুলুর তো অসুখ, এটুকু বলেই সে হাঁপাত। দম নিয়ে ফের বলত, "আর তোর সঙ্গী নেই বলছিস কেন? আমি তো এখনও তোর সঙ্গী; আছি, থাকতে পারি। অন্য সময়ে না হোক, রাত্তিরে। ওরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন পাশাপাশি শুয়ে আমরা গল্প করতে পারি। যেমন এখন করছি।"

বলতে বলতে বুলু ওর লিকলিকে ফরসা হাত বাড়িয়ে টুলুর গলা জড়িয়ে ধরত, তারপর টানত। মাথা নুয়ে পড়ত টুলুর, খুব ক্ষীণ নিশ্বাস ওর মুখে লাগত, টের পেত, সে কখন তার দিদির একেবারে ধার ঘেঁষে শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু দিদি তো না। তখনই, কয়েকদিন আলাপের পরেই টুলু ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল। বুলু নেই, নেই বলেই আর বাড়ে নি—না মনে, না শরীরে। যত ছোট ছিল ততটুকুই আছে। কিন্তু বেড়েছে টুলু। তার বয়স হচ্ছে (পয়সা জমানোর কৌটোয় রোজ সে একটি করে আনি ফেলে দেয়, সেই সঙ্গে এক-একটি দিনও যেন পুরে রাখে), অন্তত মাথায় সে তো কবেই ছোট্ট বুলুকে ছাড়িয়ে গেল। এখন সে-ই দাদা।

মরে-যাওয়া দিদি আজ টুলুর ছোট্ট বোনটি হয়ে গিয়েছে।

নিজের মৃত্যু-রহস্য বুলুই টুলুকে বলত।

বলত, "তারপর তুই তো এলি। আগে ভেবেছিলুম, ওরা বুঝিয়েছিল, তুই আমারই হবি। তোর জন্যে কটা পুতুল আলাদা করে রেখেছিলুম, তুই জানিস নে। কিন্তু ওরা হতে দিল না তো।

"সেই টিপটিপে-বৃষ্টিতে-ভেজা সন্ধ্যার কথা তুই তো দেখিস নি টুলু। মা আমার সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ দেখলুম, মার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। বার বার ঢোঁক গিলছে। শেষে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল, একেবারে শেষে কাত হয়ে পড়ল মাটিতে। কোনরকমে আমাকে বলল, 'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, বুলু, তোর পিসিমাকে ডাক্।'

"পিসিমা এল। পুরনো একটা শাড়ি পরিয়ে মাকে নিয়ে গেল উঠনে,

যেখানে চাটাই আর পাটকাঠি দিয়ে ছোট্ট একটা একচালা তোলা হয়েছিল। ওরা তাকে বলত আঁতুড়। মাকে তার ভিতরে ঢুকিয়ে পিসিমা ঝাঁপ বন্ধ করে দিল। বাবা দাইকে খবর দিতে ছুটলেন।

"তারপর কতক্ষণ ধরে যে মা থেকে থেকে গোঙাতেই থাকল, আমারও মনে নেই। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কিনা। অনেক রাত্রে হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে শুনি, টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির আওয়াজ। টুলু, ঠিক তখনই তুই কেঁদে উঠলি।

"কী বিচ্ছিরি গলা রে তোর! শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে নি। এ-ঘরে আমি একা, আমার ভয় করছিল। উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু খাট থেকে মাটিতে নামতে সাহস পাই নি। কাঠ হয়ে শুয়ে তোর কান্না শুনছিলাম। তখন মা চুপ করে গিয়েছিল।

"শেষ রাত্তিরে দেখি, বাবা আমার পাশে। বোধ হয় জেগেই ছিল। ঘরে তখন একটা আলো জলছিল। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বাবা ফিসফিস করে বলল, 'বুলু, তোর একটা ভাই হয়েছে।'

"বললাম, 'দেখে আসি?' বাবা বলল, 'এখন না, কাল সকালে।' বলেই ঘুমিয়ে পড়ল।

"পরদিন সকালে, টুলু, দেখি উঠনের জল নামে নি, তবে বৃষ্টি ধরেছে। পা টিপে টিপে গেলাম ওই ঘরে, মা যেখানে ছিল। আস্তে আস্তে ঝাঁপ ঠেলে উঁকি দিলাম। দাই বুঝি মালসায় খানিকটা আগুন জ্বালিয়ে মাকে সেঁক দিচ্ছিল। পিসিমা বসে ছিল তোকে কোলে নিয়ে। আমি উঁকি দিতেই পিসিমা চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল দাই বুড়ীটা। চেঁচাল মা। ওরা সকলে যেন একসঙ্গে বলে উঠল,—যা যা, পালা এখান থেকে। যা এখখুনি।

"টুলু, ভিখিরীকেও লোকে ও-ভাবে দূর-দূর করে না। অথচ আমি তো কিছু চাইতে যাই নি, গিয়েছিলুম শুধু তোকে দেখতে। আমার চোখে সত্যি তখন জল এসে গিয়েছিল। পিসিমা সেটা দেখল। আলগোছে তোকে কোলে তুলে দরজার কাছে এল। 'ভাই দেখবি? এই দেখ্।' সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখে হাসি ফুটল। বৃষ্টি না থামতেই আকাশে কখনও কখনও রোদ ফুটে ওঠে দেখেছিস তো? তেমনি। তোর চোখ তখনও যেন ফোটে নি, ছোট্ট লালচে থলথলে। দেখতে মোটেই ভাল নস। আমার গোলাপী রঙের বড় মোমের পুতুলটার পাশে তুই কিছু না। তবু আমি সব ভুলে গেলুম, হাত বাড়িয়ে দিলুম তোকে কোলে নেব বলে।

"পিসিমা দিল না। পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। বলল, 'করিস কী! করিস কী! তুই কি পারিস ওকে নিতে! মেরে ফেলবি।'

"টুলু, আবার আমার চোখে জল এল। দৌড়ে চলে এলুম ওখান থেকে। বার বার বললুম, চাই নে, আমি চাই নে ওকে কোলে নিতে। ভাই, না ছাই। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি! মনে মনে পিসিমাকে, ওদের সক্কলকে বললুম, মিথ্যুক। আমাকে একবারটি ছুঁতেও যদি দেবে না, তবে কেন আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে? কেন বলেছিলে, যে ভাইটা আসছে বুলু, সে আসলে তোরই হবে, তোরই নতুন একটা পুতুল? আমি পড়া মুখস্থ করার মত করে অনেকবার বললুম, ভাই না, ভাই না। ও আমার কেউ না।

"বললুম বটে, কিন্তু সেই পড়াটাই সেদিনই আবার ভুলে গেলাম। দুপুরে আবার বৃষ্টি নামল। পুতুলের বাক্স খুলে সাজিয়ে বসে ছিলুম, ভাল লাগল না, সব ঠেলে দিয়ে আবার নেমে গেলাম উঠনে। এবার আর ঝাঁপ ঠেলি নি, সাহসই হল না, পা টিপে টিপে বার কয়েক শুধু আঁতুড়ের চার পাশটা ঘুরলুম। তুই কাঁদছিলি।

"টুলু, তার পর থেকে কতবার যে তোর চাঁছা গলার কান্না শুনতে চুপে চুপে উঠনে গিয়েছি, হিসেব নেই।"

ওইটুকু বলেই বুলু থামে নি। যেদিনই ঘুম আসত না টুলুর, কিংবা যেদিনই জ্বরে সে ছটফট করত, সেদিনই বুলু শিয়রে বসে তাকে সব—সব বলত। গোটা ইতিহাসই এইভাবে খানিকটা নিঝুম অবসাদে, খানিকটা বিকারে টুলুর জানা হয়ে গিয়েছিল।

বুলু বলেছিল, "সেদিন আমাব একটু অভিমান হয়েছিল। বাগ না, হিংসে তো নয়ই।"

"কদিন পরে মা চান করে বাইরে এল। মাদুর পেতে কাঁথায় শুইয়ে দিত তোকে, ডলে ডলে তেল মাখাত। একটু দূরে বসে আমি দেখতুম। আমার যে কাছে যেতে মানা!

"তা সে-মানাও কি আমি কখনও কখনও ভুলি নি! ভুলেছি। হাত বাড়িয়ে তোর তুলতুলে গাল টিপে দিতে গিয়েছি। ওরা অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠেছে: 'লাগবে, ওর লাগবে। মেয়েটার কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে!' তোর মাথার তালু খুব নরম ছিল তো, আমি এক-একবার তুলতুলে জায়গায়

হাত বুলিয়ে দিয়েছি—ওরা কেউ যখন থাকত না, তখন। মা কিংবা পিসিমা দেখতে পেলে কি আর রক্ষা ছিল!

"তোকে একদিনের কথা বলি। মা তোকে দাওয়ায় শুইয়ে গিয়েছিল নাইতে। পিসিমাও বাড়ি ছিল না, আমাকেই তাই বলে গেল, 'টুলুকে একটু দেখিস।' দেখা বলতে মা কী বুঝেছিল সেই জানে। আমি দেখছিলুম। হাত-পা ছুঁড়ে তুই খেলছিলি যেন সাইকেল চালাচ্ছিলি চিত হয়ে। হঠাৎ কেঁদে উঠলি। তখন আমি কাছে গেলুম। জানি না তো, কী করতে হয়, আস্তে আস্তে তোকে চাপড়াতে লাগলুম। তুই থামলি না, বরং আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলি। টুলু, আমি ভয় পেলুম তখন। তাড়াতাড়ি তোকে কোলে নিতে গেলুম। তা কি পারি! আমার হাত কেঁপে গেল, তুইও ছটফট করছিলি কিনা, দুজনে মিলে দাওয়া থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস সিঁড়ি ছিল, নইলে অত উঁচু থেকে সেদিন নীচে পড়লে কী হত কে জানে! তুই আরও জোরে কান্না জুড়ে দিলি, আমিও কাঁদছিলুম। মা তাড়াতাড়ি ছুটে এল। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল তোকে, ধুলো ঝেড়ে আদরে আদরে অস্থির করে তুলল।

"তা করুক। কিন্তু ঠাস ঠাস করে আমাকে মারল কেন? কেন বলল যে, আমারই দোষ? আমি কি ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছি? তা ছাড়া পড়ে গিয়েছিলুম তো আমিও, আমারই তো বেশী লেগেছিল। কনুইয়ের কাছটা ছড়ে গিয়েছিল। তোকে তো আমি দু হাতে জড়িয়েই রেখেছিলুম। তোর তো খুব লাগে নি।

"আমাকে তবু মারল। কী বিচ্ছিরি চোখে মা তাকিয়েছিল, কী করে বোঝাব! মারল, তবু কাঁদলুম না। আগেই বরং কাঁদছিলুম, লোকে মার খেলে কাঁদে। মার খেয়ে আমি থামলুম। বরাবরের মত। আর কোনদিন কাঁদি নি।

"আর কাঁদি নি। আমি আমার পুতুলগুলোর কাছেই ফিরে গিয়েছিলুম। ওরা বাধ্য, ওরা আমার। চিরদিন থাকবে। তুই তো মায়ের। মা-ই তোকে খাওয়াবে, নাওয়াবে, ঘুম পাড়াবে।

"এর পর আরও একদিন মা তোকে আমার কাছে রেখে বলল, 'একটু দেখিস। আমি ভাতটা নামিয়ে আসি।'

"আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলুম—না না না। আমাকে বোধ হয় ভূতে পেয়েছি তখন।—ও আমার কে?

তার মুখ থমথমে হয়ে গেল।—'তোর ভাই না ?' জেদের জোরেই বললুম—না—না—না।

সেদিন আমাদের সকলের ভাত হাঁড়িতে পুড়ে গেল। আঁশটে একটা গন্ধ হয়েছিল।"

বুলুর সঙ্গে টুলুর আলাপের কতটা খাঁটি, কতটা কল্পনা ? সৌরেশ পরবর্তী কালে তাও বিচার করে দেখেছেন। 'দিনান্তলিপি'তে আছে :

"বুলু, আমার দিদিকে, কোন্ ঘটনা সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছিল, বলা কঠিন। তবে এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে, আমার মা বাবা এবং পিসিমাও তার প্রতি যে আচরণ করেছিলেন, সেটা উচিত হয় নি। ছোট্ট মেয়েটির মন তাঁরা বোঝেন নি একেবারে। তার অনেকখানি ভালবাসাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হিংসা করে দিয়েছিলেন।

"বুলু দেখেছিল, যে স্নেহটা সে এতদিন পেত, সেটাই তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জমা করে দেওয়া হল আমার নামে। ওঁরা এ-রকম করলেন কেন ? নতুন মানুষটার জন্যে একটুখানি নতুন ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারলেন না ?

"বেশ বুঝতে পারি, বুলু ধীরে ধীরে মরিয়া হয়ে উঠছিল। তার অবচেতনায় একটা অভিমান ধীরে-ধীরে ভীষণ একটা সংকল্পের রূপ নিচ্ছিল। আমার মৃত্যুকামনা করছিল সে। পারলে, সুযোগ পেলে, গলা টিপে আমাকে মারত। পারল না, অতএব অবশেষে নিজেকেই মারল।

"বাবার ডায়েরিতে দু-একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। আগে মাকে মাঝখানে রেখে বুলু আর বাবা দু পাশে শুত। আমার জন্মের পর আলাদা ব্যবস্থা হল। বুলু আর বাবা। আমি আর মা। বুলুর ব্যাপারটা পছন্দ হয় নি, কিন্তু সে প্রতিবাদও করে নি। চুপ করে মেনে নিয়েছিল। তাকে বোঝানো হয়েছিল, ছোট ভাই রাতে থেকে থেকে জেগে ওঠে, তাকে থামাতে হয়, একসঙ্গে শুলে কারুর ঘুম হবে না।

"একদিন ঘুম ভেঙে বুলু দেখল, বাবা তার পাশে নেই। বুলু প্রথমে হয়তো একটু ভয় পেল, তারপর উঠল। মার বিছানার কাছে গেল। বাবাকে দেখল।

"ওঁরা দুজনেই চমকে উঠলেন। বাবা বললেন, 'উঠে এসেছিস কেন ? জল খাবি ?' মা মাথা অবধি চাদরে ঢাকা দিলেন। হিংস্র হাতে সেই চাদর টেনে সরিয়ে দিল বুলু। গম্ভীর গলায় বলল, না, আমি এখানে শোব।

'এখানে শুবি কী রে ! জায়গা কই !'

"বুলু শুনল না কিছুতে। স্থির গলায় বার বার এক কথাই বলে গেল—'আমি এখানে শোব।' বাবার চুলের গোছা ধরে টানতে লাগল। বাবা ব্যথা পেয়ে চাপা কাতরোক্তি করে উঠলেন, আমি জেগে কান্না জুড়ে দিলুম। শেষে বুলুই এক সময়ে যেমন ছায়ার মত এসেছিল, তেমনই সরে গেল।

"এই ঘটনাটা বাবা অকপটে তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। বুলুর মনের গতি দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তবু কেন যে ওঁরা তখনও সাবধান হন নি জানি না।

"পিসিমার মুখে শুনেছি, বুলু ক্রমশ অবুঝ হয়ে উঠছিল। যতই সে টের পাচ্ছিল তার আদরের দিন ফুরিয়েছে, ততই তার আবদারের মাত্রা বাড়ছিল। নিজে নিজে চান করত না। বলত, নাইয়ে দাও। অথবা স্নান করে উঠে ভিজে জামা ছাড়ত না। নিজে হাতে খেতেও চাইত না। কেউ ভাত মেখে না দিলে, সবটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু-এক গ্রাস মুখে তুলে উঠে যেত। বুলু রোগা হয়ে যাচ্ছিল।

"তার আধজাগা চেতনায় এই সময়েই বোধ হয় মরে যাবার ইচ্ছাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুলুর মনের কথাটা আমি অনুমান করতে পারি। বুলু নিশ্চয়ই তখন অনেকবার ভগবানকে বলেছে—যদি খুব বড় রকমের একটা অসুখ হয় আমার, যাতে দিনরাত বিছানায় থাকতে হয়, তা হলে হয়তো ওদের ভালবাসা ফিরে পাই—মার, বাবার, পিসিমার। মা আমার শিয়রে বসে থাকে বাবা ছোটে ডাক্তারের কাছে, আমার জন্যে ঠোঙা-ভর্তি বেদানা আর কমলালেবু কিনে আনে, আর পিসিমাকে আমারই জন্যে দুধ-সাবু জ্বাল দিতে হয়। বাড়িসুদ্ধ লোক তখন আমাকে ঘিরে থাকবে, বার বার কপালে হাত দিয়ে দেখবে, বুলুর জ্বর কমলো, না বাড়ল। আর, ভাইটা তখন মাদুরে শুয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করুক। বুলুর তাতে কষ্ট হবে না। বুলু মজা পাবে।

"এমন আকুলভাবে রোগ-কামনা করেছিল বলেই বুলুর সত্যিই বড় রকমের অসুখ হল। নিউমোনিয়া হয়েছিল তার। তখন এ-অসুখ সহজে সারত না। কী জানি, সারতে বুলুও হয়তো চায় নি। প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে থাকত, জ্ঞান হলে হাসত মুখ টিপে টিপে। ফ্যাকাশে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ভাবত, বেশ জব্দ করেছি ওদের, ওরা আমাকেই ঘিরে আছে, অসুখ আরও কিছুদিন চলে যদি চলুক না?

"বেশীদিন না। সকলের সবখানি আদর যত্ন আর উৎকণ্ঠা কুড়িয়ে

অভ্যেস করে বুলু যেই টের পেল আর বেশী কিছু পাবার নেই, অমনই ঠিক এগারো দিনের পর চলে গেল।"

বুলুর মৃত্যুর ঠিক তিন মাস পরে টুলুর বাবা আর মা আত্মহত্যা করেন। সেই রহস্যটা সৌরেশ তাঁর বাবার ডায়েরি থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

সৌরেশের নিজের 'দিনান্তলিপি'র মতই তাঁর বাবার ডায়েরি-রাখার অভ্যাসের মধ্যে কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না। কয়েকটা পৃষ্ঠা উলটিয়েই তিনি টের পেয়েছিলেন, বাবা নেহাতই অবসরমত ডায়েরি লিখতেন। হয়তো পর পর কয়েকদিনের তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনার উল্লেখ আছে, আবার হয়তো কখনও কখনও গোটা মাস, এমন কি বছরও বাদ গিয়েছে।

তবে কি অনুল্লিখিত বছর কিংবা মাস কয়টিতে সৌরেশেব বাবা বাঁচেন নি? আমরা যাকে বলি জীবন যাপন করা, তা কি করেন নি?

করেছেন। কিন্তু সে-কথা লিখে রাখার যোগ্য বিবেচনা করেন নি। করলেও সম্ভবত লেখাব অবকাশ পান নি। কেননা, সৌরেশের বাবা বেশীদিন এক জায়গায় সুস্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, অনেকটা ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তাই ডায়েরিতে তাঁর জীবনের অনেক কথাই উহ্য আছে।

কিন্তু সৌরেশের সৌভাগ্য, তাঁর মৃত্যুব রহস্যটা ডায়েরির পৃষ্ঠাতে পাওয়া গিয়েছিল। সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য? জীবনের সব সত্য জানতে পারা কি সুখের? দু-একটি বোধ হয় না-জানা থাকাই বাঞ্ছনীয়। অজ্ঞানতা নিবাপদ, অজ্ঞানতা নিষ্কণ্টক, অজ্ঞানতা স্থির এবং প্রশান্ত।

ওই ডায়েরিটা সৌরেশ কেন পড়তে গিয়েছিলেন। পুরনো আলমারিটা সাফ করতে গিয়ে আরও তো কত উই-ধরা কাগজপত্র বেরিয়ে পড়েছিল। পুরনো কৌটো, কয়েকটা অকেজো চাবি, সোডার বোতল ভাঙবার সেকেলে একটা যন্ত্র পর্যন্ত।

সেদিন আলমারিটা খুলতেই অতীত কালটা যেন হাঁ করে সৌরেশের মুখোমুখি দাঁড়াল। এতকাল সে বন্দী ছিল, হঠাৎ তাকে মুক্তি দিল কে, কেন দিল, সে নিজেই ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছে।

অবাক হয়েছিলেন সৌরেশও। বিহ্বল এবং কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। একটা তীব্র হাওয়ার ঝাপটা যেন তাঁর মুখে লাগছিল। সে ঝাপটা গন্ধের। কটু এবং তীব্র। তখনকার পৃথিবার, যে পৃথিবীর নমুনা এতদিন এই

আলমারিতে রাখা ছিল, গন্ধ কি এই রকম ছিল? নাকি যা পুরনো যা অতীত তার গন্ধ এমনি টক-টক আর ঝাঁজাল হয়ে যায়? আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে সৌরেশ সে-কালের গন্ধের একটা আন্দাজ পেলেন। কাল নিরবয়ব তবু তার গন্ধ আছে, আর গন্ধ যদি থাকে বর্ণ থাকবে বইকি! বিবর্ণতাই তার বর্ণ। মাঝে মাঝে তাকে হাল্কা হলদে বলে ভুল হতে পারে। সৌরেশ হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন। পুরনো খবরের কাগজের নীচে দুটো আরশুলা মরে পড়ে ছিল, অন্য খাদ্য না পেয়ে বন্দী ক্ষুধিত অতীত ওদের মেরে ফেলেছিল কি না কে জানে! সৌরেশ আঙুলের টোকা দিয়ে আরশুলো দুটোকে মাটিতে ফেলে দিলেন। পোকায়-কাটা কাগজগুলো টেনে টেনে নামালেন নীচে, তার ভিতরে ডায়েরিটা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে আরও অনেক বই, মলাট আছে বা নেই, একটাকে আর-একটা থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। যদি কোন রহস্যপুরীতে সৌরেশকে নিয়ে গিয়ে কেউ বলত, এখানে যা দেখছ সবই তোমার; শুধু ওই দক্ষিণ দিকের জানলাটা কোনদিন যেন খুলতে যেও না, তা হলে দুঃখ পাবে, বিপদ ঘটবে, তবে সহজাত ঔৎসুক্যই হয়তো তাঁকে নিবারিত জানলাটার দিকে ঠেলে দিত। সেই কৌতূহলই সেদিন তাঁকে দিয়ে ডায়েরিটার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়ে নিল। পড়ল তাঁর ঔৎসুক্যই, চোখ দুটো আর আঙুল কটি নিমিত্ত মাত্র।

হয়তো না পড়লেই ছিল ভাল।

ডায়েরি পড়েই সৌরেশ জানতে পেরেছিলেন, বুলু ঠিক টাইফয়েড রোগেই মারা যায় নি। তার অসুখ না সারলেও জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল।

ডায়েরি পড়ে যা মনে হয়, সৌরেশের বাবা ভাষার দিক থেকে কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী ছিলেন।

তিনি লিখেছিলেন:

"বহুদিন পরে খাতাটা খুলিয়া বসিয়াছি। এতদিন সময় পাই নাই। সত্য কথা বলিতে কী, খাতাটার কথা মনেও পড়ে নাই। ইহার পূর্বেকার তারিখ দেখিতেছি—'১০ই অক্টোবর বুধবার'। অর্থাৎ এক মাসের মত খাতার সহিত আমার সম্পর্কেও ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, এই বিচ্ছেদটাই দীর্ঘতম।

"বিচ্ছেদ শব্দটা ইচ্ছা করিয়াই লিখিয়াছি। কেন না, আমি এই বাঁধানো খাতাটাকে রাশিকৃত নিষ্প্রাণ কাগজের গ্রন্থন মনে করি না। এই খাতাটা অত্যন্তই

সঞ্জীব—আমার বন্ধু। এমন একটা বয়স আসে, যখন প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে না। স্ত্রীও মনের কাছ হইতে অনেকটাই দূরে সরিয়া যায়। আমাকে কেহ বোঝে না, বন্ধুরা সংসারী, আপন আপন সমস্যার গণ্ডিবেষ্টিত, স্বতন্ত্র। এই খাতাটার কাছেই আমার মনের কথা বলিতে পারি। ঠিক আলাপ বলিব না, কারণ কথা বলিয়া যাই বটে কিন্তু কোনদিন জবাব পাই না, পাইব এমন প্রত্যাশাও অবশ্য আমার নাই। আমার কথা ও যে ধৈর্য ধরিয়া শোনে, কখনও চঞ্চল হয় না, শুনিয়াই যায়, আমি সেজন্যই কৃতজ্ঞ। শুধু শোনেই না, সব কথা ধরিয়াও রাখে। কিছুই হারায় না, বিশ্বস্ততাও উহার একটি গুণ বটে।

"তবুও খাতাটিকে গত এক মাসে একদিনও খুলিয়া বসি নাই। আজ প্রথম সময় মিলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, ইহাকে খোঁজ করিলাম, খুঁজিয়া পাইলাম না। খাতাটা যেখানে থাকে সেখানে ছিল না। বাক্স-প্যাটরার পিছনে কখন পড়িয়া গিয়াছিল কেহ লক্ষ্য করে নাই। অন্যকে দোষ দিব কেন, আমিই তো করি নাই। অনেক কাগজপত্রের তলায় ধূলিমলিন অনাদৃত শয্যায় প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল এবং অভিযোগ করে নাই। করিবেই বা কী করিয়া? আমারই পরম সুহৃৎটি যে একেবারেই মূক।

"আজ তাহাকে মনে পড়িল কেন, এবারে বলি।"

"আজ বুলুর জ্বর ছাড়িয়াছে। সকালে তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, একেবারে হিম। এই এক মাসে তাহার জ্বর কোনদিন বাড়িয়াছে, কোনদিন কিছুটা নামিয়াছে, কিন্তু এত নীচে বুঝি কখনই নামে নাই। জ্বরকাঠি দিলাম, সেও আমার করস্পর্শের অভিজ্ঞতারই সমর্থন করিল। আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম, সেও বুলুর কপালে হাত দিল, তার মুখে হাসি ফুটিল। সেই হাসি আমাদের উভয়েরই মনের স্বস্তির প্রতিচ্ছবি। এই ত্রিশ-বত্রিশ দিন শরীর এবং মনের উপর দিয়া ধকল তো কম যায় নাই! আমরা দুইজনে পালা করিয়া রাত জাগিয়াছি, অবশ্য শারীরিক কষ্ট যতটুকু তাহার বেশীটা আমার স্ত্রীকেই সহিতে হইয়াছে। দুর্ভাবনার বোঝা বুকে লইয়া আমি ডেক-চেয়ারে শুইয়া ঝিমাইয়াছি। মাঝে মাঝে দাগে দাগে মিলাইয়া ঔষধ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া থাকিব—আমার সাহায্য মাত্র এইটুকু। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটির দায় অবশ্য আমার ঘাড়েই ছিল।

"আজ বুলুর জ্বর ছাড়িল। এতদিন এইখানে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। এইবার আমার ছুটি। ঘর ছাড়িয়া এখন বাহির হইয়া পড়িতে বাধা নাই।"

এর পরের দিনের ডায়েরিতে ছিল: "বুলুর জ্বর সত্যই ছাড়িয়াছে। কিন্তু মেয়েটা এখনও বড় দুর্বল বড় পাণ্ডুর। সামান্য পথ্য দিয়াছি, ডাক্তার যতটুকু দিতে বলিয়াছেন মাত্র ততটুকু। তাহাতে বোধ করি উহার আশা মেটে না, কাছে যখন যাই তখন কেবল করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কথা বলে নাই—গত কয়েকদিন একবারও না। ভয় হয়, এই রোগে মেয়েটার বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়া গেল না তো! কপালে কয়েকবার হাত দিয়াছি, তেমনি ঠাণ্ডা—যেন বড় বেশী ঠাণ্ডা। নিয়মিত ক্ষীণ শ্বাসস্পন্দ ছাড়া উহার দেহে প্রাণের আর কোন লক্ষণ নাই। মেয়েটা জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে, মাত্র শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াটাই কি জীবন?"

তৃতীয় দিনের ডায়েরি:

"বুলু আজ সন্ধ্যায় ভয় পাইয়াছিল। আমি কাছে ছিলাম না, উহার মাও বোধ হয় ছিল রান্নাঘরে। তখন সন্ধ্যা। বুলু হঠাৎ আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। কোন স্পষ্ট কথা নয়, তীব্র বিকৃত স্বর মাত্র। হয়তো জানালাটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়া থাকিবে, কিংবা পেয়ারাগাছটার পাতার আড়ালে পাখিগুলি বাসা খুঁজিয়া পায় নাই, বুলু তাই চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভয় পাইল। ভয়টাই প্রবল, কম্পিত শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করিল বলিয়াই তাহার স্বর শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি আমরা দুইজনেই ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। বুকে হাত দিয়া দেখি, শ্বাস অতি দ্রুত—অস্বাভাবিক। বয়সের তুলনায় মেয়েটা বরাবরই রীতিমত সাহসী ছিল। অলৌকিক বা অশরীরী কোন-কিছু কল্পনা করিয়া ভয় পায় নাই। এখন পায় কেন? কেন এত সামান্য কারণে এমন চকিত বিচলিত হইয়া উঠে? রোগটাই সম্ভবত ইহার জন্য দায়ী। বুলুকে সে রুগ্ন করিয়াছে, দুর্বল করিয়াছে, ভীরুও করিয়াছে।"

এর পরে কয়েকদিন কিছু লেখা হয় নি। সৌরেশ দেখেছেন কয়েকটা সাদা পাতা, সম্ভবত অসাবধানতার বশে ছেড়ে যাওয়া। তারই পরে তাঁর বাবা সেই ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তিটি লিখে রেখেছিলেন। আত্মধিক্কার-জর্জরিত গ্লানি-কলঙ্কিত একটি মনের ছাপ ছিল দ্রুতলিখিত অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে। পংক্তিগুলো অসমান, অক্ষরগুলো বাঁকা। বোঝা যায় কী অস্থিরতা এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লেখার সময় সৌরেশের বাবাকে পেয়ে বসেছিল। নিজেও তো দিনান্তলিপি লেখেন সৌরেশ। এই অস্থিরতার স্বাদ তিনিও জানেন। সৌরেশ পড়ে গিয়েছিলেন

"ও-ঘরে ছোট্ট টুলুটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া চিৎকার করিতেছে। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না। ধরিবে কি? যাঁহার ধরিবার কথা, টুলুর মা, সে কোথায় কোন্ কোণে মাটিতে আঁচল পাতিয়া লুণ্ঠিত হইয়া শুইয়া আছে আমি জানি না। সেও হয়তো কাঁদিতেছে, আমি শুনিতেছি না। সে জোরে কাঁদে না। সব কোলাহল থামিয়া গেলে চাপা গলার গোঙানি কানে আসে, তবে কচিৎ। গলা খুলিয়া কাঁদিতে যে শুদ্ধচিত্ত প্রয়োজন তাহা টুলুর মার নাই। পাপবোধ সাঁড়াশির মত তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে।

"কাঁদিতেছি আমিও। এ কান্না নিঃশব্দে। অনেক রোগে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয় বলিয়া শুনিয়াছি, সেই রক্তপাত অদৃশ্য; কাহারও চোখে পড়ে না। আমার কান্না তেমনই অশ্রুত—অশ্রু নাই, আর্তনাদও নাই।

"জানালার ধারে বসিয়া আছি, এক-একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তক্তপোশটার নীচে খানিকটা শরণার্থী ফেরারী অন্ধকার, মূক এবং আড়ষ্ট শিকারী দিন তাহার নাগাল পায় নাই। তক্তপোশের উপরে বিছানা খালি, কয়েকদিন ধরিয়াই খালি। ও-ঘরে যে শুইত সে নাই।

"সে নাই, বুলু নাই। শোকে অভিভূত হইয়াছি এ-কথা লিখিলে অত্যন্ত মামুলী, ফাঁকা শোনাইবে। এই কথা বাহিরের লোককে বলিতে পারি, কিন্তু এই খাতায় লিখিতে পারি না। কেননা এইখানে কোনও গোপনতা রাখিব না। এই তো আমার প্রতিজ্ঞা।

"যে ছিল সে নাই। এমন অনেকেই তো থাকে না। জাতর মৃত্যু ধ্রুব। কিন্তু যে গেল সে অকালে গেল বলিয়াই কি এতটা আঘাত পাইয়াছি? না-কি সে একান্তই আমার, আমাদের আপনার ধন বলিয়াই?

"শুধু এইটুকু লিখিয়াই যদি পার পাইতাম, কারণ যদি কেবল ইহাই হইত, তবে বাঁচিতাম। কেননা, মৃত্যুশোকেও শান্তি আছে। কিন্তু গ্লানির কালিমা নাই।

"গ্লানি কেন, তাহাই লিখিব। অকপটে লিখিব। না লিখিলে আমার উপায় নাই। যে আত্মসন্দেহ এই কয়দিন আমার মনের ভিতরে রুদ্ধ হইয়া আছে, তাহাকে এই পথে মুক্তি দিব। এই কাজটা আমার নিশ্বাস ফেলার মত।"

এতখানি লিখেও সৌরেশের বাবা হয়তো ইতস্তত করেছিলেন। কেননা খাতার পাতা আরও অনেকখানি আবার সাদা পড়ে ছিল। লেখাটা একটানা

নয়, খানিকটা লিখে কেটেছেন, ফের লিখেছেন; আবার হয়তো খানিক কাটাকুটি। বোঝাই যায়, সঙ্কল্পের সঙ্গে তাঁর রুচির বিরোধ হয়েছিল। একান্ত-সঙ্গী খাতাটাকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, অথবা তাকেও লজ্জা পাচ্ছিলেন।

এই লজ্জা বস্তুটা সৌরেশ ভেবে দেখেছেন, অত্যন্ত বিচিত্র। অনেকটা ভয়ের মত। কাছাকাছি কেউ নেই জেনেও আমরা অশরীরী সত্তাকে কল্পনায় সৃষ্টি করি, সৃষ্ট বস্তুকে নিজেরাই ভয় পাই। লজ্জাও তেমনি। নির্মক্ষিক নির্জন স্নানকক্ষেও অনেকে নিরাবরণ হতে পারেন না, কেবলই ভাবেন, অদৃশ্য কোন চোখ যেন লক্ষ্য করছে। নিভৃতে বসে একান্ত নিজের জন্যেই লেখা খাতাটায়ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরাও তাই বাবার কাছে সহজ হয় নি। লিখেছেন—কেটেছেন—লিখেছেন। সবে-হাঁটতে-শেখা শিশুরা যেমন ওঠে, টলতে টলতে এক পা দু পা চলে, পড়ে, আবার ওঠে, খানিক এগয়।

সৌরেশের বাবা লিখেছিলেন :

"মানুষ বিচারশীল পশু, না এমনই কী একটা কথা অধ্যাপকদের মুখে শুনিয়াছিলাম। তখন কথাটাকে তলাইয়া বুঝি নাই। মানুষের কতখানি বিচারশীল আর কতখানি পশু, তাহা লইয়া ভাবনার বয়স তখন নহে। পরে দেখিয়াছি, পরিমাণ বা অনুপাতের কোন স্থিরতাও নাই, চন্দ্রকলার মত, নদীর জলের মত তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। আমাদের সত্তা নির্মল নীল অপার আকাশের মত। কখনও বিচারবোধের রশ্মিতে সমুজ্জ্বল, কখনও পাশববৃত্তির কালো মেঘে আচ্ছন্ন, অসংযমের ধূলিকণায় মলিন।

"সেদিন আমার বুঝি তাই হইয়াছিল। আমার যে-অংশটা পশু সে প্রথমে চঞ্চল, পরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বুলুর পরিচর্যায় দীর্ঘকাল আমরা স্বতন্ত্র থাকিয়াছি, দাম্পত্য সম্পর্কটা আচরণে কখনও স্বীকৃত হয় নাই।

"শরীর অবসন্ন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কতখানি ক্ষুধার্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেটা অনুভব করিলাম সেদিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া। ঘামে শরীর ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘুম ভাঙিল কেন? কান পাতিয়া থাকিলাম, কোথাও কোন শব্দ তো নাই। বাসী ফুলের মত ঈষৎ হরিদ্রাভ জ্যোৎস্না বিছানার এক পার্শে পড়িয়া আছে। আমার পাশে বুলু নিদ্রামগ্ন। হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, কপালটা হিম, বুকে হাত দিলাম, শ্বাস পড়ে কি পড়ে না। হয়তো শরীর খারাপ বলিয়া, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল বলিয়াও হইতে পারে,

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইল। একটু দূরের স্বতন্ত্র শয্যায় আমার স্ত্রী, পাশে নবজাত শিশু। চাপা গলায় তাহাকে ডাকিলাম। তাহার ঘুম ভাঙিল না তখন তাহাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতে হইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—কী? আমি অঙ্গুলিনির্দেশে বুলুকে দেখাইলাম। ইঙ্গিতটা সে বুঝিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুলুকে দেখিল, আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—কই, কিছু না তো! এতদিনের অসুখ তাই কিছু বেশী দুর্বল। বলিয়াই সে বুঝি আপন শয্যায় ফিরিয়া যাইবে, আমি তখন তাহার হাত ধরিলাম। মুখে কথা ছিল না, চোখে কী ছিল আমি জানি না, কেননা চোখ তো নিজেকে দেখিতে পায় না, তবু সে বুঝিল। বলিল—এখন নয়। গাঢ় তপ্ত কণ্ঠে বলিলাম—নয় কেন? এখনই। সে শুনিল না, হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল। তাহার পিছে পিছে আমিও বাহিরে আসিলাম। ভিতরের বারান্দা একেবারে অন্ধকার, সেখানে জোনাকির আলোটুকুও নাই।

* * *

"এই আমার ইতিহাস। আমার স্খলনের, আমার প্রবৃত্তির।

"বুলুর ঘুম ভাঙিয়াছিল কি না জানি না। ক্ষীণ গলায় সে হয়তো আমাদেব ডাকিয়াও থাকিবে, আমরা শুনিতে পাই নাই। চুপে চুপে ঘরে ঢুকিয়া বুলুর ক্ষীণ দেহটা নিথর দেখিলাম, সে কি আমাদেরই পাপের শাস্তি! নিদ্রার ঘোরে এমন অনায়াস শান্ত মৃত্যুর আর-কোন দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়াছি, বুলুর চোখে কিংবা শুষ্ক অধর-কোণে অভিযোগও কি মরিয়া পড়িয়াছিল? মধুপাত্রের কিনারে যেমন মক্ষিকা থাকে? জানি না। আমার স্ত্রী সেই মুহূর্ত হইতে পাথর হইয়া গিয়াছিল।

"জানিতাম না, আমার শাস্তির লজ্জার সে-ই সীমা নয়, শেষ নয়। তখনও অনেকটা বাকি ছিল। আরও পরে বেশ কয়েক মাস পরে, আমার স্ত্রীর শরীরে যখন একটি ক্ষণিক বিচ্যুতির লক্ষণকে ভুল করিবার উপায় রহিল না, তাহার পরে করণীয় সম্পর্কে সংকল্প স্থির করিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। মৃত্যুবাসনার অঙ্কুরটুকু তো ছিলই, সে এক নিমেষে যেন ডালপালা মেলিয়া আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমার পথ তো আমি জানি, কিন্তু আমার স্ত্রীর? আবার এক রাত্রিতে যখন চরাচর সুপ্ত তাহাকে ডাকলাম। এবারও আমার কণ্ঠ কম্পিত, সে শুনিল কি বুঝিল সেইই জানে। শুধু বলিল, বেশ।

"খানিকটা মৃত্যুচূর্ণ একটা শিশিতে সংগ্রহ করিয়াও আনিয়াছি, এখন শুধু সময় স্থির করিলেই হয়। সেই লগ্নেরও দেরি নাই। দেরি হইতে আমিই দিব না, কী জানি যদি জীবনস্পৃহা মৃত্যুবাসনাকে আবার পরাস্ত করে? মৃত্যু-বাসনারও মৃত্যু ঘটা তো অসম্ভব নয়!"

সৌরেশের বাবার ডায়েরিতে আর-কিছু লেখা ছিল না। এর পরের বেশ কয়টা পৃষ্ঠাই একেবারে সাদা।

মৃদুস্বরে সৌরেশ বললেন, "টুলু, আমি এবার যাই।" বলেই হয়তো ভয় হল, টুলু রাজী হবে না, যেতে দেবে না। তাই তাড়াতাড়ি কারণস্বরূপ জুড়ে দিলেন, "আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে কিনা।"

টুলু এতক্ষণ যেন সৌরেশের একখানা হাত ধরে রেখেছিল। সৌরেশ যেই অনুরোধ করল, অমনি সে তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিল। ক্ষোভ না, ব্যথা না, অভিমানও না। অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, "বেশ, যাও। তুমি অনেক দূর যাবে আমি জানি।"

আর সঙ্গে সঙ্গে সৌরেশ টুলুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। ইচ্ছে করলে টুলু তাঁকে বাধা দিতেও পারত। জোর করে চেপে রাখতে পারত তার হাতের মুঠি। বলতে পারত—বোস, বোসই না আর-একটু। কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম।

তখন? তখন কি সৌরেশ ছিনিয়ে নিতে পারতেন নিজেকে? অনেক—অনেক বছর আগে একদিন যেভাবে নিজেকে টুলুর কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলেন? পারতেন না। হয়তো বার বার একই কথা বলতে হত, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,-আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।"

অনেক দূরে। কিন্তু কত দূরে! কত দিন রাত্রি মাস বছরের পর বছর পার হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু সেদিন যে যাত্রা করেছিলেন, তখন কি জানতেন এখানে এসেই পৌঁছবেন? সৌরেশ ঠিক জানেন না। হয়তো অন্য কোথাও যাবার কথা ছিল, রাস্তা ভুল হয়ে এসেছেন এখানে, রাস্তা যে ভুল হয়েছে, তাও খেয়াল করেন নি। আর এখানেই যে যাত্রা শেষ তাই বা কে বলতে পারে! ক্লান্তিতে সৌরেশ হাই তুললেন, ক্লান্তিতেই ফের চোখ বুজলেন। কে জানে, হয়তো যতটা এসেছেন, ততটাই কিংবা তারও বেশী পথ এখনও বাকি থাকতে পারে।

আজ কিন্তু টুলু তাঁর সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। সুকুমার ভীরু ছেলেটি ভীরুর মতই তাঁর পথ ছেড়ে দিয়েছে, দরজা জুড়ে দাঁড়ায় নি। হত যদি টুলু হিংস্রপ্রকৃতির, সে এত সহজে তাঁকে রেহাই দিত না। বলত—তোমাকে আমি চিনি। সেদিন তুমিই না আমাকে গলা টিপে একেবারে নিস্তেজ অবসন্ন করে পালিয়ে গিয়েছিলে? তুমি—তুমি খুনী। আজ এত দিন পরে তোমাকে বাগে পেয়েছি, সহজে ছাড়ছি না।

আমি, আমি খুনী? শ্রান্ত সৌরেশ চোখ বুজে কথাটাকে চিন্তা করলেন। তিনিই সত্যি টুলুকে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে সেদিন পালিয়ে এসেছিলেন? তা তো নয়। টুলুর হত্যাকারী যদি কেউ থাকে, সে তো সময়।

ভাঙা ভাঙা গলায় সৌরেশ বলতে চাইলেন—টুলু, তা নয়। তোমার হত্যাকারী তো সময়। আগে তুমি ছিলে, পরে আমি এলুম। কড়া চোখে সময় সেদিন আমাদের দুজনকেই যাচাই করেছিল। অবশেষে বেছে নিয়েছিল আমাকেই। তার হাত ধরেই তো আমি এখানে এলাম।

সৌরেশ টুলুর মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠতে দেখলেন: খুব যে সময়-সোহাগী হয়েছ! সময় তোমাকে নিয়েই বরাবর থাকবে, তাই বুঝি ভেবেছ? বয়সে তুমি বড়, কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতা কম। সৌরেশ, আমাকে একদিন সময় যা করেছিল, তোমাকেও তাই কববে। টুঁটি টিপে ফেলে পালাবে। কালাব পীরিতির মত কালের পীরিতিকেও বিশ্বাস করে না। সে অস্থির প্রণয়ী, অবিশ্বাসী, অল্পেই ক্লান্ত। বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছোটা ছাড়া আর কোন খেলা সে জানে না।

সৌরেশ সম্মোহিতের মত শুনছিলেন। ছোট্ট টুলু, যার চোখের মণি ক্ষোভে-দুঃখে সবুজ টিপের মত হয়েছে, সে একটু থামল, দম নিয়ে আবার বলল, "আমাকে তোমরা মারবে বলে চক্রান্ত করেছিলে। তবু দেখ, আমি মরি নি। যদি মরতাম, তবে কি তুমি এত দিন পরেও ফিরে এসে আমাকে খুঁজে পেতে?"

সৌরেশের বাক্‌রোধ হয়েছিল, সৌরেশ অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, নইলে তখনই বলতে পারতেন, টুলুকে যে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তার নাম সৌরেশ নয়, সৌর। সেও গলা টিপে টুলুকে মারতে চায় নি, তিলে তিলে শেষ করতে চেয়েছিল।

সেই সৌর কি এখনও কোথাও আছে?

আছে। ওই তো কৃষ্ণদাস মল্লিক লেনের চোদ্দ নম্বর বাড়ির দোতলায় তক্তপোশে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে যে ছেলেটি অঘোরে ঘুমচ্ছে, তার নামই তো সৌর। ভাল শোনায় বলে বন্ধুমহলে নিজের নামটা সে ছেঁটে এই ভাবে ছোট করে নিয়েছে। ভাল দেখায় বলে সরু কাঁচি দিয়ে গোঁফের সরু রেখা আরও সরু করেছে।

চেনা গলি, জানা বাড়ি, সেখানে যেতে সৌরেশের অতএব কোন অসুবিধে হল না।

সন্তর্পণে দরজা ঠেললেন সৌরেশ, বাঁ হাতের দিকে কাঠের সিঁড়িটা সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল। আর সামনেই স্যাঁতসেঁতে উঠনটার কোণে ছিঁচকাঁদুনে কলটায় সারা রাত ধরে টপটপ জল ঝরছে। অচেনা লোক হলে ওই এঁটোকাঁটা-ছাইয়ে-ছাওয়া উঠনটাতেই পা পিছলে পড়ে যেত, কিংবা নর্দমার ঝাঁঝরিটা যে অনেককাল থেকেই নেই সেটা জানা না থাকার দরুন পা ভেঙে বসত, কিন্তু সৌরেশ অভিজ্ঞ বলে পা টিপে টিপে অনায়াসে উঠনটা পার হয়ে গেলেন।

আর সেই গন্ধটাকেই চিনলেন। বাসী পচা-পচা টক-টক।

এই গন্ধটা কলকাতার। পুরনো কলকাতার। তখন কলকাতার গায়ে এই গন্ধটা ছিল। শহরে যাদের জন্ম, নিরবচ্ছিন্ন বাস, তারা টের পেত না; কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দিতে-না-দিতে এই গন্ধটা মফস্বলের লোকের নাকে লাগত। গন্ধটা বিশেষ করে ছিল গলিতে, ভাড়াটে বাড়ির উঠনে আর বাথরুমে। দিনের পর দিন কারা যেন কড়া অ্যাসিড ঢেলে একে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু সফল হয় নি। আবার এই গন্ধ ছিল সদর-রাস্তাতেও। এত উগ্রভাবে নয় অবশ্য, সেখানে গন্ধটা পেট্রলের পোড়া-পোড়া-গন্ধ-মেশানো।

আসলে একই গন্ধ, তবু যেন ঋতুতে ঋতুতে একটু আলাদা রকমেরও মনে হত। বর্ষাকালে পুরনো ইটে দিনের পর দিন জলের ছোপ ধরত, ভিজে-ভিজে গন্ধ ছড়াত। গরমে আস্তর-খসা চুনে হাওয়া ভারী হয়ে থাকত, আর চৈত্রের সন্ধ্যায় ছাদে দাঁড়ালে মাঝে মাঝে বেহিসাবী দক্ষিণে হাওয়া চেনা-চেনা কোন ফুলের গন্ধ জমা দিয়ে আরও উত্তরে ছুটে যেত।

সবই নবাগত কিশোরের কাছে সেদিন বিচিত্র লেগেছিল।

সেই বিস্মৃত বৈচিত্র্যের স্বাদ সৌরেশ আজও যেন একটু ফিরে পেলেন।

কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা পার হয়ে কোণের ঘরের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেললেন, আলো নেবানো, তবু মৃদু একটু জ্যোৎস্নায় আভাস আছে, সৌরেশ তাই সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলেন।

ছড়ানো খাতাপত্রের মাঝখানে একটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে। সৌর। টুলুর হত্যাকারী। এই অসহায় কুণ্ঠিত কিশোর কাউকে হত্যা করেছে, অন্তত করতে চেয়েছে—এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সত্যিই চেয়েছিল।

সদ্য-ম্যাট্রিক-পাস-করা মফস্বলের ছেলেটি শহরে এসে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। গন্ধ? না না, শুধু সেজন্যে নয়। এর ভিড়, এর কোলাহল, অবিরাম জনস্রোত আর যানস্রোত আর ব্যস্ততা, নিরাকাশ রুদ্ধশ্বাস এই শহরটার কোন-কিছুর সঙ্গেই যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। গাড়ি দেখলেই প্রথম দিকে ছুটে উঠত ফুটপথে। গলা বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালা কতদিন তাকে ধমক দিয়েছে, ঢং ঢং করে ট্রামের চালক তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বাসের রুটের রহস্য বুঝতেই তার কেটে গিয়েছে কয়েকদিন। গোড়ার দিকে অবাক হয়ে ভারত, একই নম্বর লেখা বাস এত তাড়াতাড়ি ফিরে ফিরে আসছে কী করে! ভাবত, বাস বুঝি ওই একটাই। পরে জানল, বড় করে লেখা সংখ্যাটা রুট-নম্বর। ছাতখোলা দোতলা বাস তখন কলকাতার রাস্তার দেখতে পাওয়া যেত। কতদিন লোভ হয়েছে বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে সেও উপরে বসে, কিন্তু সাহস পায় নি। যদি টলে পড়ে? তার চেয়েও ভয়ের কথা যদি নামিয়ে দেয়?

বাস চলে যেত, সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। মাঝে মাঝে গন্ধ শুকত হাওয়ার। এই গন্ধটা বোধ হয় পেট্রোলের। ভাল লাগত।

মোড়ে লাল নীল আগুন-হরফে একটা বিজ্ঞাপন জ্বলত, নিবত। সেদিকেও সে চেয়ে থাকত। এই কলকাতা একেবারে নতুন, তার চেনা কোন-কিছুর মতই নয়।

কলকাতাকে সে ভয় করল। ভয় করল বলেই ভালবাসল। প্রতিজ্ঞা করল, একে আপন করে নিতে হবে। আপন করে নিতে হলে নিজেকে এর উপযুক্ত করেও তুলতে হবে।

কিন্তু রাস্তা পার হওয়া শিখতেই যার সপ্তাহ খানেক কেটেছিল, শহরটাকে আপন করে নেওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল না।

খাতাপত্রের ভারে বিব্রত ছেলেটি কেবলই ভাবত, সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, বলছে, 'গেঁয়ো, গেঁয়ো ভূত কোথাকার!'

কেউ যে দেখে না, কেউ হাসে না, এই ব্যস্ত শহরটার কারও যে অন্য লোকের দিকে তাকাবার ফুরসত নেই—এই কথাটা বুঝতে নতুন অতিথিটির বেশ কিছুদিন লেগেছিল।

ক্লাসে গিয়ে জড়সড় ভঙ্গিতে বসত, সবার পিছে। উপায় থাকলে হয়তো সবার নীচে অর্থাৎ মাটিতে বসে পড়ত। অধ্যাপকদের ইংরেজী বক্তৃতা শুনত, বুঝত না একবর্ণ, সে জন্য ধিক্কার দিত নিজেকে, চোরের মত চাইত অন্য ছেলেদের মুখের দিকে, জানতে চাইত তারাও বুঝতে পারছে কি না! যারা তারই আশে-পাশে সপ্রতিভ মুখে বসে থাকত, মনে মনে হিংসা করত তাদের। আশ্চর্য, এরা সবাই হাসি-হাসি মুখে বসে আছে, ঘাড় নাড়ছে সমঝদারের মত, আর সে একাই কি সকলের চেয়ে জড়, অবোধ, হতবুদ্ধি? মাঝে মাঝে তার কান্না পেত।

একদিন অধ্যাপক কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথমে সে বুঝতেই পারল না যে, লক্ষ্য সে-ই। অধ্যাপক যখন ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বার তিনেক বললেন, "ইউ, ইউ, ইউ"—তখন তার সম্বিত ফিরে এল। পাশের ছেলেটি পেন্সিল দিয়ে তার কাঁধে খোঁচা দিচ্ছিল। দাঁড়াল সে, পা টলছিল, মাথা ঘুরছিল। অধ্যাপক প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন, তবু সে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েই রইল। যেন মানেই বোঝে নি। অধ্যাপক অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "নেক্‌স্ট।" পাশের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে চটপট জবাব দিয়ে দিল। তার মুখ চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। উত্তর শুনে বুঝতে পেরেছিল, সেও জানত। মাথা নিচু করে সেদিন সে সারাক্ষণ ক্লাসে বসে ছিল আর ভাবছিল, কেন এমন হয়? কেন সময়মত জানা কথারও জবাব তার মুখে জোগায় না?

সেদিন, সেই লজ্জাবিড়ম্বিত মুহূর্তে বিব্রত কিশোরটি অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছিল, তার কেউ শত্রু আছে, যে তাকে পদে পদে অপদস্থ করে, স্বচ্ছন্দ হতে স্বাভাবিক হতে দেয় না, আড়ষ্ট কুণ্ঠিত করে রাখে।

সেই শত্রু কে! ছেলেটি তাকেও চিনতে পেরেছিল। সে টুলু, তারই গ্রাম্য অতীত। টুলুকে হত্যা করতে হবে, যত শীঘ্র পারে—এ সংকল্প সে তখনই গ্রহণ করেছিল। জেনেছিল, টুলু না মরলে সে বাঁচবে না।

চোখ তুলেই সৌর চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

এখন দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক মুখোমুখি। জানলার নীচের পাল্লাটা অন্য দিনের মত আজও বন্ধ। হয়তো হাঁটু ভেঙে বসে আছে কিংবা ওখানে একটা নিচু জলচৌকিও থাকতে পারে; অথবা বেতের একটা মোড়া।

কী করছে? বই পড়ছে? মনে তো হয় না। শুধু চেয়েই আছে। কাঁধের উপরে ওর শরীরের যেটুকু, মাত্র সেটুকুই সৌরর পড়ার টেবিল থেকে দৃশ্য। অর্থাৎ বেগুনী শাড়িটার আঁচলের সামান্য আভাস, অর্ধচন্দ্রাকারে কাটা ব্লাউজের গলার বোতামটা, খুতনি—যেটা একটা লোহার শিকে ঠেকানো, নাক, বড় বড় দুটি চোখ (এই চোখকে কী বলে?—আয়ত? কথাটা সৌর তখনই সবে শিখেছিল) আর রাশি রাশি চুল।

চেয়ে আছে। এই যে সৌর এখন বইয়ের পাতায় মুখ রেখে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার-কাহিনী পড়ছে, এখনও চেয়ে আছে। সৌর যদি এই বই সরিয়ে রেখে লজিকটা টেনে নেয়, গুন গুন করে পড়ে 'বারবারা সেলারেণ্ট-ডেরিয়াই-কেরিও', তখনও থাকবে। কিন্তু যেই সৌর বইয়ের পাতা মুড়ে উপর দিকে চাইবে কিংবা চাইবে তার দিকে, তখন আর থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেবে। সৌর বোঝে না কেন? চোখ মেলে যার চেয়ে থাকতে আপত্তি নেই, চোখাচোখিতে তার সঙ্কোচ কেন? যে নির্লজ্জ, সে সেই সঙ্গেই কেন এত ভীরু? আবার এই ভীরুতাটুকু আছে বলেই হয়তো নির্লজ্জ দৃষ্টিটুকুকে এত সুন্দর লাগে অথবা নির্লজ্জ চাহনির জন্যই ভীরুতাকে।

আবার চোখ তুলল সৌর, আবার নামাল। সরিয়ে রাখল ইংরেজী পাঠ্য-বই। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার-বিবরণীতে কোনও রস নেই। থাকলেও, এই দৃষ্টিবিনিময়ের মুহূর্তটির সঙ্গে ঠিক মেলে না। সৌর অতএব বাংলা বইটা টেনে নিল। পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলে গেল কাব্যাংশের। একটা কবিতা পড়তে শুরু করল—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী—"

পড়তে গিয়ে টের পেল, তার গলা কাঁপছে। আজকাল এ-রকম প্রায়ই কাঁপে, যখনই আবেগ আসে, বুকের ভিতরটা অস্থির হয়, তখনই কথা বলতে গেলে গলা কাঁপে, সৌর টের পেয়েছে। কাঁপে চোখের পাতাও। কেবলই পলক পড়ে। সৌর চেয়ে দেখল, তার হাতের আঙুলও কাঁপছে। কেন? অস্থিরতায়? ভয়ে? সুখে?

বেঁচে থাকার যে-সুখের কথা একদিন মোহিতদা আর লিলিদির আচরণ থেকে জানতে পেরেছিল, এ কি তাই? একটি মেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে, মাত্র এই অনুভূতিতেই এত সুখ?

সৌর আবার জোরে জোরে পড়ে গেল, "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী—"

কে জানে, এই বিশ-ফুট উঠনটুকু পার হয়ে তার কম্পিত কণ্ঠ ও-পাশের জানলায় পৌঁছচ্ছে কি না! এই কবিতাটাই বেছে নেবার কোন অর্থ হয় না, সৌর জানে। এর মানে সে যতটা বুঝেছে, এটা কোন কিশোরীকে শোনাবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু অন্য কবিতাই বা এখন পাচ্ছে কোথায়! আর-কিছুই মুখস্থ নেই যে! যা আছে তা আবার পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব দেশবন্দনায়ই একটি কিশোরীর স্তুতি হোক।

বোকামি, বোকামি! কয়েক বছর পরে সৌর বুঝেছিল, সেদিন সে যা করেছে তা নিছক বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই ষোল-সতেরো বছর বয়সে বোকামিকে বোকামি বলে চেনা যায় না।

দশ বছর বয়সের অনেক কথা অনেক কাজই যেমন ছেলেমানুষি, ষোল-সতেরো বছর বয়সের বেশীর ভাগ কাজই তেমনি বোকামি। কিন্তু এই ছেলে-মানুষি আর বোকামি ধরা পড়ে শুধু পরবর্তী কালের পরিণত চোখে।

একটা কাক বিশ্রী গলায় ডাকতে শুরু করে সৌরকে জানিয়ে দিল যে, কলেজে যাবার বেলা হয়েছে। আবার সে মুখ তুলে জানলা দিয়ে চাইল। তখন সে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা তেলের শিশি, সম্ভবত এখন স্নান-ঘরে ঢুকবে। কতকটা যান্ত্রিকভাবে নিজের চুল মুঠো করে ধরল সৌর, রুক্ষ লম্বা-লম্বা জট-পাকানো। আব তখনই মনে পড়ল, ইস্, কতদিন এই চুলে কাঁচি পড়ে নি। (কলকাতার সেলুনের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই একবার দুবার হয়েছিল। সেখানে উমেদারের মত ঘণ্টাখানেক বসে থাকতে হয় অনেকক্ষণ ধরে, খুশী থাকতে হয় ছেঁড়া একটি খবরের কাগজের টুকরো নিয়ে,—তার ভুল বাংলা, মূঢ় অদরকারী খবর আর ভাঙা টাইপ পিঁপড়ের মত মগজটাকে কুরে কুরে খেয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার স্বষ্টি করে, তখনও ডাক পড়ে না। হাতে হাতে কাঁচি সমানে চলে, সেই ঐকতানে বিন্দুমাত্র স্বরসঙ্গতি নেই। যখন ডাক পড়ে তখন খরিদ্দারেরা একের পর এক চেয়ারে গিয়ে বসে টলতে টলতে, তাদের স্নায়ু যেন অসাড়, যেন বলির পশু হাঁড়িকাঠে মাথা দিচ্ছে; কিংবা ফাঁসির আসামী বধ্যমঞ্চে আরোহণ করছে। বধ্যমঞ্চ কথাটা সৌরর বিশেষ করে মনে হয়েছে এই কারণে যে, সে নিজে নিরস্ত্র, শাণিত যন্ত্রাদি যা কিছু সব সেলুনওয়ালার হাতে। তাই বলে তাদের হিংস্র মনে করলে ভুল হবে। এরাই আবার কুসুমাদপি মৃদু হতে জানে। যেই সৌর চেয়ারে গিয়ে বসল অমনই একজন তার মাথাটা

যেন টেনে নিল একবারে বুকের ভিতরে। তারপর কতক্ষণ ধরে যে সেই মাথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক থেকে দেখল, হিসাব নেই। কাঁচি অবশ্য সমানেই চলে, কখনও চুল ছোঁয়, কখন ছোঁয় না। সবশেষে গন্ধ তেল ঢেলে, স্নো ঘষে ঈষৎ আদরের ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। নীরব ইশারায় বলে, এবার তোমার ছুটি। কিন্তু এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটাই সৌরর ভাল লাগে না। সে লাজুক, স্বভাব-অসহিষ্ণু।)

কিন্তু ভাল লাগুক আর না-লাগুক এবার তাকে সেলুনে যেতেই হবে। আয়নার যায় বা কী করে! ও যে এখন ও-পাশের জানলায় দাঁড়িয়ে! যেমন করে ঠাকুর-ঘরে পিসীমা মাথা নুইয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন, তেমন সুরেই সৌর মনে মনে বলতে থাকল, "তুমি ওখানে কেন দাঁড়াও, কী দেখ? আমাকে? আমাকে দেখার কী আছে? দেখবে তো দেখ। লোকে যাকে বলে ভাল, আমি তা নই, আমার চোখ ছুটি বিলোল নয়, নাক তাদৃশ উন্নত নয়, দেহ নয় সুগঠন, রঙ তো গৌর নয়ই। তা ছাড়া সবচেয়ে যেটা লজ্জার কথা—আমার চেহারায়, পোশাকে, চাউনিতে গ্রাম্যতার ছাপ আছে আমি জানি। তুমি কি তাই দেখ, মজা পাও? তাই যদি হয় তবে তুমি আর দাঁড়িয়ো না, আমার দিকে চেয়ো না, আর চাইলে মুখ ফিরিয়ো না। তুমি জান না, তুমি চাইলে আমি অস্বস্তি বোধ করি, মুখ ফেরালে কী যন্ত্রণা পাই! আর যদি শুধু মজা পাওয়াই তোমাব মনে থাকে, তবে তুমি যাও। বিনামূল্যে বিলবার মত মজা আমার নেই।"

এই স্বগতোক্তিটুকু করে সৌর শান্ত হয়েছিল, তার চিত্তের চাঞ্চল্য কমে এসেছিল। এইবাবে মাথায় তেল ঘষে স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকতে তার বাধা নেই।

স্নান নামমাত্র, খাওয়া মানে অন্নস্পর্শ। ঠিক পনের মিনিট পরে গায়ে শার্ট গলিয়ে সৌর খাতাপত্র নিয়ে যখন কলেজে যাবার জন্যে তৈরী হল, তখনও চোখ ছুটো একবার ও-বাড়ির জানলার দিকে গিয়েছিল। না, নেই। অপলক একটি দৃষ্টি ওখান থেকে সরে গিয়েছে। সরে গিয়েছে কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে নি। কার যেন পরানের সঙ্গে নীল শাড়ি চলত, সৌরর পিছে পিছে অহরহ আছে কালো অতল ছুটি চোখের চাহনি।

এ-দায়, এই জ্বালা মফস্বলের সেই শহরে ছিল না।

কলেজ দূর নয়, হাঁটা-পথেও মোটে মিনিট কুড়ি।

এই কয় সপ্তাহে পথটা সৌরব পুরোপুরি চেনা হয়ে গিয়েছে। যাবার পথে

একটি দোকানের আয়নাতেই মুখ দেখে। পার্কের কোণের চিনবাদামওয়ালার সঙ্গেও তার রীতিমত ভাব। দু পয়সায় সে রোজই দু-চারটে কাউ পায়। আর দুপুরে দুই পিরিয়ডের ফাঁকে শরবতের দোকানে দাঁড়িয়ে সে ব্যানানার ফোঁটা-মেশানো ঘোলেব শরবত খাবেই। রোজকার হাত-খরচ দু আনার এই হিসাব।

এই সব ছোট ছোট শখ, সমান্ত শহরে বিলাস সৌরর চরিত্রে জমছে। তবু তো এখনও সে আর-কজন সহপাঠীর মত দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে গুরুজনদের লুকিয়ে খেতে শেখে নি। লোভ হয় নি যে তা নয়, আসলে সাহসে কুলয় নি।

টুলুর ভীরুতার কিছুটা সৌর শহরেও সঙ্গে করে এনেছে। নইলে সে তো কবেই অন্য সকলের সঙ্গে ম্যাটিনীতে নামকরা সেই বিলিতী ছবিটি দেখে আসতে পারত। রঙিন প্রাচীর-চিত্রে ছবিটির একটি দৃশ্যের নমুনা সে দেখেছে, মুগ্ধ হয়েছে। মূক ছবি বাচাল হয়েছে সৌর জানে, কিন্তু আজও একটিও দেখবাব সুযোগ ঘটে নি।

তবু, সন্দেহ নেই, সৌর বদলে যাচ্ছিল। অথবা বদলে নিচ্ছিল নিজেকে। এই শহরটার উপযুক্ত হবাব সাধনায় সজ্ঞানে নিজেকে সমর্পণ করেছিল এবং অপরের দিকে চেয়ে, অপরের সঙ্গে তুলনা করে নিজের সাফল্যের বিচার কবছিল।

কিন্তু যে পরিবর্তনটা ঘটছিল অলক্ষ্যে, ওই চাহনি আবিষ্কারের ক্ষণ থেকে সেটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগে আয়নার সামনে দাঁডালে যে ছবিটা ভেসে উঠত, এখনও সেটাই ভাসে, কিন্তু ঠিক যেন সেটা নয়। কিংবা সেটাই, শুধু যে দেখছে তার চোখ দুটি আলাদা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যাকে দেখছে সে সৌর, কিন্তু যে দেখছে সে অন্য একজন। সেই একজন কে, তাও সৌর জানে। যে মুহূর্তে সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তেই তাব চোখ দুটি তার খাতা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়; কিংবা সৌর জানলার ও-পাশের ওই মেয়েটির দেখা পায়। তার চোখ দিয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। হাতের উলটো পিঠটা গালে ঘষে আর ভাবে, এখনও তার চিবুক আর কপোল এত মসৃণ, এত মেয়েলী কেন! ঠোঁটের উপরের দিকটা অনেক দিনই নীলাভ হয়ে উঠেছে, কিন্তু ক্ষুর লাগাবার উপযুক্ত হয় নি। তা ছাড়া ক্ষুর ছোঁয়াতে সৌরর শুধু লজ্জা নয়, ভয়ও করে।

একবার কামাতে গিয়ে সৌর রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলেছিল। দেখতেও কেমন বেখাপ্পা লাগছিল, আয়নার দিকে চাইতে কেমন অস্বস্তি বোধ হয়েছিল। নিজেকে ঈষৎ অপরিচিত ঠেকছিল।

তার চেয়ে এই ভাল, ঠোঁটের উপরে এই নীলাভ রেখাটুকু মন্দ কী! যে চোখ দুটি পাশের বাড়ির মেয়েটির কাছ থেকে ধার করে এনেছে, সেই চোখ দুটি তাকে অভয় দিয়ে বলল, "বেশ তো, এই বা মন্দ কী!"

এই পরিবর্তনের কতটা মনের, কতটা শরীরের? সৌর কোনদিন ভেবে কূল পায় নি। মনে যা আছে, তা তো মনেই আছে। কিন্তু শরীরের লক্ষণগুলিকে সহজেই চেনা যায়। তারা এক নজরেই ধরা পড়ে। যেমন কিছুদিন থেকে সৌর লক্ষ্য করছে, তার গলা কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা, বেসুরো, কর্কশ। একেবারে গোড়ায় অস্বস্তি হয়েছিল, গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সৌর অকারণেই লজ্জা পেত, এখন পায় না। শুধু গলা কেন, গালও কেমন ভাঙা-ভাঙা। শ্রী আর সুষমাটুকু সৌর কবে কী করে খুইয়ে বসল সে নিজেও জানে না। গোটা কপালটা ঘামাচির মত বড় বড় ফুস্কুড়িতে ছেয়ে গেছে, এর নাম ব্রণ। সৌর মাঝে মাঝে খুঁটে খুঁটে দেখে। যেগুলো শুকনো তার ভিতরে আছে সাদা মতন শাঁস, সেটা বেরিয়ে গেলে একটা কালচে চিহ্নমাত্র পড়ে থাকে। বিশ্রী বিশ্রী গোটা মুখটাই তার নিজের চোখে কেমন হতরূপ লাগে। এই লাগাটা, কে জানে, হয়তো সংস্কার মাত্র। সুকুমার কিশোর-আবরণ সরিয়ে দিয়ে যে পুরুষ-মুখখানা উঁকি দিচ্ছে, তার আকর্ষণও হয়তো কম নয়। নইলে ওই মেয়েটি চেয়ে চেয়ে দেখবে কেন?

আরও একরকমের অভিজ্ঞতা সৌরর সম্প্রতি হয়েছে, সে জানে না তার তাৎপর্য কী। রাত্রিবেলা আলো নিবিয়ে দিয়ে যেই বিছানায় শুয়ে পড়ল অমনি যেন তখনই জানলার বাইরে, উপরের আকাশ ফুটে উঠল অজস্র তারা। তার মধ্যে দুটি তারা ওই মেয়েটির চোখ। যেন এত রাত্রে অন্ধকারে জানলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখা যাবে না বলে মেয়েটি উঠে গেছে একেবারে আকাশে, সেখান থেকে নির্নিমেষ চোখে সৌরকে দেখছে।

সৌর স্বপ্নেও তাকে পায়। স্বপ্নে সে আকাশের নয়, ও-পাশের জানলারও নয়, একেবারে কাছের। সৌরর হাত বাড়িয়ে দেয়, তাকে টেনে আনে কাছে, আরও কাছে, আর ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে যায়। উপাধান সিক্ত, স্বেদাপ্লুত শরীর রোমাঞ্চিত যন্ত্রণায় যেন কঠিন। সেই অব্যক্ত অস্থিরতাই সৌরর সেই বয়সে একমাত্র অসুখ, আর সেই অসুখটাই সুখ।

ঘুম ভেঙে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় শুয়ে শুয়ে কতদিন সৌর স্বগত বলেছে, "তুমি আর ও-ভাবে চেয়ো না, আমাকে টেনো না। তোমার নির্বাক চোখ দুটিকে আমার বড় ভয়। তোমাকে জানতে চাই আরও কাছে থেকে, আরও স্পষ্ট করে। কিন্তু তা হবার নয়। আমার ভীরুতাই আমার বৈরী, কুমারী-লজ্জা তোমার। মাঝপথে আমার ভীরুতা আর আমার লজ্জারই শুধু মিলন হতে পারে। হয়ে থাকে; কিন্তু আমাদের কখনও নয়। আমি তোমাকে জানি না। এমন কি তোমার নামও না। কোনদিন কাউকে শুনি নি তোমার নাম ধরে ডাকতে। আমি কিন্তু মনে মনে তোমাকে একটা নাম দিয়েছি: সুলক্ষণা। এ নামটা আমার নয়, কোন উপন্যাসে পড়া এক নায়িকায়। সেই নামটাই আমি তোমাকে দিলুম। কিন্তু তুমি আমাকে দিলে কী? শুধু চাহনি? ও আমি চাই নি, চাই নে।

"এবার আমার কথা বলি। আমার নাম সৌর। আসলে সৌরেশ, ভাল শোনাবে বলে সেটাকে ছেঁটে আমি ছোট করে নিয়েছি। অন্তত নাম থেকে গ্রাম্য গন্ধটা একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছি। নইলে গ্রামে আমার ডাকনাম ছিল টুলু। ওটা বড় হালকা, ও নামে এখানে কলকাতায় পিসিমার এই দেওয়ের বাড়িতে, আমাকে কেউ ডাকে না। কোন্ নামটা তোমার পছন্দ হবে তাও জানি না। আমি তাই তিনটে নামই তোমাকে জানিয়ে রাখলুম। যেটা খুশি তুমি বেছে নিয়ো। সেই নামে আমাকে চিঠি লিখো।

"অবশ্য চিঠি তুমি কোনদিন লিখবে না জানি। আমার কিন্তু সাধ হয়, তোমাকে চিঠি লিখি। অনেক দিন সাদা কাগজে অনেক মুসাবিদা করেছিও, শেষ করি নি, আর তোমাকে যে পাঠাই নি তা তো তুমিও জান। পাঠাবার উপায়ই বা কই? যা হয় একটা পথ তুমিই বলে দাও না! ধর আমি যদি একটা গল্পের বইয়ের পাতার ফাঁকে চিঠিটা রেখে দিই, তারপর একটা কাপড়ে জড়িয়ে সেটা ছুঁড়ে দিই তোমার জানলায়, তুমি কি পাবে? আবার চিঠিটা:ক ঘুড়ির সঙ্গে বেঁধে দিয়েও পাঠানো যেতে পারে।

"বিকেলে তুমি যখন ছাদে ওঠ, ঘুড়িটা সুতো ছিঁড়ে পড়বে তোমার পায়ের কাছে, তুমি আমার চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ো। কিন্তু আমি যে ছাই ভাল করে ঘুড়ি ওড়াতেও শিখি নি।"

একদিন সৌরর ঘরে দরজা সব বন্ধ ছিল, একটা চড়ুই পাখি পথ না পেয়ে উড়ে উড়ে বার বার ফিরে আসছিল তার টেবিলে, শেষে অস্থির হয়ে সৌরর

হাতটাই ঠুকরে দিয়েছিল। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ ভাবনাগুলো তেমনি সেদিন পথ না পেয়ে বার বার সৌরবই বুকের ভিতরে ডানা ঝটপট করেছে। একটি চাহনির বিন্দুকে কেন্দ্র করে অজস্র পাতার ঘূর্ণি উড়েছে।

এই নিরুপায় অস্থিরতাই সৌরর জীবনে প্রথম প্রেমের, আর ঠিক করে বলতে গেলে, প্রথম প্রেমে পড়ার, অনুভূতি।

তার ক্ষীণ অপুষ্ট স্বগত-প্রণয়ের কথা জানত মোটে আর-একজন, ক্লাসেরই একটি ছেলে, তার নাম দেওয়া যাক বিজন। এই একটি ছেলের সঙ্গেই সৌর কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল। তার কারণ এই নয় যে, সব ছেলের ভিতর থেকে বিজনকেই তার বেছে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। বিজনকে সে যে বিশেষভাবে পছন্দ করেছিল তাও নয়। বিজনই তার কাছে এগিয়ে এসেছিল।

সৌর ক্লাসের যে-বেঞ্চে বসত, সেটা একেবারে পিছনে, সব শেষের সারি, তার পরেই দরজা। তারই পাশে বসত বিজন। প্রথম আলাপ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হয় নি। সৌর দেখেছিল, একটি ছেলে রোজই ক্লাস শুরু হবার মিনিট কয়েক পরে চুপে চুপে তার পাশে এসে বসে। নাম-ডাকা শেষ হতেই কিছুক্ষণ উসখুস করে, তারপর মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। যতক্ষণ বসে থাকে, ততক্ষণও লেকচারে তার কান থাকে না, পেন্সিল কাটে, খাতায় ছবি আঁকে, অথবা বাজে নবেল-টবেল-জাতীয় কিছু পড়ে।

সৌরর সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই। না চেহারায়, না আচরণে, না প্রকৃতিতে।

সে-ই একদিন যেচে আলাপ করল।

"পরের ক্লাসটা কার?"

সৌর রুটিন দেখে বলল, "সি-এম-এর। চার নম্বর রুম।"

"একটা উপকার করবেন? আমার হয়ে প্রক্সি দিয়ে দেবেন?"

প্রক্সি কথাটার মানে সৌর অবশ্য জেনে ফেলেছিল: নাম-ডাকের সময় গরহাজির কোন ছাত্রের হয়ে সাড়া দেওয়া। এই প্রথাটার প্রচলন অবাধ, তবে এতকাল সৌর ছিল শুধুই দর্শক বা শ্রোতা, কেননা অন্য কারুর সঙ্গেই তার তেমন মাখামাখি ছিল না। এই প্রথম একজন তাকে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল।

"আমার নাম বিজন—বিজন পালিত।"

বলেই ছেলেটি একবার ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সৌর অবাক হয়েছিল। সে যে এ-কাজে রাজী নয়, এ-সবের অভিজ্ঞতা তার নেই, এটুকু বলবার অবসরও পেল না।

পরের পিরিয়ডে সি-এম-এর ক্লাস। অর্থনীতির প্রবীণ অধ্যাপক ক্লাসে এলেন। চোখে মোটা চশমা, বগলে মোটা মোটা বই। সৌর সেই থেকে কেবলই মনে মনে বলেছে, 'কক্ষনো ওর হয়ে প্রক্সি দেব না আমি' অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার বার জপ করেছে, থার্টি-এইট—থার্টি-এইট। তার নিজের নম্বর কুড়ি।

সেই নম্বরে সে যথাসময়ে সাড়া দিল কিন্তু তার বুক-ধুকধুকুনি কমলো না। এখনও তার আসল পরীক্ষা বাকি। অধ্যাপক ডেকে চলেছেন, বাইশ, তেইশ…সাতাশ…ত্রিশ—বড় ঘড়িতে টকটক শব্দ করে যেন সেকেণ্ডের কাঁটা সরে যাচ্ছে। সৌর শুনতে পেল, 'বত্রিশ—তেত্রিশ'—আর দেরি নেই, আটত্রিশ এসে পড়ল বলে। শেষ ইস্টিশনে পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই যাত্রীরা যেমন অতি-ব্যস্ত হয়ে বিছানাপত্র বেঁধে নেয়, সৌরও পাংশু উত্তেজিত, তেমনই নিজেকে তৈরি করতে থাকল। "আটত্রিশ"—এই রোল-নম্বর ডাকা হলে সে সাড়া দেবে কি দেবে না, এই প্রশ্নটাই তখন আর বড় নয়, সৌর ততক্ষণে জেনে ফেলেছে সাড়া সে দেবেই। তাকে দিতে হবে। আধ-চেনা যে ছেলেটি কোন-দিন ক্লাসে বসে না, পড়া শোনে না, তার কণ্ঠস্বরে কী একটা জাদু আছে আর ব্যক্তিত্বে প্রচ্ছন্ন একটা শক্তি, সৌর ঠিক ধরতে পারছিল না, কিন্তু প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাটুকু খুইয়ে বসেছিল।

অধ্যাপক ডাকলেন, "থার্টি-এইট।" সৌরর মনে হল, হুড়মুড় করে যে-গাড়িখানা এসে পড়ল, সে থামবে না, কিন্তু দৌড়ে তারই পাদানিতে তাকে উঠতে হবে, গত্যন্তর নেই। যেমনি প্রতীক্ষিত নম্বরটি তার কানে এল, অমনিই সৌর বলে উঠল—বরং নিজেকে বলতে শুনল—"ইয়েসার্"। নিজের গলা নিজের কানেই কেমন যেন ক্ষীণ, চেরা-চেরা, অদ্ভুত শোনাল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতি একটা গাড়ি যেন সহসা ব্রেক কষে থেমে গেল। অধ্যাপক, সৌর টের পেল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যেন এই দিকেই চেয়ে আছেন। সার্চ-লাইটের মত সন্ধানী চোখ কাকে যেন খুঁজছে। আর সেই চোখ থামল ঠিক সৌররই মুখের উপর এসে। সৌর গম্ভীর গলা শুনতে পেল, "তুমি সাড়া দিয়েছ ?"

সোর ঘাড় কাত করে স্বীকার করল।

"উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও।"

দাঁড়িয়ে উঠে সৌর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ইয়েস সার্।"

"তোমার নম্বর থার্টি-এইট?"

"হ্যাঁ সার্।" সৌরকে আবার মিথ্যে কথা বলতে হল, কেননা আর ফেরবার পথ ছিল না।

"কিন্তু তোমার নম্বর তো কুড়ি কিংবা বাইশ, তাই না?"

সৌর অধ্যাপককে খাতায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতে দেখল।

"ইয়েস, হিয়ার য়ু আর—। তোমার নাম সৌরেশ?"

"ইয়েস সার্।"

"আবার বিজনও? বাট য়ু কান্ট বী বোথ অ্যাট দ্য সেম টাইম।"

সোর আবার বলল, "ইয়েস সার্"—তার শব্দকোষে অন্তত তখন মাত্র ওই দুটি শব্দই অবশিষ্ট ছিল।

"তা ছাড়া বিজনকে আমি চিনি। বিজন তো তুমি হতে পারবে না।" অধ্যাপকের কণ্ঠ গম্ভীর, মুখে বিদ্রূপের হাসি।

"বিজন হতে হলে তোমাকে আরও লম্বা-চওড়া হতে হবে, বুঝলে? কবজি মোটা হবে, মাস্‌ল্ ফোলা। আর গলাতেও জোর আনতে হবে। এরকম চিঁ-চিঁ গলায় কি বিজন হওয়া যায়? সে কলেজ-টীমের খোলোয়াড়, জান না?"

সৌর বসে পড়েছিল। কান দুটি লাল, মুখের ভিতরটা তেতো। সে ভাবছিল, আর কী, এর পরে কী, অপমানের আর কত বাকি! এর পরে কি শাস্তিও আছে? খাতা থেকে তাব নাম কি কেটে দেওয়া হবে? সি-এম কি তাকে বের করে দেবেন ক্লাস থেকে?

কিন্তু সি-এম সে-সব কিছুই করলেন না, একটু পরেই নাম-ডাকার খাতাটা মুড়ে বই খুলে পড়াতে শুরু করলেন।

ক্লাসের পর সকলের পিছে সে মাথা নিচু করে করিডর দিয়ে চলছিল, হঠাৎ তার পিঠে হাত পড়ল। ফিরে চেয়ে দেখল, বিজন। বিজন বলল, "আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

আর তখনই সৌর, দুর্বল ভীতু সৌর, ভয় পেল। সে তো এক নিমেষেই বুঝে নিয়েছে কী কথা আছে তার সঙ্গে বিজনের। এই সবল ক্লাস-পালানো সহপাঠীর কাছে সে প্রচণ্ড একটা ধমক খাবে। অধ্যাপক সহজে রেহাই

দিয়েছেন, এ দেবে না। সামান্য একটা কাজের ভার দিয়েছিল সৌরকে, সৌর সেটা হাসিল করতে পারে নি, নিজেকে তো বটেই, বিজনকে সুদ্ধ অপদস্থ করেছে, এই অপরাধের কি ক্ষমা আছে? একবার আড়চোখে চেয়ে দেখল সৌর—কী আছে বিজনের চোখে, রোষ, না বিদ্রূপ, ঠিক ঠাহর করতে পারল না। যদি বিজন রুষ্টই হয়ে থাকে, সে কী করবে, চেপে ধরবে কি সৌরর হাতের কবজি, একটু-একটু করে মুচড়ে দেবে আর জ্বলতে থাকবে তার চোখ দুটো? সৌরর ভয় করছিল, অথবা বিজন ওর গালে আলগোছে একটা চড় মেরে ধাক্কা দিয়ে হেসে উঠতে পারে, বলতে পারে, "অপদার্থ, মেনিমুখো কোথাকার!"

বিজন ওকে সিঁড়ির কোণে নিয়ে এসেছিল। একখানা হাত আলগোছে তখনও ওর পিঠে রাখা ছিল। শুনল, সৌর অবাক হয়ে শুনল, বিজন খুব নিচু গলায় ওকে বলছে, "ভাই, আমাকে মাপ কর।"

"মাপ করব? আমি?" সৌর সিঁড়ির ধাপগুলোকে নীরবে বলতে থাকল, 'কেন, আমাকে ও মাপ করতে বলছে কেন? দোষ করছি আমি, আবার মাপও আমিই করব? বিজন ঠিক কী বলতে চাইছে, আমি বুঝতে পারছি না,' সৌর অনুনয়ের সুরে ধাপগুলোকে বলল, 'তোমরা একটু বুঝিয়ে দাও।'

বিজন বলছিল, "আমার জন্যেই আজ সি-এম-এর কাছে তোমাকে অপদস্থ হতে হল। ভাই, তুমি মনে কিছু কোর না।"

সৌর, অভিভূত সৌর, তখনও কাঁপছিল—এবার বিস্ময়ে। ছাত্রদলের নেতৃস্থানীয় একটি ছেলে বন্ধুর মত তার পিঠে হাত রেখেছে, সহৃদয় কণ্ঠে কথা বলছে, তার কয় মাস শহরবাসের ইতিহাসে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

বিজন বলছিল, "তুমি আমার যে উপকার করেছ, তা ভুলব না।"

ক্ষীণ গলায় সৌর বলতে চেষ্টা করল, "উপকার করলুম কোথায়, করতে তো পারি নি।"

তেমনই সস্নেহে বিজন বলল, "করতে চেয়েছ তো। চাওয়া আর পারা একই কথা।"

বলতে বলতে বিজন ওর মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল। বাইরে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিজন বলল, "আজ থেকে আমরা বন্ধু।"

অভ্যাস নেই, সিগারেট টান দিতে গিয়ে সৌর খুকখুক করে কাশছিল, ওর

দুটো চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। তবু সিগারেট ফেলে দেয় নি। ভালও লাগছিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পোড়া তামাকের বিচিত্র স্বাদে, ওর ভিতরে আত্মপ্রত্যয়ের একটি ছবি জাগছিল। 'আমি আর এ-রকম থাকব না, এই আনাড়িপনা আর না,' সৌর বলছিল মনে মনে, 'আমি অন্যরকম হব, সকলের মত হব, স্বাভাবিক হব।'

বিজনের মধ্যেই সৌর তার প্রথম নাগরিক বন্ধু পেল।

এই বিজনকেই সৌর একদিন সব খুলে বলেছিল।

একটা ম্যাটিনী শোয়ের পর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল ময়দানে। ছোট্ট একটা ফুলগাছের পাশে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। চিনেবাদাম ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খোসাগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলছিল।

সৌর বিজনকে সেই মেয়েটির কথা বলল, যে রোজ জানলায় এসে দাঁড়ায়, কালো দুটি চোখ তুলে তাকে নির্নিমেষে দেখে।

বিজন বলল, "শুধু দেখে? আর-কিছু না?"

"আর কী?"

"কথা বলে নি?"

সৌর অবাক হয়ে বলল, "দূর!"

"চোখের কোনরকম ইশারাও না?"

"না।"

একটু যেন বিরক্ত হল বিজন, সৌরর হাত থেকে আধ-খাওয়া একটা সিগারেট কেড়ে নিয়ে বলল, "সে না করুক, তুই তো করতে পারতিস!"

"কী করে করব?"

"এমনি করে।" বিজন ওকে চোখের ইশারার কায়দাটা শিখিয়ে দিল।— "একটা চোখের কোণা একটিবার কুঁচকেই বড় বিস্ফারিত করে ফেলবি, যেন বন্দুকের টিপার টিপলি, বাস্, দেখবি, গুলি ঠিক গিয়ে বিঁধেছে।"

সৌরর তাতেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। অবিশ্বাসটা ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে নয়, ভয় ছিল তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য নিয়ে। এই সেদিনও যে সামান্য একটা প্রক্সি দিতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছিল, এইসব গুলি ছোড়াছুড়ির ব্যাপারটা হাসিল করা তার পক্ষে সহজ হবে না, বুঝতে পেরেছিল।

ওর সংশয়টা মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে বিজন বলল, "চোখের ইশারা দুদিন যদি কাজে না আসে, তবে তৃতীয় দিনে একবার মুচকি হাসবি। দেখবি, এই হাসিটা অব্যর্থ। হাসিটা ও ফিরিয়ে দেবেই।"

"আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ?" সুবোধ ছাত্রের মত অনুসন্ধিৎসু গলায় সৌর শুধাল।

বিজন হেসে ফেলল ওর রকম দেখে : "তাতেও অবশ্য ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, মেয়েরা অনেক সময় মনের ভাব গোপন করে। সকলের কাছ থেকে লুকয়। নিজেদের কাছ থেকেও। জানিস তো, ওদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না ?"

বোকার মত সৌর বলল, "তবে বুঝব কেমন করে ?"

প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বিজন মাথা নাড়ল : "তবু বোঝা যায়। ওসবের আলাদা একটা ভাষা আছে। প্রমাণ আছে, লক্ষণ আছে। এই যে বলছিস, তোর দিকে রোজ চেয়ে থাকে, এটাই তো একটা প্রমাণ।"

"প্রমাণ ?"

বিজন নিশ্চিত গলায় বলল, "প্রমাণ।"

আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বিজন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগল মুখে শেষবেলার রোদ এসে পড়ছিল, সে-দিকে পিঠ দিয়ে বসল। যে-ভাবে ক্যারম খেলে, সেইভাবে আঙুল দিয়ে ঘাসের শীষ থেকে চিনেবাদামের খোসাগুলো সরিয়ে দিতে লাগল। তার বিকেলটা যখন আরও চুপ, আরও ময়লা হয়ে এসেছে, তখন ধীরে ধীরে বিজন বলল, "অবশ্য আরও প্রমাণ আছে। ওর যদি ছোট কোন বোন বা বোনঝি বা ভাই থাকে, তাকে কোলে নিয়ে বার বার চুমু খাবে, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে। আজ পর্যন্ত খায় নি ?"

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। বোকা-বোকা গলায় সৌর বলল, "সে-রকম কোন বোন-টোন ওর আছে কি না জানি না যে।"

এবার যেন একটু রেগে উঠল বিজন। পা দিয়ে পোড়া সিগারেটটা থেঁতলে দিয়ে বলল, "কিছুই যখন জানিস না, কোনও খবরই যখন নিস নি, তখন আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিস কেন ? প্রেম করবার শখ ষোল আনা, অথচ সাহস এক ফোঁটা নেই ! ছিঃ !"

এই 'ছি'-শব্দটা গরম সীসের মত সৌরর কানে গিয়ে বিঁধল। ফুলগাছের একটা পল্লবকে সাক্ষী মেনে বলতে থাকল, 'বাস্তবিকই অপদার্থ, একেবারে অপদার্থ আমি।' বিজনের দিকে সে চাইতে পারছিল না। প্রকৃসি দিতে অক্ষমতাকে বিজন একবার ক্ষমা করেছে, কিন্তু তার এই অমার্জনীয় ভীরুতার কোনও ক্ষমা নেই।

রুষ্ট বিজন, সৌর সম্পর্কে হতাশ বিজন, বলেই চলছিল, "প্রমাণের কথা বলছিস? এমনি আরও হাজার প্রমাণের কথা আমি বলতে পারি। একবার ওর দিকে চেয়ে একটুখানি হেসে দেখ্, সেই হাসি ও ফিরিয়ে দিক, দেখবি ভাব-বিনিময়ের আরও কত পথ খোলা হয়ে গেছে। গরজ তো ওদেরও। তোকে দেখে বার বার যদি গায়ের আঁচল টানে, সরায় আর ঢাকে—তা থেকেও মানে বুঝে নিতে পারিস।"

সৌরর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা ঘাসের গোড়া চিবিয়ে চিবিয়ে সে রস-সংগ্রহ করছিল। অনেক পরে যখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসে ওর মুখখানা প্রায় আড়াল করে ফেলল, তখন সৌর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "তুই হলে কী করতিস?"

"আমি?" বিজন হেসে উঠল হা-হা করে: "আমি হলে তোকে যা যা শিখিয়ে দিয়েছি, তার সবগুলোই করতুম। তাতেও কাজ না হলে কোনদিন যে-কোন একটা সুযোগ আড়ালমত পেলেই ওর হাত চেপে ধরতুম। ছোঁয়া পেলে ওরা নরম হবেই।"

"আমি তা চাই না," জোরে জোরে মাথা নেড়ে সৌর হঠাৎ বলে উঠল, "কোন ছোঁয়াটোয়া আমি চাই না। আমি ওকে ভালবাসি মনে মনে। মন পেলেই ঢের পেয়েছি ধরে নেব।"

বিজন খুকখুক করে একবার কাশল। সৌরর কানে খুব বিশ্রী লাগল। শুনল, বিজন বলছে, "ওসব মন-টন সব বাজে জিনিস। ফাঁকা, সব হাওয়া। শুধু হাওয়া খেয়ে পেট ভরে না। শুধু মন পেয়ে মন ভরে না। ওসব হাওয়া-বাজি রাখ্ সৌর। তোকে মানুষ হতে হবে। জোর দেখাতে হবে। গট গট করে একদিন ওদের বাড়ি চলে যাবি—যে-কোন ছুতোয়, যত তাড়াতাড়ি পারিস। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবি। পা টলবে না, গলা কাঁপবে না। পারবি না?"

সেই আধ-অন্ধকারে বিজন ওর দিকে চেয়ে রইল। অনেক পরে, অনেক ঘাসের শীস ছিঁড়ে ছিঁড়ে সৌর শেষে সম্মোহিতের মত বলল, "পারব।"

আর তখনই বিজন ওর হাতে একটা সিগারেট দিয়ে ধরিয়ে দিল। দেশলাইয়ের আলোয় সৌরর মুখটা একবার দেখে নিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "সাবাস! এই তো চাই। সাহস না থাকলে আবার পুরুষ!"

একটি ছমছমে পরিবেশে, ময়দানে বসে, কুহেলী-মলিন সন্ধ্যায় সৌর পৌরুষের বিচিত্র, ইতিপূর্বে-অজ্ঞাত সংজ্ঞা শিখল।

লতা বউদি কিন্তু বিজনের ব্যবস্থাপত্রে সায় দিলেন না।

"নতুন ঠাকুরপো, তুমি কক্ষনো ওসব করতে যেয়ো না। সব কাজ সকলের সাজে না।"

মোটে তো কয়েক ঘণ্টার আলাপ, এরই মধ্যে লতা বউদি কী করে টের পেয়ে গিয়েছেন যে, সব কাজ সৌরকে দিয়ে হয় না।

সৌর মাথা নিচু করে চায়ের বাটিতে ছোট ছোট ঢেউ তুলছিল, বিশেষ কথা বলছিল না। বলার মত তখন আর-কিছু ছিলও না, মাঝে মাঝে আড়চোখে একবার বিজনকে একবার লতা বউদিকে দেখছিল।

বিজন কখন যেন এরই মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল, ঘাড়ের নীচে দুটো হাত ভাঁজ করে রেখে বালিশের প্রয়োজন মিটিয়েছিল, দৃষ্টি শূন্যে অর্থাৎ কড়িকাঠে, ঠোঁটে-চেপে-ধরা সিগারেট জ্বলছিল। আরামে এবং আলস্যে বিজন চোখ বন্ধ করেছিল, পাশে-রাখা পেয়ালায় চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল, বিজনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সিগারেটের ধোঁয়ার রঙ গাঢ়, লতা বউদির ঈষৎ রুক্ষ চুলের যে-গুচ্ছ কপালের উপর এসে পড়েছিল অনেকটা সেইরকম দেখতে, চায়ের পেয়ালার ধোঁয়া প্রায় অদৃশ্য, ঘরের কোণের মাকড়শার জালের মত মিহি। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত দিনের আলো এসে না পড়লে তাকে ঠাহর করাই যেত না।

একবার সেই ফাঁক দিয়ে চতুর একটু হাওয়াও এল, খানিকটা সিগারেটের ছাই পড়ল বিজনের গলার খাঁজে। কেননা বিজন চিত হয়ে সিগারেট শুধু টেনেই চলেছিল, ছাই ফেলছিল না, বোধ হয় ভাবছিল, থাকুক না, আয়েশ করে টানা শেষ হলে একসঙ্গে সবটাই ছুঁড়ে ফেলব। অথবা বিজন চোখ বুজে অন্য সুখের কথা ভাবছিল, সিগারেটটার অস্তিত্ব একরকম ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু যেই ছাই ঝরে পড়ল, অমনই চমকে উঠল বিজন, বলে উঠল, "উঃ!"

সন্থ-পোড়া সিগারেটের টাটকা ছাই, তখনও কিছু গরম ছিল। বিজন কাতরোক্তি করল, কিন্তু চোখ তার যেমন বোজা ছিল তেমন বোজাই রইল, ঘাড়ের-নীচে-রাখা হাত দুটির একটিও বেরিয়ে এল না।

নিজের ঠাণ্ডা পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই সৌর দেখতে পেল, লতা বউদি একটা টোকা দিয়ে ছাইয়ের গুঁড়ো সরিয়ে দিলেন। দিলেন, কিন্তু সবটা সরাতে পারলেন না, বিজনের গলার খাঁজে ঘাম জমে ছিল, তার সঙ্গে খানিকটা মিশে গিয়ে বিশ্রী গোটা দুটো কালো দাগ পড়ল।

বিজন দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু সৌর পাচ্ছিল। বার বার তার চোখ মাছির মত উড়ে উড়ে ওই কালো দাগ দুটোর ওপরই বসছিল। দেখছিল, লতা বউদি তর্জনী দিয়ে ঘষে ঘষে দাগটা তুলে দিতে চাইছেন। বিজনের চোখ বন্ধ, সে দেখছিল না, বোধ হয় টের পাচ্ছিল। দাগটা অবশ্য আঙুলের ঘষাতেও মুছে যেতে চাইছিল না। বরং আরও ছড়িয়ে পড়ছিল।

সৌর তখনও চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

ঠাণ্ডা চা, বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবু পেয়ালাটা সরিয়ে দেবার উপায় নেই, কেননা সরালে আড়চোখে চাওয়ার উপায় থাকে না, নিজের অস্বস্তিটা জমা দেবার পাত্রটা থাকে না, চোখ তুলে সোজাসুজি চাইতে হয়। কথা বলতে হয়।

এই যে বিজন দু-চার কথার পর টানা-টান হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজল, সৌর এখন করে কী? লতা বউদির সঙ্গে কথা বলবে? কিন্তু কথা বলার বিষয় কই?

বিষয় তো ওই একটাই—সৌরর পাশের জানলার ওই মেয়েটি। বউদি ফিরে ফিরে ওই প্রসঙ্গেই আসছেন। ঠাট্টা করছেন কি না, সৌর ঠিক বুঝতে পারছে না। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনায় তার পটুতা নেই, প্রসঙ্গটা সে নিজে থেকে তোলেও নি, বিজনই তুলেছিল, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত চোখ বন্ধ করে ভান করছে ভালমানুষির।

তা ছাড়া, লতা বউদির কথার ধরন থেকে মনে হয় আজই প্রথম নয়, আগেও বিজনের কাছ থেকে তিনি কিছু কিছু শুনে থাকবেন। কী শুনেছেন তিনিই জানেন, কিন্তু প্রসঙ্গটা আর ছাড়ছেন না, ঘুমকাতুরে লোক নরম পাশ-বালিশ যেভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে, বউদিও মেয়েটির কথা যেন সেইভাবেই আঁকড়ে ধরে আছেন।

অথচ সৌর মজা পাওয়া দূরে থাক্‌, ক্রমশ যেন স্বাচ্ছন্দ্যও খুইয়ে বসছিল। সে বাক্‌নিপুণ নয়, মেয়েদের উপস্থিতিতে তো নয়ই, এবং একটি মেয়ের সঙ্গে বসে অন্য একটি মেয়ের কথা আলোচনা করবার অভ্যাস তার কদাচ ছিল না।

লতা বউদি জিজ্ঞাসা করছিলেন, "বল না নতুন ঠাকুরপো, সে দেখতে কেমন? ময়লা, না ফরসা?"

"ময়লা।"

"আমার মত?"

সৌর এবার চেয়ে দেখেছিল: "না। আপনি তো ফরসা।"

"স্বাস্থ্য কেমন?"

সৌর ভেবে বলেছিল, "রোগা—খুব রোগা।"

"তার মানে তন্বী। গায়ে এক ফোঁটা মাংস নেই?"

সৌরর মুখ চোখ লাল, কান গরম হয়ে উঠেছিল: "কী জানি, অত দেখি নি। একেবারে কাছ থেকে কোনদিন দেখি নি তো।"

"বেশী কাছ থেকে কোনদিন দেখতে যেয়োও না।" লতা বউদি মুখ টিপে হাসছিলেন: "বাড়াবাড়ি রকমের কিছু কোরও না। বিজন তোমাকে কী পরামর্শ দিয়েছে জানি না, কিন্তু বাপু, সব কাজ সকলের সাজে না।"

কথাগুলো তীরের মত সৌরকে বিঁধছিল। কোন্‌টা প্রশংসা, কোন্‌টা পরিহাস, ঠিক ধরতে পারছিল না। না পেরে আরও কুণ্ঠিত, আরও বিব্রত হয়ে নুয়ে পড়ছিল চায়ের পেয়ালার উপরে। ভাগ্যে, বিস্বাদ হক, জুড়ানো হক, এই চাটুকু ছিল, নইলে সৌর কোথায় মুখ লুকত!

লতা বউদি আস্তে আস্তে বলছিলেন, "ওর কথায় খেপে গিয়ে কবে কী পাগলামি করে বসবে, মুশকিলে পড়বে শেষে। এ-সব কাজ বিজন-টিজন এরা পারে। ওস্তাদ ছেলে, তায় দুকানা-কাটা, ওদের তো লজ্জাশরম বলে কোনও বস্তু নেই। নাইয়ের নালের সঙ্গে আঁতুড়েই ওদের ওসব বাদ গেছে।"

লতা বউদি আবার বললেন, "ওরা দুকান-কাটা।" বলতে বলতে, সৌর দেখতে পেল, লতা বউদি ঝুঁকে পড়ে, সত্যিই বিজনের কান আছে কি না পরখ করে দেখতেই যেন কান দুটি আলগোছে মলে দিলেন।

বিজন চোখ খুলল তখন। হাই তুলে বলল, "আঃ!" সৌর টের পেল, তার হাত দুটিও কখন অজ্ঞাতসারে উঠে গিয়ে কান ছুঁয়েছে।

এই বোকামিটা সৌর বহুদিন অবধি ভুলতে পারে নি।

বিজনের চুলের ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে লতা বউদি বলছিলেন, "এরা হল বদমাশ, ডানপিটে। আর তোমরা—তোমরা যতদূর বুঝছি ভাল ছেলে।"

লতা বউদির বাহুমূলে, ব্লাউজের হাতা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা কালো ছড়ানো দাগ, বোধ হয় প্রথমবারকার টিকের, সৌর দেখছিল। ওই হাতটা যার সেই লতা বউদি এইমাত্র তাকে বললেন, 'ভাল ছেলে।' 'ভাল' কথাটাও যে কখনও কানে খারাপ শোনাতে পারে, সৌর প্রথম জানল।

বেলা পড়ে এসেছিল। একটু পরেই সিঁড়িতে দপদাপ আওয়াজ শোনা গেল, অনেকগুলো ছোট ছোট পা হুড়মুড় করে উপরে উঠছে। অনেক কচি গলা একসঙ্গে মিলে কলকোলাহল সৃষ্টি করছে। ধড়াম করে খাটের উপর উঠে বসল বিজন, সৌরর দিকে চেয়ে বলল, "চল্, এবার যাই।

আঁচল-টাঁচল সামলে লতা বউদি ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। বললেন, "ইস্কুলের ছুটি হল, না বাড়িতে যেন ডাকাত পড়ল। রাক্ষসগুলোকে খেতে দিইগে যাই।"

রাস্তায় বেরিয়ে সৌর বিজনকে বলল, "অতগুলো বাচ্চা সব লতা বউদির ?"

বিজন বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল। কথাটা শুনতে পায় নি, জবাবও দেয় নি। সৌর আবার বলল, "এই বয়সে অতগুলো কাচ্চাবাচ্চা—লতা বউদি সামলান কী করে ?"

এবার বিজন ওর দিকে তাকাল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতেই বলল, "কার কথা বলছিস ?"

"লতা বউদির। ইস্কুল থেকে যারা ফিরে এল সবাই কি ওঁরই ছেলেমেয়ে ?"

এবার বিজন যেন কতকটা মনোযোগ দিয়ে কথাটা শুনল। মৃদু হেসে বলল, "কটি ছেলেমেয়ে তুই গুনে দেখেছিস ?"

"অন্তত গুটি দশেক তো হবে।

"না, আটটি। আর একটিও লতা বউদির নয়।"

"তবে কার ?"

"বড় বউদির।

"কই, তাঁকে তো দেখলুম না।"

বিজন এবার আরও একটু স্পষ্ট করে হাসল: "বড় বউদির আবার হবে,

সেইজন্য আজকাল বাইরের লোকের সামনে বের হন না। পাশের ঘরে ছিলেন। আমার মামাত ভাজ দুজন।

এক বউদির দু গণ্ডা বাচ্চা, আর-একজনের একটিও নেই। হবেও না।

"হতেও তো পারে। বয়স তো যায় নি।"

বিজন এবার চট করে ওর দিকে ফিরে তাকাল: "বয়স যায় নি? লতা বউদির বয়স কত তোর ধারণা?"

সৌর এবার একটু মুশকিলে পড়ল। বয়স হিসাব করার রীতি তার জানা ছিল না। বলল, "কত আর! তেইশ-চব্বিশ।"

"না। অন্তত ত্রিশ বা বত্রিশ। ওঁর বিয়েই হয়েছে বছর পনের। আমি তখন খুব ছোট।"

ওরা বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিল। ছাড়াছাড়ি হবার আগে বিজন হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল। খুব আস্তে আস্তে বলল, "ওদের বাড়িতে বিশ্রী গোলমেলে সব ব্যাপার আছে। তুই বন্ধু, তোকে বিশ্বাস করে বলছি। জানিস, একবার ওদের দুই বউই বিষ খেয়েছিল?"

সৌর চমকে বলে উঠল, "কেন?"

জিজ্ঞাসা না করলেও বিজন বুঝি বলত।

"প্রায় ছ বছর আগেকার কথা। লতা বউদি মরতে গিয়েছিল বাঁজা বলে কে ঠাট্টা করেছিল সেই দুঃখে। আর বড় বউদি লজ্জায়।"

"লজ্জা কেন?"

"সাতটি বাচ্চা তখন হয়ে গিয়েছে। বড বউদি টের পেয়েছিল, তার আবার হবে—সেই লজ্জায়, ঘেন্নায়। হাসপাতালে নিয়ে পাম্প করে ওদের পেটের আফিম বের করতে হয়েছিল। বড় বউদির সেই বাচ্চাটা বাঁচে নি। সৌর, আমার বয়স তখন সবে পনের। জীবনের অনেক কথা, অনেক রহস্যের খবর আমি তখন থেকে পেতে শুরু করলুম।"

আর বিজনের মারফত সৌরও প্রথম নতুন এক ধরনের রহস্যের খবর পেল।

বিশ্রী গরম লাগছিল সন্ধ্যায়। সৌর ঘরে ফিরে দক্ষিণের জানলা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে, অভ্যাসবশেই, চোখ দুটি ও-বাড়ির জানলায় গিয়ে ভিড়ল।

সে ছিল। যার চোখ কালো, চুল কালো, শাড়ি গভীর নীল।

একবার হাসতে চেষ্টা করল সৌর, পারল না। মনের ভিতর কোথায় যেন ভয় আছে। রুচির বাধা আছে। সেই রুচিই ওকে গায়ের জামাটাও খুলতে দিল না। পড়ার টেবিলে সৌর বসে পড়ল। বইগুলো সারে সারে সাজানো, একটাও টেনে নিতে ইচ্ছা হল না। সৌর টেনে নিল চিঠি লেখার কাগজ। এক মুহূর্ত কী ভাবল, তারপর শুরু করল লিখতে।

কী লিখল, সৌর জানে না। এ-চিঠি তার প্রথম প্রণয়ের লিপি, কাকে পৌঁছে দেবে, তাও না। তবু লিখতে ভাল লাগছিল। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। একটি একটি অক্ষর ফুটছিল কাগজে—অক্ষর নয়, তারা। কাগজ নয়, আকাশ—তারই মনের আয়না। কিংবা অক্ষর নয়, যেন মৃদু-সুরভি ফুল, এক-একটি করে তরুমূলে ঝরছিল।

প্রথম-প্রেমপত্র-লেখার সুখ-বিকারের কথা সৌর কোনদিন ভুলবে না। সেদিন দুপুরে যখন বন্ধ একটি ঘরে লতা বউদির কাছাকাছি বসে ছিল, দেখছিল তার সুন্দর সাজানো দাঁত, ভরা-ভরা মুখ, আর হাতের টিকের ছড়ানো দাগ, তখনও অস্বস্তির সঙ্গে, অনভ্যস্ততার সঙ্গে খানিকটা সুখ মিলেছিল। কিন্তু সেই সুখের স্বাদ বিচিত্র। তার সঙ্গে সন্ধ্যায় সুন্দর করে কাগজের পাতায় মনের কথা লিখে বাখার সুখের কোনও তুলনা হয় না। এ একেবারে আলাদা। এ যেন অনেকটা কাঁচা পেঁয়াজ চিবিয়ে খেয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলা। জ্বালার পরে শান্তি।

সেই শান্তি নির্বাক দুটি চোখ হয়ে ও-পাশের জানলায় স্থির হয়ে আছে, সৌর জানে।

সেই চিঠি, তারপর আর-একটি, প্রতি সন্ধ্যায়ই একটি করে, পর-পর অনেকগুলি সৌরর কাছে ওটা একটা রোজকাব কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজ, খানিকটা নেশার মতনও। রোজই সকালে উঠে সৌর প্রতিজ্ঞা করেছে, আর না, অর্থহীন সময় অপচয় আর না, অথচ সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে সেই প্রতিজ্ঞা রোজই শিথিল হয়েছে। একটি কাগজেব মনের কথা লিখে রাখার আগে কোনও কিছুতে মন বসে নি।

ঠিক চিঠি কি? কোন ডাক-বাক্স তো ছিল না, সব চিঠিই জমা হত সৌরর স্যুটকেসটার নীচে-পাতা খবরেব কাগজটার তলায়। বড একটা টিনের স্যুটকেস, সৌব কলকাতায় আসবাব সময় ওটা কিনে এনেছিল। ডালায় আঁকা ছিল বড একটা গোলাপ ফুল। তখনকাব সব টিনেব স্যুটকেসেই গোলাপ ফুল আঁকা থাকত।

সেই স্যুটকেসের তলায় একটিব পব একটি চিঠি জমা হতে লাগল। এক হিসাবে চিঠিই নয়, কেননা তাদেব লক্ষ্য যদিও ছিল একজন, তার হাতে কোনও দিনই চিঠিগুলো পৌঁছয় নি। যে লেখক সে-ই পাঠক আবাব সে-ই সংরক্ষক।

এই চিঠিগুলির প্রতি বহুদিন সৌরেশের বিশেষ একটা মমতা ছিল। লিখেই সে ক্ষান্ত ছিল না, ফিরে ফিরে পড়তও। এক সপ্তাহ পর পর, কখনও কখনও এক সপ্তাহেই বার দুয়েক পড়ত। পডতে ভাল লাগত বলেই পড়ত। বাসী খাবার টাটকার সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু তার স্বতন্ত্র একটি স্বাদ আছে।

চিঠিগুলি বিষয়বস্তুতেও যে শুধু চিঠিই ছিল, তা নয়। তাতে কুশল-জ্ঞাপন বা জিজ্ঞাসা একরকম ছিলই না। অনেক চিঠিতে সৌর হয়তো শুধু একটি দিনের হিসাব দিয়েছে, সাবা দিনেব অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে পাতাব পর পাতা ভরেছে।

সৌরেশের পরবর্তী জীবনের 'দিনান্তলিপি'র পূর্বাভাস হয়তো এই পত্রগুচ্ছই।

এই একতরফা খেলায় কেন পেয়ে বসেছিল সৌরকে? এই প্রশ্ন পরে সে

নিজেকে কয়েকবার করেছে। ঠিক সদুত্তর পায় নি। একটি কারণ এই হতে পারে যে, খেলাটা যে একতরফা, এ-ধারণা তখন ছিল না। "ও চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বলে, আমি তারই উত্তর দিচ্ছি" সৌর চিঠি লেখার এই যুক্তি দেখিয়েছে। দ্বিতীয় খেলাধুলা, বাক্‌চাতুরি—সব রকম কাজে অনিপুণ এই ছেলেটির আত্ম-প্রকাশের একটি উপায়ের প্রয়োজন ছিল। তার চেয়েও যেটা গূঢ় সত্য সেটা এই যে, ওই বয়সেই নারীসঙ্গবাসনা তার মধ্যে একটু একটু করে জমে উঠছিল।

জমে হয়তো সকলের মধ্যেই। কিন্তু অনেকেই বহির্মুখী—নানা কাজে ব্যস্ততার মধ্যে সেই অলক্ষ্য সঞ্চয়নের কথা ভুলে থাকে। সৌর যদি হত ছাত্র-ইউনিয়নের নেতা কিংবা সুগায়ক, কলেজ সোস্যালে অংশগ্রাহক দক্ষ অভিনেতা অথবা ক্লাব টীমের ফুল-ব্যাক, তবে হাজার-কাজে-ব্যস্ত শরীর আর ছড়িয়ে-পড়া মনকে একটি কেন্দ্রে লক্ষ্যীভূত করবার সে অবসরই পেত না। যার হাতে কাজ নেই, মুখের ছোট ছোট ফুসকুড়ি খোঁটার সময় সে-ই পায়। কোনও খেলায় সৌর নেই, অন্তত খেলার মাঠে নেই, বিজনেরই টানাটানিতে পড়ে কোন-কোনদিন গিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে বসতে হয়েছে দর্শকের ভিড়ে, গ্যালারিতে, যেখানে সে নিরুৎসাহ, ঝিমিয়েছে সারাক্ষণ, যথাসময়ে হাততালি দিতে বা সহর্ষ ধ্বনি করতেও ভুলেছে।

তাই একটি চিন্তাই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ছিল।

এমন একজনকে তার চাই, যে কোমল স্মিত সহৃদয়। তার কাছে যেতে চেয়েছে সৌর, তার কোলে মাথা রেখে অনর্গল কথা বলতে। সেই মেয়েটি সৌরকে বোঝে, সৌর তাকেই বোঝাতে চায়। তার কাছে কিছু লুকনো নেই, তার কাছ থেকে কিছু লুকতেও নেই। সে সৌরকে গ্রহণ করবে তার সব অপটুতা আর অক্ষমতা নিয়ে, এমন কি অপটুতা আর অক্ষমতাটুকুকে সে ভালও বাসবে। সৌর, রূপহীন দ্যুতিহীন সৌর—অন্যের কাছে যার কোন আকর্ষণ নেই, অন্তত একজনের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কী দিয়ে, সৌর জানে না। কিন্তু মূঢ় কল্পনাকে লালন করতে তো বাধা নেই। একটি কিশোরী-মানসীকে পেয়ে সৌর সেই বয়সেই বেঁচে গিয়েছিল।

অথবা পায় নি, সৌর তাকে সৃষ্টি করে নিয়েছিল। নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম একটি ওড়না সে পরম ধৈর্যের সঙ্গে বুনেছিল, ওই মেয়েটি যখন জানলায় এসে দাঁড়াল, অমনি সে মনে মনে বলে উঠল, "বাঃ, ওকে এই ওড়নাতে বেশ মানাবে।"

মেয়েটি হয়তো স্বতন্ত্র ছিল, তার আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল, কিন্তু যেই তাকে নিজের মনে-মনে-তৈরী আবরণ দিয়ে ঘিরে দিল সৌর, অমনই সে সৌররই মনের মত হয়ে গেল।

কে জানে, সৌর আজও হয়তো এক-একজনের পরিত্যক্ত সেই ওড়নাটাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। আজ একে পরায়, কাল ওকে। বিভোর হয়ে দেখে, কেমন মানিয়েছে। মানায় সকলকেই। ওই ওড়নাটা যে পরে, সে-ই তখনকার মত তার মানসী, তার প্রিয়া। আসলে মন-গড়া মিছি একটা তন্তুজালকেই ভালবাসল বলে রক্ত-মাংসের কোন মানুষকেই সৌরর ভালবাসা হল না।

অথচ তার কল্পনা রক্ত-মাংস বাদ দিয়েও ছিল না। জৈব নিয়মেই, সহজাত বোধ, কৌতূহল আর আগ্রহ থেকেই শরীরও এসেছিল। নির্বাণ-দীপ ঘরে নিঃসঙ্গ শয্যায় সৌর কল্পনায় ছায়া-বাসর রচনা করেছে। তখন ওই মেয়েটিই ছিল সঙ্গিনী। লাজুক সৌরর আচরণে বা ব্যবহারে তখন সঙ্কোচ বা সংযমের লেশমাত্র থাকত না। রোমাঞ্চিত তন্দ্রায় আর জাগরণে একটির পর একটি অস্থির-অধীর রাত্রি অতিবাহিত হত। রক্ত-মোক্ষণের পর রোগী যে-চোখে তাকায়, সেই চোখ নিয়ে অবসন্ন ভোরে সৌরর চোখ খুলত।

[বহুকাল পরে শেষ-কৈশোরের সেই স্বপ্নমোহের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে সৌরেশ তাঁর 'দিনান্তলিপি'তে লিখেছিলেন :

"মন-দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি, কত মরণে মরেছি তার হিসাব নেই, আর নূপুরের মত চরণে চরণে না বাজলেও, বাজতে চেয়েছি। এ-কথাও স্বীকার করা ভাল, মন যত দিয়েছি, তত নিতে পারি নি, হিসাবনিকাশের খাতায় দেনার দিকটাই ভারী। বন্ধকী জিনিস বার বার এক জায়গা থেকে খালাস করে এনে অন্যত্র জমা করে দিতে হল, আমার সমগ্র যৌবনের অভিজ্ঞতা তো এই, শুধু এই।

"কিন্তু শেষ-কৈশোরের অস্পষ্ট-মধুর অনুভূতিটুকু আর ফিরে পাই নি। সে-বয়সটা যেন একটা আলখাল্লা, যেই পুরনো হল অমনি তাকে পরিত্যাগ করলুম,. কিন্তু তার পকেটে, ভাঁজে ভাঁজে কত কী—যে রয়ে গেল হাতড়েও দেখলুম না, খেয়ালও করলুম না।

"যার নাম জানি না, যাকে শুধু দেখেছি, কিন্তু একটাও কথা বলার সুযোগ ঘটে নি, তাকেই নিভৃত মুহূর্তে একান্ত আপনার মনে করার মধ্যে

অবিশ্বাস্য ছেলেমানুষি আছে, আবার সরলতাও আছে। সেই সরলতা আর কোনদিন ফিরে পাব না।

"তাকে আমি কামনা করেছি, কাছে পেতে চেয়েছি, সত্য। আবার চাই নি, তাও সত্য। আগ্রহ যেমন ছিল, সঙ্কোচও তেমনই। সেই সঙ্গে ভয়। ভয়টাও একটু বিচিত্র রকমের।

"সেই সময়ে আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম। যেন একটি পল্লবিত লতা আমার জানলা দিয়ে ভিতরে এসে আমার বিছানার উপরে নুয়ে পড়েছে। আমার শ্বাস পড়ছে, তার পাতা কেঁপে উঠছে। কিন্তু যেই আমি হাত বাড়িয়ে লতাটি ছুঁতে গেলুম, অমনই সে কুঁকড়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল, সব পাতা আমার বিছানাতেই পড়ল ঝরে।

"প্রথমে অর্থ বুঝি নি। পরে বার-কয়েক একই স্বপ্ন দেখে দেখে আমার কেমন ধারণাই হয়ে গিয়েছিল, ওকে—জানলার ওই মেয়েটিকে শুধু দূর থেকেই দেখতে হয়, কাছে চাইতে নেই, আনতে নেই। যেদিনই ওকে কাছে টানব, স্পর্শ করব, সেদিনই ওকে হারাব, অন্তত ও যা ছিল তা থাকবে না, স্পর্শমাত্র হয় আড়ষ্ট হবে, নয়তো সব শ্রী খোয়াবে। তার চেয়ে আমিও থাকি, ও-ও থাকুক, দূর থাকুক, এই মোহ থাকুক।"]

কিন্তু বিজন অন্য রকমের কথা বলত।

"তুই যাকে ভালবাসা বলছিস, সেটা আসলে ভালবাসাই নয়, প্লেটনিক ব্যাপার, ক্লীবতা, কাপুরুষতা। মুখে দিলে জেলির মত গলে যায়। কিন্তু আসল প্রেম, যার মধ্যে পদার্থ আছে, তাতে দাঁতের গোড়াসুদ্ধ নড়ে যায়, বুঝলি?"

"যেমন তোর লতা বউদি?"

ইদানীং সৌরর সাহস বেড়েছিল, বিজনকে সোজাসুজি ঠাট্টা করতে মুখে আটকাত না।

আর আশ্চর্য, রাগ করত না বিজনও। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করত, সায় দিত: "হ্যাঁ, যেমন আমার লতা বউদি।" তার পরে আবহাওয়াটাই হালকা করে দিতে বলে উঠত, "কিন্তু এ-সবের মর্ম তুই বুঝবি কী করে? থাকবার মধ্যে আছে তো ওই মেয়েলী চেহারা, প্রেম-টেমের ট্রিকও কিছু শিখিস নি। তাসের ম্যাজিক জানিস? পারিস যে-টেক্কাটাকে প্যাকে রেখে ওকে ভাঁজ করতে দিলি, সেটাই ওর আঁচলের ভেতর থেকে বের করে দিতে?

পারিস না। চোখ বুজে ওকে একটা তাস ভাবতে বলে সেটাই দেখিয়ে দিয়ে পারিস না অবাক করে দিতে।"

"তুই পারিস ?"

"কিছু কিছু পারি। পেশাদারের মত না, কিন্তু মেয়েদের আসর মাত করতে পারি। তা ছাড়া হাতের চালাকিতে যদি বা ফাঁকি আছে, কবজির জোরে তো আর নেই। তার প্রমাণও ওদের দিয়েছি। তোর তো গায়েও এক ফোঁটা জোর নেই।"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি, অবহেলার সঙ্গে অনুকম্পা মেশানো। সৌর প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারত না। সত্যিই তার গায়েও তো জোর নেই। মুখের গঠনে পৌরুষ নেই। হাতের আঙুলে জাদু নেই। কিছু নেই।

না, কিছু আছে। মন আছে। যেমন ভাবতে জানে। এ-মন সকলের নেই, অন্তত বিজনের নেই। বিজন ভাবে না, ভাবতে জানেই না।

এই ভাবনার শক্তি দিয়েই সৌর লতা বউদির সঙ্গে বিজনের সম্পর্ক অনুমান করতে পেরেছিল।

লতা বউদি। এখনও চোখ বুজলে সৌরর চোখের সামনে একখানা গোল-ছাঁদের হাসি-হাসি মুখ ভেসে ওঠে। কপালে বড করে পরা একটা টিপ, মাজা-মাজা রঙ, প্রায় ময়লাই বলা চলে। নাকটা একটু চাপা, একটু মোটা, ডগা অনেকটা কড়ায়ের ডালের থ্যাবড়ানো বড়ির মত। লতা বউদির ঠোঁটও ছিল পুরু, কিন্তু টুকটুকে। মনে হত রক্তপুষ্ট দুটি জোঁক একসঙ্গে লেগে আছে। তারা আলাদা হলে দু সারি সাদা দাঁত দেখা যেত। সামনের দাঁত বড় ছিল, আর কোণের একটা ছিল ভাঙা—হাই না তুললে কিংবা শব্দ করে হেসে না উঠলে, সেটা চোখে পড়ত না।

অথচ ওই ভাঙা দাঁতটাই লতা বউদিকে শ্রী দিয়েছিল, সুন্দর করেছিল। এমনিতে মোটাসোটা ময়লা মানুষটি ; সাদাসিধে, গোলগাল, কিন্তু যেই সে হেসে উঠল, কৌতুকে ঝলসে উঠল তার চোখ দুটি, অমনি সে অপরূপ হল। তার ঠোঁট দুটি কখন ফাঁক হবে, কখন সেই ভাঙা দাঁতটা ঝলসে উঠবে, সেই আশায় সৌর কতদিন যে লতা বউদির মুখের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকেছে !

শুধু একটা দোষ ছিল লতা বউদির—পাতা কেটে চুল বাঁধতেন। ভাল করে পরিচয় হতে, সাহস বাড়তে সৌর বলেছিল, "এভাবে চুল বাঁধলে আপনাকে মোটে মানায় না কিন্তু।"

"মানায় না ? একটু সেকেলে লাগে, না ? তা কী করব ভাই, আমরা

হলাম সেকেলে মানুষ, তায় কুঞ্চিত, আমাদের খোঁপা-বাঁধা সেকেলে হবে না ?"

বলে অল্প অল্প হাসতে থাকতেন লতা বউদি, সেই দাঁতটা একবার দেখা দিয়েই লুকত, আর টিপটিপ বুকে আবার কখন দেখা যাবে সেই আশায় সৌর বসে থাকত।

লতা বউদির আরও ছোট ছোট ছবি মনে আছে। রেগে গেলে মোটা নাকের ডগা আরও স্ফীত হত, দপদপ করত চোখের পাতা, আর লতা বউদি তখন বিশ্রী-রকম জোরে জোরে নিশ্বাস নিতেন।

আর কাঁদলে ? লতা বউদিকে কাঁদতেও দেখেছে বই কি সৌর, কিন্তু বেশীবার না। লতা বউদি হাসতেনই বেশী। ওই দাঁতটা বেরিয়ে পড়লে তাঁকে সুন্দর দেখায়, এ কথা কি তিনিও জানতেন ?

হাসতেন লতা বউদি, মাঝে মাঝে হাত প্রসারিত করে কবজির সঙ্গে সেঁটে-থাকা চুড়িগুলোকে খুলতে চাইতেন। লাগত, নিজে টানতে গিয়ে নিজেই বলে উঠতেন, "উঃ !"

সৌর বলত, "খুলবে না বউদি, চুড়িগুলো ছোট হয়ে গিয়েছে।"

"ছোট হয়ে গিয়েছে ?" লতা বউদি আবার হাসতেন, চুড়ি তো ছোট হয় নি ভাই, আমিই ক্রমে আরও থপথপে মোটা হয়ে পড়ছি। রোজই এই শরীরটায় কমসে কম আধ পোটাক বাড়তি মাংস আর চর্বি তো জমছে !"

অনেকটা নির্বোধের মত, অনেকটা একটা কিছু বলতে হয় বলেই সৌর বলল, "জমছে কেন ?"

"কেন আবার—বয়স হচ্ছে না ? তা ছাড়া ভয় নেই, ভাবনা নেই।" গোল গোল হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন লতা বউদি, বলতেন, "ভাবনা নেই, আর খরচও নেই।"

শেষের দিকে একটু খেদ যেন বাজত লতা বউদির স্বরে। খরচ নেই কথাটা কী অর্থে বলতেন, সৌর বুঝতে পারে নি। লতা বউদির ছেলেপুলে নেই, কথাটার মানে কি তাই ?

হয়তো তাই। আর লতা বউদি যে বলতেন, তাঁর ভয় নেই, সে-কথাটাও ঠিক। ভয় তাঁর একফোঁটা ছিল না, অন্তত তাঁর স্বামীর বিষয়ে ছিল না।

লতা বউদির স্বামী শচীপতি রায়ের সঙ্গেও সৌরর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল।

খুব ফরসা, মাথার সামনের দিকটায় ছড়ানো টাক, নীলচে চোখ, রোগা ধরনের এই ভীতু মানুষটিকে সৌর খুব কাছে থেকে জানবার সুযোগ পেয়েছিল। সব সময়েই কেমন একটা ত্রস্ত ভাব, শচীপতিবাবুর কথাগুলিও কেমন জড়িয়ে যেত। কারুর মুখোমুখি পড়লেই কুণ্ঠিত, আনত হয়ে পড়তেন, সরে যেতে চাইতেন।

মনে হত, শচীপতিবাবু যেন ফেরারী আসামী, সব সময়েই পালাতে চাইছেন। কোথা থেকে পালাতে চাইতেন শচীপতিবাবু? সংসারের কাছ থেকে? লতা বউদির কাছ থেকে? নিজের কাছে নিজেই যেন জুজুর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতেন।

সব সময়ে না। মাঝে মাঝে নেশা করতেন শচীপতি। তখন তাঁর চোখ জ্বলত, সাহস বাড়ত, গলার নালী থেকে থেকে ফুলে উঠত, রক্তের ছোপ ধরত এমনিতেই টকটকে ফরসা গালে।

তখন শচীপতির মুখ খুলে যেত। অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন।

অন্তত সৌরকে একদিন বলেছিলেন। সৌরর একদিন তার প্রতিটি কথা মুখস্থ ছিল। এখনও কিছু আছে।

সেদিন দরজা খুলে দিয়েছিলেন শচীপতি। খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে দেন নি। অনেকক্ষণ নির্নিমেষ চোখে সৌরর দিকে চেয়েছিলেন। পাকা জহুরী যেন যাচাই করে নেবে, মালটা সোনা না পিতল, সাচ্চা না ঝুটো। সেই দৃষ্টিতে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবও ছিল। পরে আশ মিটিয়ে দেখা সারা হলে হাতটা নাড়ু দেবার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শচীপতি বলে উঠলেন, "নেই।"

"নেই ?" সৌরর গলায় প্রশ্নটা প্রতিধ্বনির মত বেজে উঠল।

শচীপতি আবার বললেন, "নেই।"

তিনবার চৌকাঠের সামনে একটা শব্দই উচ্চারিত হল, যে শব্দটা প্রশ্ন, সেই শব্দই উত্তর। একবার, মাত্র একবারই, সৌরর গা ছমছম করে উঠেছিল, মনে হয়েছিল, কোন গুপ্তচক্রের সাঙ্কেতিক ভাষায় সে পাঠ নিচ্ছে।

একটু পরে অবশ্য আড়ষ্ট ভাবটা আর ছিল না। শচীপতি ওকে ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়েছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে, সেটা শনিবারের কোন বিকাল। হঠাৎ কী কারণে যেন ছুটি হয়ে গেল। হুড়মুড় করে সকলে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সৌর ভাবছিল, এর পরে কী! বিজনের দিকে চেয়ে মনে হল, সে-ও একই কথা ভাবছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল, আকাশে মেঘ ছিল। তবে হেমন্তের মেঘ, সব ময়লা ধুয়ে নিংড়ে কাচা কাপড়ের মত ধোপদুরস্ত।

"কোথায় যাবি ?" সৌর একবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল।

বিজন অন্যমনস্ক ছিল, বলল, "কোথাও না।"

"সিনেমায় ?"

"না। সব বাজে ছবি।

সৌর বুঝল, বিজনের ইচ্ছে নেই, তবু একটা ইংরিজী ছবির নাম করল।

বিজন হাই তুলে বলল, "দুরে! ট্র্যাশ—ট্র্যাশ একেবারে। ছবিটার আমি ট্রেলার দেখেছি। কোন থ্রিল নেই, খালি ক্যাচ-ক্যাচে কান্না, আর হা-হুতাশ।

সৌর বলল, "ও!" তার খারাপ লাগছিল। এই মেঘলা দুপুর আর জুড়নো রোদ, এর সঙ্গে মন খারাপ হয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম একটা সম্পর্ক আছে। কাটা ফলওয়ালার ডালার টকটকে বাতাবি নেবু আর ফিকে সবুজ শসার ফালির চারপাশে মাছি উড়ছিল, আর যার গলায় ঝোলানো কাচের বাক্সে গোলাপী রঙের লাড্ডু আছে, সেই পশ্চিমী ফিরিওয়ালা শোকগাথীতের সুরে খদ্দের ডাকছিল। ওই ফোলা-ফোলা লাড্ডুগুলো হাওয়ায় মিইয়ে যায়, মুখে দিলে আঁশ-আঁশ তুলোর মত লাগে, কিন্তু গলে যায়, জিভ রাঙা হয়ে একটুখানি মিষ্টতার স্বাদ ধরে রাখে। একটা ছাগল কোথা থেকে ছাড়া পেয়ে ডাস্টবিনের পাশের কলা-পাতায় মুখ দিয়েছে, তার বাঁটগুলি থলথলে, ভরা-ভরা, তার গলায় ঘণ্টি বাজছে।

সৌর দেখছিল, যত দেখছিল, ততই তার মন খারাপ লাগছিল। পরিণত বয়সে মন খারাপ হলে লোকে তাকে নিজের ভিতরে লুকিয়ে রাখে, একা হতে চায়। কিন্তু তখন মনে হত, অন্য কাউকে আমার অনুভূতির ভাগ দিই। আমি পেয়ালায় চুমুক দিই, পাশে বসে সেও প্লেটে ঢেলে ঢেলে খাক। আড়চোখে বিজনের দিকে চেয়ে সৌর বুঝতে পারছিল, সে-লোক বিজন নয়। ওকে কিছু ঢেলে দেওয়া চলবে না।

তবু, কী করি, এই দুপুরটা নিয়ে কী করি! সৌর অস্থির হয়ে উঠছিল। আকাশের দিকে চাইছিল, ওই সাদা পুরু মেঘটা কেটে গিয়ে নিষ্পাপ-নীল আকাশের একফালিও দেখা যায় কি না, সেই আশায়। দেখতে পেলেই যেন সে মনস্থির করে ফেলতে পারবে। হঠাৎ-পাওয়া ছুটিটা হঠাৎ-পাওয়া কিছু খুচরো পয়সার মত ভারী হয়ে ঝুলছে, তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলতে না পারলে সৌরর স্বস্তি নেই।

বিজন হঠাৎ বলল, "চলি।" বলেই পা বাড়াল।

"কোথায় যাবি?"

"আমার ভাইয়ের অসুখ। তাকে একবার বিকেলের দিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।" বিজন কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, ওর ব্যস্ততা স্পষ্ট, যেন দৌড়চ্ছে, যেন পালাচ্ছে।

সৌর বুঝতে পেরেছিল, বিজন মিথ্যে কথা বলছে। সৌর বিজনকে ঢোক গিলতে দেখেছিল।

লক্ষ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর (বৈঠকখানা রোড ধরে বউবাজার, বউবাজার থেকে শেয়ালদা ; সৌর অনেক লোকাল গাড়ির ছাড়া আর পৌঁছনো দেখল। শেয়ালদা থেকে কলেজ স্ট্রীট, ফুটপাথে ছড়ানো পুরনো বই ঘাঁটাঘাঁটি করে, অনেক ট্রামের টিকিতে ফসফস করে আগুন-জ্বলানেবা দেখতে দেখতে) সৌর অবশেষে অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে, অনিবার্যভাবে লতা বউদিদের বাসার দরজায় নিজেকে দেখতে পেল। সেদিনে আকাশের মেঘ আর ঠাণ্ডা হাওয়া নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু আগেই সন্ধ্যাকে ডেকে এনেছে।

শচীপতি বলছিলেন, "বোস ব্রাদার।"

ঘরের ভিতর দিয়ে ওরা ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। সেখানে গোল একটি টেবিলের সামনে একটিমাত্র চেয়ার ; আর একটা শচীপতি নিজেই যেন কোথা থেকে টেনে আনলেন।

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সৌর দেখছিল।

সিমেণ্টে-গাঁথা রেলিং, কিন্তু এখানে ওখানে আস্তর খসেছে, টবে-রাখা, জল-না-পাওয়া উপোসী একটা পামগাছ কবে মরে গিয়েছে। সৌর নুয়ে পড়ে টব থেকে শক্ত পাথুরে মাটির একটা ডেলা তুলে নিয়েছিল, আঙুলের চাপে তাকে ফের ঝুরঝুরে ধুলো করে ফেলছিল। আর মনে মনে বিজনকে বলছিল, "মিথ্যুক, মিথ্যুক।"

শচীপতি হাসছিলেন। ফরসা মুখে কপালের পাশের শিরাগুলো আরও নীল হয়ে ফুটে উঠছিল, রেখাগুলি কখনও মুখে গভীর চিহ্ন আঁকছিল, কখনও মসৃণভাবে মুছে যাচ্ছিল। ছোট ছোট দুটি কাচের গুলি শচীপতির চোখে থেকে থেকে ঝলসে উঠছে। মানুষের চোখের মণি এত নীল হয়? সামনের দিকের চুল উঠে যাচ্ছে, সেটা ঢাকতেই শচীপতি এত লম্বা চুল রেখেছিলেন কি না কে জানে!

"তুমি হেরে গেছ।" শচীপতি বললেন সৌরকে।

সৌর বলতে গেল 'কিসে?' কিন্তু স্বর ফুটল না, শুধু মূঢ় জিজ্ঞাসাটাই মুখে ফুটে রইল।

"তুমি হেরে গেছ," শচীপতি বললেন আবার, "বিজন এই খানিক আগে এসে লতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।"

"কতক্ষণ আগে?"

হাতঘড়িতে সময় দেখে শচীপতি বললেন, "ঠিক আধ ঘণ্টা আগে। কেন, বিজন তোমাকে বলে আসে নি?"

শচীপতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন, শচীপতির নীল চোখ জলছিল। "বুঝেছি," শচীপতি একটু পরে বললেন আস্তে আস্তে, "ও তোমাকে না বলে এখানে এসেছে। আর তুমিও ওকে বলে আস নি। দুজনেই দুজনকে লুকতে চেয়েছ।"

শচীপতি মৃদু হাসছিলেন। একটা পরমাশ্চর্য মমতা ওঁর চোখ দুটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

সৌরের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, মাথা নিচু করে সে জিভ বুলিয়ে থরথর ঠোঁট দুটিকে সাহস দিচ্ছিল। হঠাৎ কোথায় একটা বিড়াল ডেকে উঠল, সৌরের মনে হল তার চেয়ারের পায়ার ঠিক নীচেই। আড়ষ্ট হয়ে সে তাড়াতাড়ি পা তুলে বসল। চেয়ে দেখে, শচীপতি নেই। হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

একটু পরে ফিরে এলেন শচীপতি, হাতে একটি বোতল আর দুটি গ্লাস। ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "ভয় পেয়ো না ব্রাদার, মুষড়ে পোড় না। এক রাউণ্ড হেরেছ, পরের রাউণ্ডে জিতবে, না হয় তার পরের রাউণ্ডে।"

সৌর বুঝতে পারছিল না, শচীপতির বক্তব্য কী! দুটি গ্লাস, একটি বোতল আর গাঢ় একটি কণ্ঠস্বর ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছোট ছোট বিজলী-তরঙ্গ হয়ে আঘাত করছিল।

"কোন-না-কোন রাউণ্ডে তুমি জিতবেই, পরে হয়তো আবার হারবে। এ-খেলায় যেটা সুবিধা, অসুবিধাও সেটাই। কোন ফাইন্যাল রাউণ্ড নেই।"

সৌর শচীপতিকে বলতে শুনছিল, অথবা শচীপতি বলছিলেন না, শুধু সৌরই শুনছিল, শচীপতি একবারই উচ্চারণ করেছিলেন কথা কয়টি, উচ্চারণমাত্র তারা অনন্তের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে গেল, একটি ডিস্ক্ নিরন্তর ঘুরে ঘুরে পিনের ছোঁয়া পেয়ে বাজতে থাকল,—"এ খেলার শুরু আছে, শেষ নেই। যাকে শেষ বলে ভাবছ, তার পরে ফের শুরু আছে।"

রেকর্ডটা আবার বাজছে সৌরর কানের কাছেই, কানের ভিতরেই, মগজে; অথবা কবিরা যা বলেন, সেইখানে—মরমে। বার বার শুনে শুনে সৌর ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তার কান গরম হল, কথা কয়টি আর স্পষ্ট, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রইল না, এক হয়ে গেল। তখন এক ঝাঁক ঝিঁঝিপোকার ডাকই শুধু থেকে গেল।

সৌর ভয় পেয়েছিল। ঠিক কেন, মনে নেই। ঠিক কাকে, জানে না। আপাত বিচারে মনে হতে পারত, শচীপতিকে। কিন্তু আসলে শচীপতিকে নয়, ওই আধ-অন্ধকার বারান্দা, বোতল, গ্লাস, থমথমে কণ্ঠস্বর, শীর্ণ-দীর্ঘ শচীপতির বসবার ভঙ্গি, তাঁর মাথার টাকটাকে এখন আর চেনা যায় না, কেননা আঙুল চালিয়ে চালিয়ে পিছনের চুলগুলো তিনি কপালের সামনে নিয়ে এসেছেন—এরাই কিলবিল করে যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র একটি সত্তা হয়ে উঠেছিল, সৌর ভয় পেয়েছিল তাকে। সে স্পষ্টই অনুভব করছিল, এখানে শচীপতি ছাড়াও অন্য একজনের উপস্থিতি আছে, সে আদিতে হয়তো শচীপতির ভিতরেরই ছিল, কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হয়ে শচীপতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, শচীপতিকেও আচ্ছন্ন করেছে। চোখে তুলে সৌর সেই আমৃত্তিকা-গগনবিস্তৃত ধূমল অবয়বের অবধি দেখতে পেল না।

সৌর ভয় পেল। এই ভয়টা নিরাকার, বায়বীয় নয়, কঠিন এবং স্পর্শসহ। সৌর তার অগ্রদূত আঙুলগুলিও দেখতে পাচ্ছে। কী করবে সে এবার—ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরবে, নাকি ওকে তুলে ধরে পলকে ছুঁড়ে দেবে মহাশূন্যে, এখনও যে আদিম ভয়ে তারায় তারায় রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

এই ভয়টা যে স্নায়ুবিকার, দুর্বল মস্তিষ্কের কল্পনা, বহু পরে ডাক্তারদের মুখে বার বার শুনেও সৌর বিশ্বাস করে নি। দুর্বল কল্পনার সন্তান কি এত প্রবল, এত পরাক্রান্ত হয়? স্রষ্টা নিজে সৃষ্টির করতলগত কীটের মত অসহায় হয়ে পড়ে?

সৌর সেদিন মূর্ছিত হয় নি, হলে দেখতে পেত না শচীপতি তার মুখের কাছে গ্লাস ধরেছেন, তাঁর গলাও শুনতে পেত না। শচীপতি বলছিলেন, "খাও, খেয়ে ফেল, সাহস পাবে।"

সৌর দ্বিরুক্তি করে নি, রোগশয্যায় শুয়ে জ্বরের বিকারে ঢক ঢক করে ওষুধ গেলার অভ্যাস তো ছিলই, সেইভাবেই পরম তৃষ্ণার্তের মত গ্লাসের তরল আগুন গলায় ঢেলেছে। বিস্বাদ লেগেছিল লাগুক, ওষুধও তো বিস্বাদ লাগে। গলা জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল জ্বলুক, সেই মহাকায় ভয়ের মায়াশরীরটা তো নিমেষে চোখের সমুখ থেকে মুছে গিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে সৌর অস্ফুট গলায় বলল, "আর-একটু।"

শচীপতি ওর গ্লাসে আরও একটু ঢেলে দিলেন।

সৌর আর ভয় পায় নি।

যে অনুভূতিটা তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে সাকার, বিস্তৃত, দৃষ্টি-স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল, সে পলকে অন্তর্হিত হয়েছে। তার সমুখে যে-লোকটি গ্লাস হাতে করে তাকেই লক্ষ্য করছে, এতক্ষণে সৌর যেন তাকে চিনতে পেরেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে এই লোকটাও কিছু আগে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যেই চোখ থেকে কালো কাজল মুছে গেল, অমনিই লোকটাকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিনতে পেরেছে; ওই তো শচীপতি, লতা বউদির স্বামী। মধ্যবয়স্ক শীর্ণ ভদ্রলোক, যিনি স্ত্রীর ভালবাসা পান নি, অথবা পেয়েও হারিয়েছেন। এখন ঈষৎ-পীত পানীয়ের মুকুরে নিজের বঞ্চিত মুখবিম্ব দেখছেন। অকিঞ্চিৎকর, রুগ্ন, সামান্য।

পায়ের কাছে একটা বিড়াল ডাকছিল, সৌর তাকেও ভয় পেল না, ত্রস্তে পা তুলে নিল না। একেও সে চিনে নিয়েছে। নিরীহ সহিষ্ণু একটি পোষা জীব, যে পাতের কাছে থেকে শুধু প্রসাদ চায়। এখন সৌরব জুতোর ঠোকর খেয়ে টেবিলের উপর বসেছে, লেজ নাড়ছে, যদিও ওর চোখের মণি এই অন্ধকারে চকচকে এবং বিস্ফারিত, তবু ওর কণ্ঠস্বরই ধরিয়ে দিচ্ছে, ও কী ভীরু, নিরুপায়, অকৃতার্থ!

ওই বিড়ালটা মাঝে মাঝে শচীপতির মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত অতএব বিকৃত চিন্তাপ্রয়াস নিয়ে সৌর বুঝতে পারছিল, বিড়ালটা আলাদা কিছু নয়, শচীপতিরই সত্তার একাংশ। শচীপতির ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে, আবার লীন হবে শচীপতিতেই। ওর নখ হয়তো কোনদিন ছিল, এখন ক্ষয়ে গিয়ে থপথপে নরম থাবার মধ্যে লুকিয়েছে, আর কখনও দেখা যাবে না. শুধু ওর চোখে এই অন্ধকারে ফসফরাসের মত সবুজ হিংসা, অক্ষম খানিকটা ক্ষোভ জ্বলবে।

"আমার একদিন নখ ছিল," শচীপতি বলেছিলেন, "ঘন বাবরি চুল ছিল, আমি রাগলেতো রোঁয়ার মত ফুলে উঠত। ওরা আমাকে ভয় করত, তুমি জান না। বাড়িসুদ্ধ সবাই ভয় করত। নতুন চাকরি, নতুন বয়স, আমার পায়ের ভরে বাড়িটা কাঁপত। জুতোর নীচে শক্ত নাল পরিয়ে নিয়েছিলাম, চলতে ফিরতে ঠকঠক শব্দ হত, মেঝের সিমেন্টের ছাল উঠত। আমার সে রূপ তোমরা দেখ নি। হাত দুখানা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করলে বাইসেপ সাপুড়ের বাঁশীর মত ফুলে উঠত।

"ফুলশয্যার রাত্রে কী করেছিলাম জান? না না, আদর-টাদর নয়।

একটি একটি করে ফুলের পাপড়ি ফোটানো নয়, ও-সব ধৈর্যই আমার ধাতে নেই, ঘোমটা খোলানোর জন্যে সাধ্য-সাধনার দরকার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি নে। আমি জানি, গোড়া ধরে নাড়া দেব, সব পাতা পাপড়ি কুঁড়ি ফুল আপনা থেকেই ঝরে পড়বে।

"লতাকে কোলে তুলে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। আর-একটু হলে সীলিংয়ের পাখায় ঠেকত। লতা যখন নীচে পড়ছিল, তখন ওকে আমি লুফে নিলুম। লতা মূর্ছিত হয়ে আমার কোলেই পড়েছিল।

"আমাদের বাসর এইভাবেই শুরু।

"এ-রকম ঘটনা আর কদিন আর কতবার ঘটেছিল, তোমাকে বলব না, শুধু জেনে রাখ, লতা আমাকে ভয় করত। আমার হাতের মুঠোয় এতটুকু হয়ে যেত। সম্পূর্ণভাবে আমার বশ হয়েছিল। তার ভঙ্গিটাই ছিল বাধ্যতার, আত্মসমর্পণের, হয়তো তার সবটাই ভয়। কিন্তু ভয়কেই আমি ভালবাসা বলে ধরে নিয়েছিলাম।

"আমি ওকে যন্ত্রণা দিতাম, বেদনায় ও বিবর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু কখনও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যায় নি, চায় নি। সকালে রোজই এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে আমার বিছানার পাশে ফিরে এসেছে। তখন তার মুখে অল্প অল্প হাসি। দৈহিক যন্ত্রণা কখন যেন অসহ সুখে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

"সেই সুখকে প্রথমে বিরাগ, পরে অনাসক্তি, ক্রমে করুণায় পরিণত হতেও আমিই দেখেছি। করুণা আবার ঘৃণা হয়েও ওর মুখে ফুটেছে: তাও সয়েছি।"

ফিস ফিস করে সৌর জিজ্ঞাসা করল, "কী করে?"

এক হাত তুলে শচীপতি বরাভয় দিলেন। অন্য হাতে গ্লাসটাকে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলেন।—"বলব, বলব, সবই বলব। রোস। তার আগে একটু সাহস সঞ্চয় করে নিই। তুমিও শোনবার জন্যে নিজেকে তৈরী কর।"

সৌরর শূন্য গ্লাস শচীপতি ফের ভরে দিলেন।

সৌরর ভয় তখন ছোট্ট দুটি বিস্ময়ের বিন্দু হয়ে তার চোখের মণিতে জ্বলছিল, ঔৎসুক্য হাতের টলমল গ্লাসে পানীয়ের মত কাঁপছিল।

প্রাজ্ঞ আত্মস্থ, স্থিতধী ইত্যাদি বিশেষণ শুনলেই বহুদিন অবধি সৌরর মনে একটি ছবি ভেসে উঠত—শচীপতির। অন্তত তাঁরই মধ্যে সৌর সর্বপ্রথম এই সব গুণের সমাবেশ দেখেছিল। যেমন মোহিতদার মধ্যে প্রথম নমুনা দেখেছিল প্রাণোচ্ছল যৌবনের, যা বস্তুতেই সুখ খোঁজে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের তৃপ্তিতেই যার চরিতার্থতা এবং তুষ্টি। বিজনের মধ্যে সৌর পেয়েছিল তারুণ্য, অংশত যা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, সম্ভবত অগভীর, সুতরাং উদ্দাম।

শচীপতির মধ্যে পেল স্থিরতার, যা অনেক টাল সামলে ভারসাম্য পেয়েছে।

প্রথম যৌবনে শচীপতির ব্যক্তিত্ব ছিল, এ-কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেই রূপ সৌর প্রত্যক্ষ করে নি, বর্ণনা থেকে যতটা সম্ভব ধরে নিয়েছে। সেই প্রথম জীবনের পরাক্রান্ত, আসুর-শক্তি মানুষটির কতটুকু ছাপ আছে এই ভেঙে-পড়া দেহটির মধ্যে? একটু হয়তো আছে নীল চোখে, যা এখনও মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে, নিবে যায়, তাকে আবার জ্বালিয়ে তুলতে পানপাত্রে ফের চুমুক দিতে হয়। পানীয়ই শচীপতির জীবনের বিকাল-বেলায় সাহস-সলতের তেল।

এই মানুষটি সৌরকে অভিভূত করেছিল।

সৌর সেদিন মোহিত হয়ে তাঁকে দেখছিল, কেবলই দেখছিল। শচীপতি তাকে বলেছিলেন, "যতক্ষণ আমার মধুপান সারা না হয়, মূঢ়, ততক্ষণ অপেক্ষা কর।" ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন শচীপতি, তাঁর হাত কাঁপছিল, চোখের পলক পড়ছিল।

আর যান্ত্রিকভাবে সৌর নিজেও তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে গিয়েছে। গলা জ্বলেছে, জিভে বিশ্রী ঠেকেছে, কণ্ঠনালীতে দাহজ্বালা অনুভব করেছে, কিন্তু তবু গ্লাসটা সরিয়ে রাখতে পারে নি। আসলে সে যে গর্হিত কিছু করছে, এই খেয়ালটাই সৌরর তখন ছিল না। একটা অপ্রাপ্তবয়সী কিশোরের মদ্যপানের

অভিজ্ঞতা, নিষিদ্ধ পানীয়ের স্বাদগ্রহণের পাঠ যেন অগোচরে, স্বপ্নাবেশে ঘটে গেল।

কেননা, সৌর আর-কিছু ভাবছিল না, ভাববার ক্ষমতাই তার ছিল না, সৌর দেখছিল, কেবল দেখছিল।

কাকে? যেন ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ প্রান্তরে একটি বিধ্বস্ত মূর্তিকে, যিনি একদা একদা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

"আমার সন্তানহীনতাই আমাকে জীর্ণ করেছে," শচীপতি ধীর-গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করেছেন, "নিষ্ফলতাই আমাকে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।"

সৌর মূঢ় চোখে তাকিয়ে ছিল। দৃষ্টি যথাসম্ভব একাগ্র উৎসুক করে; যেন শুধু শ্রবণ দিয়ে শচীপতির কথার পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়গত করা যাবে না, চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়েও অনেকখানি আহরণ করতে হবে।

তবু শচীপতি কী বলছিলেন, সৌর বিশেষ বুঝতে পারছিল না, তাকে মাঝখানে রেখে কতকগুলো তীর ইতস্তত ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

একবার সৌর বুঝি প্রশ্ন করে বসল, "আপনি নিজেই যে দায়ী, কী করে বুঝলেন?" নিজের কণ্ঠস্বর সৌরর নিজের কানেই অপরিচিত শোনাল।

"আমি জানি," শচীপতি বললেন ভগ্নস্বরে, "তবে জানতে আমার—আমাদের—অনেক দিন লেগেছে।"

সৌরর মুখের ওপর শচীপতির মুখের ছায়া পড়েছিল। শচীপতি বললেন, "তুমি এবার প্রশ্ন করবে, দেরি হল কেন? তোমার বয়স কম, তবু জন্মরহস্যের যেটুকু জেনেছ, তাই দিয়েই বুঝতে পারবে, এসব জিনিস আবিষ্কার করতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু আমাদের লেগেছিল। প্রথম দিকে সন্তান চাই নি তো, তাই সতর্ক থাকতাম। এইভাবে প্রায় দু বছর কাটল।"

সৌর বলল, "তারপর?"

"তারপর প্রথমে ওর মনে ইচ্ছেটা এল। অথবা বলতে পারি যে ইচ্ছেটা দীঘির তলায় ঘুমিয়ে ছিল, সেটা ওপরে ভেসে উঠল। আমি তখনও বুঝি নি, তখনও কিছু দেখতে পাই নি। সেই ইচ্ছেটা ক্রমে ওর মুখে, পরে নানা আচরণে ফুটে উঠল, স্পষ্ট হল। আমি তখন তাকে দেখলাম, চিনতে পারলাম। একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সত্যিই চাও? আমার বুকের মধ্যে রাখা ওর মুখ একবার যেন নড়ে উঠল। কথায় ও বলতে পারল না, ইঙ্গিতে

জানিয়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম, ও চায়, সত্যিই চায়। মৌনই সম্মতি। ওর ঠোঁটে হাত রাখলাম, কপালে চোখে, বুকে, গালে। সর্বত্র ওর ইচ্ছেটা যেন কাঁপছিল। সেই ইচ্ছেটাকে আমি স্পর্শ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেটা আমারও হল; আমার দেহে মনে সঞ্চারিত হল। আমরা তখন থেকেই চাইতে থাকলাম। কিন্তু যাকে ডাকলাম সে এল না। কেউ এল না। কে-উ না।"

শচীপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নিঃশেষিতপ্রায় গ্লাসটাকে আবার তুলে নিলেন হাতে: "একদিন যা ছিল স্বস্তির, পরে তাই-ই অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে একদিন টের পেলাম, যে ইচ্ছেটাকে প্রয়াসের পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে সত্য করে তুলতে চাইছি সে কোনদিনই সার্থক হবে না। বোবা অক্ষমতা আমাকে অস্থির করে তুলল। অনুভব করলাম, সতর্কতার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। দস্যুর ভয়ে দেয়াল তুলে অন্ধকারে যে বাস করে সে যেদিন টের পায়, বৃথাই সে প্রাচীর তুলেছে, দস্যু কোথাও নেই, কোনদিন ছিল না, কোনদিন আসবে না তখন তার মনের শূন্যতা অনুভব করতে পার? ব্যর্থতাবোধও আমাকে ছেয়ে ফেলল। বুঝলাম ত্রুটি আমারই ভেতরে কোথাও আছে।"

"ত্রুটি যে আপনারই কী করে টের পেলেন?" সৌর জিজ্ঞাসা করল, "ত্রুটি তো লতা বউদিরও হতে পারে।"

"না, তার নয়।" শচীপতি ধীরে ধীরে বললেন, "আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা করিয়েছিলাম, জেনেছিলাম, নিষ্ফল আমি নিজেই।"

সৌর বলল, "ও।" অনেকক্ষণ কোনও কথা হল না। সূক্ষ্ম বা স্থূল, কোনরকম বিচারশক্তিই তখন তার অবশিষ্ট ছিল না, তবু সামান্য একটু ধন্দ থেকেই গিয়েছিল। শুধু মাত্র সন্তানহীনতাই কি একটা মানুষকে একেবারে ব্যর্থ করে দিতে পারে? বিশ্বাস হয় না।

এই অবিশ্বাসের ছাপ শচীপতি ওর মুখে লক্ষ্য করে থাকবেন। বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, সবটা তোমাকে খোলাখুলি বুঝিয়ে বলতে পারছি না। তা ছাড়া, নেশা কেটে এসেছে কিনা, আমারও বলতে বাধছে। একটু বসো।"

আবার সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেছেন শচীপতিবাবু। তন্ময় সৌর শুনেছে।

শুনেছে, নিষ্ফলতাবোধ কী করে একটি দাম্পত্য-সম্পর্ককেই মিথ্যা করে দিল।

অনেক কাটাকুটির পর, অনেক আবরণে মুড়ে সৌরেশ 'দিনান্তলিপি'তে বহু দিন পরে শচীপতির জীবনের আসল ট্র্যাজিডির কথা লিখতে পেরেছিলেন। কেননা, বৃত্তান্তটা কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নয়, জৈব রীতিগত, যদিও তার মূল হয়তো মনে।

'দিনান্তলিপি'র পুরনো পৃষ্ঠায় সে ইতিহাস সৌরেশের নিজস্ব ভাষায় অনেকটাই ইশারায় লেখা আছে।

যে-মিলনে ফল নেই, ফলবার আশাও না, সে মিলনে বিতৃষ্ণা এসেছিল, শচীপতি বলেছিলেন। জীবন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল অক্ষমতায়। তাঁর অকাল-জড়তা শচীপতি প্রথম যেদিন টের পেলেন, সেদিন চমকে উঠেছিলেন। এ তো তিনি চান নি। প্রথমে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সত্য পাথরের মত, ফুঁ দিয়ে তাকে নড়ানো যায় না। শচীপতি দিন কতক পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। একবার আত্মহত্যাও করতে যান। সফল হন নি। সেই ব্যর্থতা তাঁকে আরও অস্থির করে তুলেছিল। কেননা শচীপতি বুঝেছিলেন, শুধু দেহের নয়, মনের জোরও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, আত্মহত্যা করবার ক্ষমতাটুকু তাঁর নেই। আসলে শচীপতি তাঁর আত্মাকে তো হত্যা করতে চান নি—আত্মা তো অমর, মৃত্যুর পর দেবলোকে, প্রেতলোকে বা শূন্যে বায়ুভূত হয়ে থাকে—তিনি বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন তাঁর অপটু শরীরটাকেই। প্রাণের ভারবাহী এই ব্যঙ্গটা একেবারে শেষ হয়ে যাক। হয় নি। অকর্মণ্য খোলসটাকে ঝেড়ে ফেলে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার সাধ শচীপতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

সে-দিন নিজের ভবিষ্যৎ নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন শচীপতি। ভেঙে মুচড়ে শুকিয়ে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন এত কাল যে পৃথিবীতে মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটেছেন, সেখানেই বাকী দিনগুলি

হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে। কিন্তু শরীরটাই তো শুধু ভেঙেছিল, সেই সঙ্গে তেজী মনটা কোথায় গেল?

যে বাড়িতে একদা অত্যাচারী শাসকের ভূমিকা ছিল তাঁর, সেই বাড়িতেই তিনি নিজের জন্যে কুণ্ঠিত একটি কোণ বেছে নিয়েছিলেন। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে থাকতেন, অফিস ছিল, সুতরাং একবার বের হতেই হত, ফিরে এসে আবার সেই কোণটাতেই জড়সড় হয়ে বসতেন। কারও দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতেন না, বিশেষ করে লতা বউদির দিকে তো নয়ই।

তাকে শচীপতি পরিহার করেই চলতেন।

এইভাবেই কাটল বছর দুই। অবশেষে শচীপতি একদিন হঠাৎ অনুভব করলেন, এরও কোন মানে নেই। এই ক্লীব অস্তিত্বের ভার তাঁকে যেন আরও জীর্ণ করে ফেলছে। একে সরাসরি, সামনাসামনি অস্বীকার করাও যাবে না, বরং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।

সে পথও খুঁজে পেলেন।

যে জীবনকে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করা তাঁর আর সাধ্যায়ত্ত নয়, তাকে অন্যভাবে যাপন করার উপায় আবিষ্কার করলেন। উপায়টা বিস্মৃতির, উত্তেজনার, সব খেদ ডুবিয়ে রাখার।

মদে ডোবার। শচীপতি বলেছিলেন, 'জানতাম, আমি বাঁকচোরা কোন কোন পথেই কিংবা নিরন্তর ডুব-সাঁতার কেটেও পুরনো ঘাটে ফিরতে পারব না, কিন্তু খানিকটা মজা তো পাব। কেঁচোর মত বেঁচে থাকাতে যে কিছুই নেই! রাজত্ব হারিয়েও নকল রাজা সেজে থাকা যায়। জমকালো সাজপোশাকটা না হারালেই হল।'

সৌর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আর?' যে জবাব পেয়েছিল, সেটা তার পরবর্তী কালের স্মৃতিনির্ভর 'দিনান্তলিপি'তে লেখা আছে।

মদ ধরে শচীপতি দেখলেন, দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীর রঙ আবার যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। সবই ছিল বিবর্ণ ধূসর, তাতে লাল হলদে নীলের ছোপ নতুন করে লাগল। আবার আকাশের পাখি চোখে পড়ল শচীপতির, পার্কের রেলিংয়ের কোণের বেগনী ফুল, পামগাছেব সবুজ পাতা, ঘরের দেয়ালের রঙিন প্রজাপতি।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন, দৃষ্টি স্পষ্ট হল, একদিন দেখলেন, লতা বউদির দিকে চোখ তুলে কথা বলতে গেলেও পলক পড়ে না।

কিন্তু সেটা যতক্ষণ নেশার ঘোর থাকে ততক্ষণই। ততক্ষণ আপনা থেকেই দৃষ্টি কেমন বিস্ফারিত হয়ে থাকে, সঙ্কোচের নেশাও থাকে না, এমন কি একটা ছুটো হালকা ঠাট্টাও মুখে আপনা থেকেই এসে যায়।

যতক্ষণ নেশা থাকে, মাত্র ততক্ষণই। নেশা ছুটলেই ভিতরটা কেন্ন যেন নেতিয়ে পড়ে, শচীপতি আবার সেই জড়সড়, ছোট্টটি হয়ে যান।

'ঘুম কাতুরে লোককে যেমন বার বার ঢাকের আওয়াজ দিয়ে জাগিয়ে রাখতে হয়,' শচীপতি বলেছিলেন, 'গলায় বিষ ঢেলে ঢেলে তেমনই আমাকে সাহসটুকু জাগিয়ে রাখতে হল।'

এই সাহসের বশে কিংবা নেশার ঘোরে শচীপতি মাঝে মাঝে এক-একটা কাজ করে বসতেন। এক-একবার মাথায় তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হত। দু-হাতে কপালের রগ টিপে বসে থাকতেন। ভয় হত, শিরা ফেটে ফিনকি দিয়ে সব রক্ত বুঝি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে তাঁর উত্তেজনা, তাঁর কৃত্রিম সাহস।

তখন একটা অবসাদ শচীপতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। নেশা দিয়েও যদি সাহস না আসে তবে কী নিয়ে বাঁচবেন তিনি? তবে তো দ্বিতীয়বার তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

সাহসটুকু একেবারে উবে যাবার আগে তাই শচীপতি উঠে দাঁড়াতেন। আয়নায় দেখতেন নিজেকে। চোখ টকটকে লাল, পা টলছে। 'এখনও এটুকু আছে' শচীপতি বলতেন মনে মনে, 'এর পরে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব। তার আগে ফুরিয়ে যাবার আগে একবার, অন্তত একবার কিছু করে নিই।' কিন্তু কী করা যায়, কিছুতেই ভেবে পেতেন না। লতা বউদির খোঁজ করতেন, সে নেই। কোনদিন থাকত না। কোথায়, শচীপতি জানতেন না। লতা বউদি জানাবার প্রয়োজনও বোধ করতেন না। ক্ষোভে শচীপতির হাত দুটি আপনা থেকেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেত। আবার মনে মনে বলতেন, 'আমাকে ও তুচ্ছ করে। অথচ একদিন ভালবাসত, ভয় পেত।' এই চিন্তার সুতো ধরে ধরেই শচীপতি একটি সিদ্ধান্তের প্রান্তে পৌঁছে যেতেন। শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর যে, আবার যদি লতা বউদি তাঁকে ভয় করতে শুরু করে তবে হয়তো ভালও বাসবে। শচীপতির মনের কোন নিগূঢ় কোণে ভয় আর ভালবাসা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ছিল। ভয়নিরপেক্ষ ভাল-বাসার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। 'লতাকে আবার আমি ভয় দেখাব, আবার আমি বাঁচব' শচীপতি প্রতিজ্ঞা করতেন।

তার দেখবার বিচিত্র, খেয়ালী, প্রায়-ছেলেমানুষি-ঘেঁষা কয়েকটি পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। লতা বউদির পোষা ময়নার ডানা কেটে দিয়ে তার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে শচীপতি হাসতে থাকতেন। তখনও তাঁর চোখ জ্বলছে, থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। শচীপতি যেন বলতে চাইতেন, 'দেখ, আমি কত নিষ্ঠুর, কত ভয়ঙ্কর! আমাকে তোমার মনে নেই? সেই আমি? যে তোমাকে উলের তুলতুলে বলের মত একদিন ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়েছে। মনে নেই? আমাকে আর ভয় কর না তুমি, ভালবাস না, কেননা আমি জুড়িয়ে গিয়েছি, আমার পৌরুষ নেই। আমাকে ছেড়ে এখন তুমি ওদের দিকে ঝুঁকেছ, পাখি আর পোষা বেড়াল নিয়ে আছ। আমি কিন্তু জুড়িয়ে যাই নি, এখনও ভয়ঙ্কর হতে পারি। এই দেখ না, তোমার প্রিয় ময়নাটাকে কেমন যন্ত্রণা দিলুম, আর ভিজে মেনি বেড়ালটার তো শুধু মরতেই বাকি আছে।'

ফল হয় নি।

আগে ছিল পাখি আর নিরীহ প্রাণী, সেদিকে বাধা পেয়ে লতা বউদি এবারে মানুষের দিকে ঝুঁকলেন। সবই সৌরকে অকপটে জানিয়েছিলেন শচীপতি।

"রাম দিয়ে ধুলে তবে তামাকের পাইপের ময়লা সাফ হয়, জান? আমিও আজ দিলটাকে ধুয়ে একেবারে খোলসা করে দিয়েছি, তোমার কাছে কিছু ঢাকব না। হ্যাঁ, তখন থেকেই লতা বাইরের মেলামেশাটা মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়।"

সৌর বলে উঠল, "ওঃ।", যে-অব্যয়টির প্রকৃত ব্যঞ্জনা 'তাই বুঝি!' অথচ সে নিজেই বুঝছিল না, আর কী করতে পারতেন লতা বউদি—কী আচরণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত!

ওর মনেব কথা অনুমান কবে নিয়েই শচীপতি যেন বললেন, "না, আর-কিছু সে করতেও পারত না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। লতা হাতে জপের মালা তুলে নেবে বা গরদ পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকবে—আমার আশা করাই অন্যায় হত। সবাই তো এক ধাতুতে গড়া নয়।"

কতকটা আত্মগত, কতকটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে শচীপতি বলে গেলেন, "ধাতু মানে শরীর। এক-একটা শরীরের এক-এক রকমের প্রয়োজন, চাহিদা, এক-এক দিকে ঝোঁক। লতার যা চাই, তাকে তা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার আমার কী আছে! তোমরা হয়তো বলবে, ওটা স্থূল ব্যাপার। শরীরটা একে-

বারে বাইরের বস্তু, তাকে নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়। আমি তা মানি নে। আসল তবে কোন্‌টা--আত্মা? আত্মা তো নিরাকার, অজর, অমর। তাকে শস্ত্র ছিন্ন করে না, পাবক দহন করে না। সোজা করে বলি।—আত্মার কোনদিন মাথা ধরে না, দাঁত কনকন করে না। দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে কোনদিন পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখেছ? সবই যেন বদলে গিয়েছে, এ কথা মনে হয় নি? দুনিয়ার সব ক'টা মানুষকে তখন এক-একটা আস্ত শয়তান বলে মনে হয় নি? কিংবা পেটে চনচনে খিদে নিয়ে রোদ্দুরে, রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় মনে হয় নি যে, চারধারে চিতা দাউ দাউ জ্বলছে? তবেই দেখ, শরীর গোটা জীবনদর্শনকেই কতখানি বদলে দিতে পারে। আবার শরীর থেকে প্রাণ বের করে নাও, তখনও সে ঠাণ্ডা, পাথর—কিছু পারে না। তা হলে দেখছ, আলাদা ভাবে প্রাণ আর শরীর কিছুই পারে না। অথচ এই দুইয়ে যুক্ত হলেই জীবন হয়।"

একটানা বক্তৃতা দিয়ে শচীপতি হাঁপাতে থাকলেন। হাত বাড়িয়ে দেখলেন, গ্লাস শূন্য, তখন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। টেবিলের-ওপরে-রাখা একখানি হাতে আস্তে আস্তে গাল কাত করে রাখলেন। সৌরর মনে হল, শচীপতী বুঝি ঘুমিয়ে পড়বেন। কাত হয়ে পড়া গ্লাস থেকে তখন পীতাবশেষ একটি ক্ষীণ ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল। গ্লাসের কিনারে অল্পস্বল্প ফেনা তখনও লেগে ছিল। শচী-পতিরও ঠোঁটের কোণে একটি কষের রেখা দেখা দিয়েছিল। শূন্য গ্লাস আর পাংশু মুখ—এই দুইয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে সৌর চমকে উঠেছে সেদিন, ভয় পেয়েছে।

এই বিচিত্র দাম্পত্য-কাহিনীর অপরার্ধ আরও কিছুদিন পরে সে জানতে পারে—লতা বউদির কাছ থেকে।

লতার কোলে সৌর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, লতা ওর এলোমেলো চুলের রাশিকে সিঁথির দু পাশে ভাগ করে রাখছিল, এসব আরও কতদিন পরের কথা? অন্তত ছ মাস তো হবে। এখন, এতদিন পরে, আগেকার সেই দিনগুলি একটি আর-একটির সঙ্গে লেগে যেন একাকার হয়ে আছে, তাদের আলাদা কোন অস্তিত্বই নেই। বছরগুলো পর্যন্ত মিলে-মিশে, গুদাম-ঘরে পরিত্যক্ত জিনিসের মত স্তূপীকৃত হয়ে আছে, তাদের একটাকে খুঁজে তুলতে গেলে অন্ধকারে আর-একটায় হাত লেগে যায়, অন্যটাই উঠে আসে।

যখন ঘটছিল, তখন কিন্তু প্রত্যেকটি দিন ক্ষণ আলাদা ছিল। বৃষ্টির ফোঁটার মতই তারা বিচ্ছিন্নভাবে ঝরছিল, কিন্তু এখন পুরনো কালের পুকুরটার মধ্যে এক হয়ে আছে। আলাদা স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ—কিচ্ছু নেই।

অথবা সাঁতরে সাঁতরে দীর্ঘ একটা দীঘি যেন পার হয়ে এলাম। তখন, দু হাত দিয়ে জল টানবার সময়ে ক্লান্ত লাগছিল, ভাবছিলাম, যেন ফুরবে না, যেন পার নেই। কই, এখন তো পারে পৌঁছে গিয়েছি, পিছন ফিরে দীঘিটাকে তেমন দীর্ঘ ঠেকছে না তো। ওইটুকু তো ওর প্রসার—তাই পাড়ি দিতে আমার এতটা সময় লেগেছে?

অথবা দিনগুলি কালো কালো পিঁপড়ে, তাদের প্রতিটির দংশন আছে, তারা মিছিল করে চলেছে, এখন এখান থেকে দেখলে সে মিছিল কালো একটা রেখা বই কিছু না। অথচ পিঁপড়েগুলি কিন্তু একটু একটু করেই এগচ্ছে।

সৌরও একটু একটু করেই এগিয়েছিল। লতা বউদিও একটু একটু করে তাকে টেনে থাকতে পারেন। মোটের ওপর তাঁর কোলে মাথা রেখে শোবার সাহস সঞ্চয় করতে, অনুমতি বা প্রশ্রয় পেতে সৌরর পুরো ছুটি মাস কেটে গিয়েছিল।

লতা আঙুল বুলিয়ে ওর চুলের গভীরে হারানো সিঁথিটিকে খুঁজে বার

করছিল, আবেশে সৌরর চোখ বুজে আসছিল, কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ে নি, এক-একবার লতার চোখে চোখ রাখছিল। আর হাত বাড়িয়ে লতার ঠোঁটে আঙুল রাখছিল। আর লতার আঙুল টেনে এনে এনে রাখছিল নিজের ঠোঁটে।

"এখানে সাদা এটা কী? চুন লেগে আছে। পান খেয়েছ বুঝি?"

"না, সিগারেটের কাগজ হতে পারে।" লতারই আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁটের কোণ ঘষে ঘষে সৌর জবাব দিল।

"খুব সিগারেট খাও বুঝি? তাই তোমার আঙুল এত হলদে। এত খাও কেন?"

"এত কোথায়, বেশী না তো। কিন্তু তোমার হাতের আঙুল এত হলদে হল কেন? সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে দিয়ে?"

"না, আজ শিউলি-বোঁটার রস লাগিয়েছি। শিউলিফুলের বোঁটা হলদে, জান না?"

সৌর বলল, "জানি। ছেলেবেলায় কত মালা গেঁথেছি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সকলের সিগারেট ধরিয়ে দাও। আমারই তো কতদিন দিয়েছ।"

"দিয়েছি তো, দিই-ই তো," লতা স্বীকার করল, "ধরিয়ে দিয়েছি, পুড়িয়ে দিতে চেয়েছি।"

"শুধু চেয়েছ? পার নি?"

ওর চোখে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে লতা বলল, "না। একজনও ছাই হয় নি। না, একজনও না।"

সৌর অস্বস্তিতে নড়ে উঠল: "কিন্তু ফোসকা লাগাতে পার, জ্বালা ধরাতে পার। যেমন আমার ধরিয়েছ।" বলতে বলতে সৌর শক্ত করে লতার হাত চেপে ধরল: "আরও কতজনের ধরিয়েছ, বল। বলতেই হবে।"

লতা তবু নড়ল না, ভয় পেল না। মুখে টিপে হাসতে হসতে বলল, "যদি বলি একজনেরও না?"

"মিথ্যুক। তবে আমাকে জ্বালালে কেন?"

"সহজে যায় বলে। তুমি যে সহজেই জ্বল। পাশের জানলার মেয়েটিকে দেখে একদিন জ্বলেছিলে মনে নেই?"

সৌর জবাব দিল না।

"সে আর জ্বালায় না? জানলায় এসে দাঁড়ায় না?"

"দাঁড়ায়, কিন্তু আমি ওদিকে চাই নে। আমি জ্বলি নে।"

"ওর গাল টিপে দিয়ে লতা বলল, "তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। কিংবা শুধু এইটুকু হয় যে, তুমি জ্বল যত তাড়াতাড়ি, তত তাড়াতাড়িই নেব।"

[কিন্তু এখন আমি জ্বলছি, সৌর বলছিল মনে মনে, জ্বলছি হিংসায়, স্পর্শে শিহরণে। আমার বুক জ্বলছে, চোখ জ্বলছে, জ্বলছে দুই ভুরুর মাঝখানে কপালের অংশটুকু—মেয়েরা যেখানে টিপ পরে। ও যেখানে পরেছে। এই জ্বালা ও জুড়িয়ে দিতে পারে। ও কেন নুয়ে পড়ছে না, আমার যেখানটা জ্বলছে সেখানে কেন ঠোঁট রাখছে না?]

অধীর হয়ে সৌর উঠে বসে লতার গলা জড়িয়ে ধরল। কঠিন নিষ্ঠুর হয়ে বলে উঠল, "তুমি শুধু খেলছ, শুধু লুকচ্ছ। আরও কতজনকে জ্বালিয়েছ, এখনও বল নি।"

"শুনে লাভ?"

"তবু শুনব।"

"যদি বলি, অনেক—অনেক? সব নামও আমার মনে নেই?"

"বিশ্বাস করব না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লতা কিংবা হাই তুলল। বলল, "সত্যিই অনেক। তুমি কজনের কথা শুনতে চাও?"

আর তখনই লতার কোলে অবশ সৌর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। যেন লাল ফুল ভেবে এতক্ষণ 'দাও, দাও' বলে বায়না ধরেছিল, ফুলটা যেই কেউ ওর হাতে ফেলে দিল, অমনিই সৌর চমকে উঠে টের পেল, যেটাকে লাল ফুল মনে করেছিল সেটা আসলে ফুলই নয়, জ্বলন্ত এক টুকরো টকটকে কয়লা।

ধরা-ধরা গলায় সৌর বলল, "একজনের নাম জানি। বিজন।"

লতা বলল, "হ্যাঁ, বিজন একজন। আরও ছিল। তার আগেও আরও কতজন এসেছে।"

সৌর মৃঢ় গলায় শুধু বলতে পারল, "তাদেব নাম বল।"

"শুধু নাম? গল্পও নয়?"

সৌর বলল, "গল্পও।"

লতা বলেছিল। কতটা গল্প, কতটা বানানো, সৌর জানে না, কিন্তু সেদিন হৃৎস্পন্দ বন্ধ করে শুনেছিল। সব নাম আজ এতদিন পরে মনে নেই, সব ঘটনাও নয়। আবার সবগুলোকে ভোলেও নি।

সরিৎ মজুমদারই বোধ হয় এসেছিল প্রথম। শচীপতিরই বন্ধু, আইনের পরামর্শ দিতে এ-বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত। তার একটা বর্ণনাও লতা দিয়েছিল বলে মনে পড়ছে। কালো, দীর্ঘাঙ্গ, তীক্ষ্ননাসা। মুখের ওই নাকটাই নাকি সরিতের ছিল আশ্চর্য। পোশাক সর্বদাই একরকম পরত—কালো আলপাকার কোট, সাদা জিনের প্যান্ট।

অধৈর্য সৌর বাধা দিয়ে বলেছিল, এ-সব শুনতে চাই না। কী ঘটেছিল তাই বল।"

"কী ঘটেছিল? একদিন এ-বাড়ি আসতে সরিতের আলপাকার কোটটাই ভিজে গিয়েছিল।"

"তাই কী?"

"তাড়াতাড়ি সেই কোটটা খুলে দিয়েছিলুম আমি।"

"আর?"

"খুলতে গিয়ে তার হাতে আমার হাত লেগেছিল।"

"আর?"

লতা হেসে উঠে বলল, "আর কিছু নেই। তখনই নেই।"

"তার মানে পরে ছিল, পরে হয়েছিল?"

সৌবর নাকটা ধরে নেড়ে আদর করে লতা বলল, "ছেলেমানুষ—ছেলেমানুষ। আর শুনতে চেও না।"

হাতটা ঠেলে দিয়ে সৌর বলে উঠল, "নির্লজ্জ! বল, আর কী, আর কে, আরও কতক্ষণ?"

নীতীশ রায় সম্পর্কে লতার বড় জায়ের ভাই। "তার সঙ্গে রোজ ঘুরেছি," লতা বলল, "সিনেমা দেখেছি। পবিত্র রায় ছিল নীতীশেরই বন্ধু। নীতীশের সঙ্গেই মাঝে মাঝে আসত।"

"নীতীশের কী হল?"

"বা রে, নীতীশ বিয়ে করল যে। দু শো টাকা মাইনে হল, অমনি কনে পছন্দ করে বিয়ে করল।"

"তুমি?"

"আমি সেই বিয়ের নেমন্তন্ন খেলুম। ফুলশয্যার আসরে গান গাইলুম, আসবার সময় নতুন বউয়ের ঘোমটা ধরে একটু নেড়ে দিলুম। আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে এল পবিত্র রায়।

"তুমি বুঝি পৌঁছে দিতে বললে?" সৌর এই নিরর্থক প্রশ্নটা কেন করল সেই জানে।

"না। ও নিজেই আসতে চাইল। আমি বললুম, চলুন।"

"তারপর?"

"তারপর তখন তো ট্রাম নেই, ট্যাক্সি পেলাম না, রিকশায় উঠলুম।" খানিকটা দম নিল লতা, বলল, "পবিত্র রায় আমাকে অনেকগুলো দামী জিনিস প্রেজেন্ট করেছিল।"

রুদ্ধ গলায় সৌর বলল, "আর তুমি?"

"আমি?" আঁচল ভাল করে টেনে লতা সংবৃত হল। "আমিও দিয়েছি বইকি। তবে দামী জিনিস কিনা জানি না।"

দাঁতে দাত চেপে সৌর বলল, "অসতী কোথাকার!"

আশ্চর্য, রাগ করল না লতা, বরং হাসল।—"কী বিশ্রী কথা বল ভাই তুমি! কিন্তু শুনতে কই খারাপ লাগল না তো! আরও শুনবে? রথীন গুপ্তর কথা? সে ছিল রাজনৈতিক নেতা। তার পাল্লায় পড়ে দিনকতক দেশোদ্ধার নিয়েও খেপে উঠেছিলুম। একবার তো সাত দিন সাত রাত্তির একসঙ্গে বাংলার মাঠে-মাঠে ঘোরাঘুরিও করে এলুম।"

"তারপর?"

রহস্যময় ভ্রূভঙ্গী করে লতা বলল, "তারপর নীরদ এল।"

সৌর অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বার বার লতা তাকে বহুদূর অবধি তুলে নিয়েই যেন নামিয়ে দিচ্ছে। অথবা একটি গ্রাস মুখের কাছে বার বার এসেও ফিরে যাচ্ছে। শেষ কথাটি জানা আর হচ্ছে না। লতা একটি গল্প না ফুরতেই অন্য গল্প শুরু করছে।

কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটল। ভাঙা ভাঙা গলায় সৌব বলল, "শচী-পতিদা কিছু বলতেন না? বলেন না?"

লতা বলল, "না।"

"আশ্চর্য ধৈর্য ভদ্রলোকের—অসীম ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা!"

"আমিও আগে তাই ভাবতাম," লতা বলল, "এখন এই ক্ষমার কারণটাও জেনে ফেলেছি।"

"কী কারণ? ওঁর জরা?"

লতা বিষণ্ণ-শান্ত গলায় উচ্চারণ করল, "না, তাও না। প্রথম যে এসেছিল,

তাকে দেখে উনি বিচলিত হয়েছিলেন। তাকে সহ্য করতে পারেন নি। আমাকে একদিন আঘাতও করেছিলেন। পরে দেখলেন, সে গেল, অন্য লোক এল। তখনও সান্দ্র হয়েছিলেন। ওঁর নাকের ডগা কতদিন ফুলে ফুলে উঠতে দেখেছি। মুখ যেন থমথম করত। উনি স্বাভাবিক হয়ে এলেন পরে। হয়তো পরে বুঝতে পেরেছিলেন, যারা আসছে তারা কেউ থাকবে না, আসবে আর যাবে। কতজন তো এল, গেলও, সকলেরই শেষ দৌড় কতদূর উনি জানতেন। জানতেন, সকলেই যাবে, শেষ অবধি একমাত্র উনিই আছেন, উনিই থাকবেন।"

একটু দম নিয়ে লতা বলল, "থাক্, আর বাজে বকবক করে না।" বলে সৌরর মুখের ওপর আনত হয়ে হাসতে লাগল।

বিজনকে দেখে সৌর অবাক হয়েছিল। মাথায় ছয় ফুট হবে, এ-ঘরে ঢুকতে হলে বিজনকে মাথা হেঁট করে ঢুকতে হয়, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে সৌর নিজেকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। পানেব দোকানে বিজনের পাশাপাশি দাঁড়াতে বরাবর সে অস্বস্তি বোধ করেছে। কারণ, পানের দোকানে আয়না থাকে, আয়নায় ছায়া পড়ে, রোগা, ছোট্ট সৌব কুণ্ঠায় আরও যেন ছোট হয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়।

বিজন কদিন থেকেই কলেজে আসছিল না, বিজনের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, বিজন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল, অনেকটাই সরে গিয়েছিল। তাব চেয়েও সত্যি কথা এই যে, বিজন—কলেজে যে তার একমাত্র বন্ধু—সে যে আসছে না, পাশে এসে বসছে না, এটা সৌর প্রথমে লক্ষ্যই করে নি। যেদিন লক্ষ্য করল, সেদিন সে বরং স্বস্তিই পেয়েছিল। বিজনের সান্নিধ্যে সৌর কিছুদিন থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল না। কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছে, তাল মিলছে না। বিজনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না সৌর, একটা অপবাধবোধ ওকে আড়ষ্ট করে দিত। মামুলী কথা হত—আবহাওয়া নিয়ে, খেলার খবর নিয়ে, বড় জোর পাঠ্য বইয়ের নোটের বিষয়ে—তার বেশী না। যেন দু দিক থেকে দুজন একটা বেড়া অবধি এসে, সীমানা না ডিঙিয়েই ফিরে যাচ্ছে। কিংবা পিছল-পাথরে-বাঁধানো পথে দুজনেই পা টিপে টিপে এগচ্ছে, ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে, পাছে টাল সামলাতে না পারে, পাছে পড়ে যায়। ফলে দু-চার কথা হতে না-হতেই থেমে যেত, অস্বাস্থ্যকর একটা নীরবতা দুজনের মাঝখানে আড়াল তৈরি করত।

ছুরি দিয়ে পেনসিল কাটত সৌর, আর আড়চোখে চাইত।—ও কী জেনেছে, ও কতটুকু জেনেছে, ও কি কিছুমাত্র জেনে ফেলেছে? এ কি স্বাভাবিক যে, লতা বউদি ওকে কিছু বলেন নি? মুখে না বললেও তাঁব কোন আচরণ থেকেও কি

বিজন কিছু অনুমান করতে পারে নি কিংবা আভাস পায় নি মুখভঙ্গি থেকে? অনেক কাহিনী তো মানুষের নির্বাক মুখেও লেখা থাকে।

বিজন আসছিল না, সৌর ভেবেছিল, এই ভাল। যে-সখ্যটা শুকিয়ে এসেছে, কতকগুলো মিথ্যের ভান দিয়ে তাকে সজীব করে তোলার প্রয়াস আর করতে হবে না।

কিন্তু বিজন এল।

যেদিন এল, সেদিন বোধ হয় কোন একটা ছুটির দিন, কিন্তু সকাল থেকেই বৃষ্টি, বেরব-বেরব করেও বাড়ি ছেড়ে বের হতে সৌরর ইচ্ছা হয় নি।

ঘরে বসেই কিছু লিখছিল বোধ হয়, অথবা পড়ছিল, ভাবতেও পারে নি, আজ কেউ আসবে বা আসতে পারে। সারাদিন বৃষ্টি, কলকাতার গলি নিশ্চয়ই আকণ্ঠ ভরে উঠেছে। দরজা ভেজানো ছিল।

কবাটে যখন টোকা পড়ল, সৌর তখন শুনতে পায় নি। কবাট একটু ফাঁক হল, পুরনো কবজা মৃদু প্রতিবাদের মত অস্ফুট শব্দ করল, সৌর তখনও ভেবেছিল জোলো হাওয়া। গায়ে চাদরটা আরও ভাল করে মুড়ে নেবে কিনা ভাবতে ভাবতেই, অন্যমনস্কভাবে দরজার দিকে চেয়েছিল।

কবাটের ফাঁকে ততক্ষণ একটা মুখ উঁকি দিয়েছে। সৌর চমকে উঠল।

কবাট দুটো প্রায় তখনই একেবারে আলগা হয়ে গেল, ঘরে প্রকাণ্ড একটা শরীরের ছায়া পড়ল। সৌরর চিনতে দেরি হয় নি, সেই ছায়া বিজনের। বলে উঠল, "তুমি!"

ভিজে জুতোর ছাপে ঘরের মেঝে যে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল, বিজন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, সোজা হেঁটে এসে একেবারে সৌরর টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

ঘরে দ্বিতীয় চেয়ার ছিল না। সৌর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বোস।"

ওকে উঠতে দিল না বিজন। জোর করে বসিয়ে দিল। সৌর জানত, তবু সেদিন নতুন করে টের পেল, বিজনের কবজিতে কত জোর।

বিজন টেবিলেই বসল পা ঝুলিয়ে। ওর জুতোর তলা ঘরের মেঝে স্পর্শ করিল। ভিজে এসেছে বলেই হক বা অন্য কোন কারণেই হক, বিজনের চুল কিছু অবিন্যস্ত, তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। জামাটা শপশপে ছিল একেবারে, আরশোলার শুঁড়ের মত বুকের দু-চারটে লোম ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। বিজনের যে-চোখ দুটি অল্প-অল্প লালচে,

একটা সিগারেট ধরিয়ে তার ধোঁয়ায় সেই চোখ দুটিকে সে আড়াল করে নিল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।"

কী কথা, সৌরও যেন আভাসে বুঝতে পেরেছিল, সে-কথা সে শুনতে চায় না, এখনই না, এই বর্ষা-দিনের বিকালে নিসাক্ষী ঘরে অরক্ষিতভাবে বসে থেকে না। তাই থেকে থেকে সে উসখুস করতে লাগল, একবার হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট চাইল, একবার বলল, "চা করতে বলি ?"

বিজন ঘাড় নেড়ে বলল, "না, দরকার নেই।"

"জামা-কাপড—অন্তত এই শার্টটা ছেড়ে ফেল।"

দৃষ্টি আনত করে নিজেকে একবাব দেখে নিয়ে বিজন বলল, "না, ঠিক আছে। গায়েই শুকিয়ে যাবে।"

সৌর বলল, "তুমি অনেক দিন আস নি।"

জবাবে বিজন শুধু হাসল। সিগারেটেব ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল, তবু সৌর হাসিটা দেখতে পেল। যেন সেই হাসি থেকে প্রেরণা পেয়ে, কিংবা সেই হাসিবই খানিকটা ধার করে সৌর নিজেও একটু হাসল। বলল, "আমি ভেবেছিলাম, তোমার অসুখ কবেছে।"

'যাক, কিছু ভেবেছিলে তা হলে।"

"দুদিন তোমাদের বাসাতেও গিয়েছিলাম।" বিজন তারই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অনুভব করে সৌর তাডাতাডি যোগ করল, "কিন্তু তোমার দেখা পাই নি।"

"বাসায় গিয়েছিলে, দেখা পাও নি, তবু ভেবেছিলে আমার অসুখ ?" বিজন মোটা গলায় বলে উঠল, হাসল। কিন্তু সৌর এবার হাসল না, হাসতে পারল না, তার কান গরম হয়ে উঠল, সে মাথা নিচু করে রইল, টের পেল, মিথ্যে কথাটা বিজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।

একবার সৌর ভাবল, আলো জ্বালি, তা হলে হয়তো এই থমথমে ভাবটা দূর হবে। আবাব ভাবল, কেন, এই তো বেশ, অন্ধকার আছে, তাই কিছু আড়ালও আছে, আলো জ্বললেই আরও বেশী করে ধরা পড়ে যাব।

চুপ করে বিজন সিগারেট টানছিল, একটার পর একটা, একটা না ফুরতেই আর-একটা, টুকরোগুলো ঘরের মেঝেতেই ছুড়ে ফেলছিল, বিশ্রী লাগছিল সৌরর, ও বড নোংরা, বড় অসাবধান, আগুনটাও নেবায় না কেন ? যদি কিছু জ্বলে ওঠে ? তখন কী হবে, তখন আমি কী করব? তার চেয়ে এখনই কোন কিছু জ্বলে

ওঠার আগেই, আমি কেন তৎপর হই না, সিগারেটের টুকরোগুলো নিবিয়ে ফেলি না?

স্যাণ্ডাল দিয়ে ঘষে ঘষে সৌর সিগারেটের টুকরোগুলো নেবাতে লাগল।

বিজন কথা বলতে আরম্ভ করল আরও অনেক পরে। তখন বৃষ্টি থেমেছে, ওর প্যাকেটের সব সিগারেট ফুরিয়েছে, স্যাণ্ডালের গোড়ালি দিয়ে একটি টুকরো নেবাতেও সৌরর বাকী নেই।

সব টুকরো নিবিয়ে নিবিয়ে সৌরও ওর মনের সাহস যেন ফিরে পেয়েছিল। বিজন এসেছে, আসুক না, বসে আছে থাকুক না, ও আমার কী করবে—সৌর মনে মনে কথাটা ভূত-তাড়ানো জপমন্ত্রের মত আউড়ে চলছিল। ওর শরীর আমার চেয়ে ঢের বড়, ওর কবজিতে অনেক জোর, তাতে কী! ও কি এগিয়ে আসবে, আমাকে শক্ত করে চেপে ধরবে, ওর কঠিন হাতের মুঠোয় আমি কি মুচমুচে মুড়ির মত গুঁড়িয়ে যাব? গলা চিরে একটা শেষ আর্তনাদ করবারও সময় পাব না?

সৌর মনে মনে বিচার করছিল, আর নিজেকে বলছিল, দূর, তা কী হয়! ও-ভাবে কেউ কাউকে শেষ করতে পারে! আমার দিক থেকে আমি যদি ওর কোন ক্ষতি না করি, ওকে এগিয়ে আসবার সুযোগই না দিই, তবে ও আমাকে ধরবে কী করে? আঘাত করতে হলেও একটা ছুতো তো চাই। সেই ছুতোব ও অপেক্ষা করে আছে। সৌর স্থির করল, কিন্তু আমি ওকে তা দেব না। আমি তো খাঁটি আছি, আর আমি যদি খাঁটি থাকি, তবে আমার ভয় কী! আমার গায়ে জোর বেশী নেই, কিন্তু মনের জোর হারাব কেন?

মনের জোরও যে জোর, তাই দিয়ে শারীরিক শক্তিকেও যে তুচ্ছ করা চলে, এ-কথা সৌর সেদিন, সেই অস্বস্তি-কণ্টকিত সন্ধ্যায় প্রথম টের পেয়েছিল। দেহগত ক্ষীণতার জন্য তার মনে অতঃপর আর কোন হীনতাবোধ ছিল না, চিত্ত সম্পূর্ণভাবেই ভয়মুক্ত হয়েছিল।

ভয় দূর হতেই সৌর ভাবল, আমি যা-তা কী-সব চিন্তা করছি! বিজনের মনে খারাপ কোন অভিসন্ধি আছে তাই বা ধরে নিয়েছি কেন? তা যদি থাকত তবে তো তখনই ও অসহায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত, এতক্ষণ ও বসেই বা থাকবে কেন? সে-সব তো কিছু নয়, আমাকে কিছু

বলতে এসেছে, হয়তো ওর কিছু প্রার্থনা আছে, সঙ্কোচ জয় করতে পারছে না বলেই ওর মুখ ফুটছে না।

যে-মুহূর্তে বিজনকে প্রার্থী হিসেবে সৌর কল্পনা করতে পারল, সেই মুহূর্তেই ওর বিপুল শরীর সৌরর চোখে যেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেল। পরাক্রান্ত এই মানুষটা দুর্বল, অসহায়, পরাভূত, পদানত।

সৌর বিজনকে করুণা করতে আরম্ভ করেছিল।

বিজন এলোমেলো দু-একটা কথা দিয়ে শুরু করেছিল। সৌর ধরতে পারছিল না, তার লক্ষ্য কী! এই অসংলগ্ন কথা কয়টির ইটে পা রেখে রেখে কোন্ বিন্দুতে সে পৌঁছতে চায়?

বুঝতে দেরি হল না, বিজন হঠাৎ অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠল. "ভাই সৌর, আমি সব জানি। সবই বুঝেছি।"

"লতা—লতা বউদি বলেছে?" সৌর জিজ্ঞাসা করল মিষ্টি মিষ্টি চোখে চেয়ে।

বিজন বলল, "না, না। আমি এমনিতেই জেনেছি। এসব জিনিস আপনা থেকেই টের পাওয়া যায় না?"

বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই, তবু সৌর বলল, "যায়।"

সৌর লক্ষ্য করছিল বিজনকে। বিজনের হাতের আঙুল কাঁপছে, বিজন—রূঢ়ভাষী বিজন, এখন সীলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে। কথা বলবার সময় ওর ঠোঁটের কোণ কেমন বেঁকে-চুরে যাচ্ছে। বিজনের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

বিজনের কষ্টটাই ভিতরে গিয়ে অস্থির করে তুলল সৌরকে। সৌর অভিভূত হল, সৌরর কান্না পেল। ওর সত্তাকে যা মথিত করছে, সেই অনুতাপ সৌরকে সান্ত্বনায় মহৎ করল। প্রবল আবেগে সে হাত দুটি জড়িয়ে ধরল বিজনের। ধরা গলায় বলল, "ভাই বিজন, আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর।"

বিজন হাত ছাড়িয়ে নিল। খুব আস্তে বলল, "না। তুমি আমাকে ঠকাও নি। আমরা দুজনেই ঠকিয়েছি শচীপতিদাকে। আমাদের সব অন্যায় তাঁর কাছে।"

সৌর মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, "ছি-ছি-ছিঃ!"

বিজন বলল, "তোমার ধিক্কার এখন এল ভাই, আমার এসেছে অনেক দিন আগে। তুমি সেই ম্যাজিক দেখ নি সৌর, হাতের মুঠোয় একটা টাকা পুরে দিয়ে জাদুকর বলে, এবারে হাত খুলুন তো? যেই মুঠো খুললে তুমি দেখলে,

কিছু নেই, ফাঁকা। আসলে, ম্যাজিকের টাকা নয়, সব পাওয়ার মধ্যেই সংসারে বিশ্রী একটা ফাঁকি আছে। আমি অনেক দিনই টের পেয়েছিলাম যে জিনিস পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা মূল্যহীন হয়ে যায়, নাড়াচাড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সাধ হয়।"

সৌর তন্ময় হয়ে শুনছিল। অবাক হয়ে ভাবছিল, বিজন এমন গুছিয়ে কথা বলতে শিখল কবে? যে-বিজনকে সে চিনত এ তো সে নয়। এই কদিনের অজ্ঞাতবাসকালে বিজন বুঝি নিজেকেই শুধু বিচার করেছে। তবু কথা বলার এই ধরনটুকু সে আয়ত্ত করল কবে?

সৌর বিজনকে বলে যেতে শুনল, "লতাকে একদিন সত্যিই চেয়েছিলাম। ওকে একটু দেখতে, ওকে একটু ছুঁতে, ছুঁলে জড়িয়ে ধরতে দিন-রাত চেয়েছি। একটু-একটু করে দেখা, ছোঁয়া, জড়ানো—সব অধিকারই পেলাম। তখন মনে হল, সস্তা—এত সস্তা? সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ছাতে উঠে কখনও চারদিকে চেয়েছিস? অবসাদ বোধ করিস নি? আর-কিছু করবার নেই, আরও ওঠবার মত ওপর নেই, এটা ভেবে খারাপ লাগে নি? আমার লেগেছিল। আমি ভেবেছিলাম, এর জন্যে এত কষ্ট? কী লাভ হল কষ্ট করে ওপরে উঠে, যার পরে একমাত্র কাজ নীচে নেমে যাওয়া?"

বিজন একটু দম নিল। বলল, "আমি অস্থির হয়েছিলাম। হয়তো পাগল হয়ে যেতাম, আমার শূন্যতাবোধই আমাকে শেষ করে দিত, কিন্তু শচীপতিদা আমাকে বাঁচালেন।"

"শচীপতিদা?"

"শচীপতিদা। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সব খুলে বলেছিলাম।"

"তিনি কী বললেন?"

"কিচ্ছু না। একটি কথাও না। আমি বলে উঠলাম, আপনার হিংসে হয় না? শচীপতিদা বললেন, না, আমি শেষটাও জানি যে। আমি বললাম, কী রকম? শচীপতিদা বললেন, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। ধর, এক দেশে যদি অত্যাচারী কোন রাজা মাথা তোলে, প্রজারা হাহাকার করে, কাঁদে, তাকে অভিশাপ দেয়, হয়তো ষড়যন্ত্রও করে। কেবল একজন করে না। সে কে, জান? সে হল সেই জ্যোতিষী, সূতিকায় যে রাজপুত্রের করকোষ্ঠী বিচার করেছিল। আর-কেউ জানে না, কিন্তু সে জানে, এই রাজার পরমায়ু কতদিন, কবে তার খেলা ফুরবে। মৃদু মৃদু হেসে শচীপতিদা বললেন, আমিও সেই

জ্যোতিষী। অনেক দেখে দেখেই ত্রিকালজ্ঞ হয়েছি। জানি, কার খেলা কবে ফুরবে।”

প্রায় এই রকমই একটা কথা সৌর লতার কাছেও শুনেছিল, তাই বিস্মিত বা বিচলিত হল না। বিজনকে সে বাধাও দিল না। বোধ হয় কথায় পেয়েছিল বিজনকে, সে বলে গেল, “আজ আমি সবচেয়ে ভালবাসি শচীপতিদাকে। অনেক নিষ্ঠুরতাও তিনি করেছেন। আমি আর লতা যখন একলা আছি, হঠাৎ এসে পড়েছেন। আমরা, অন্তত আমি, মনে মনে কামনা করেছি, ও যাক সরে যাক, কেননা এই মুহূর্তে উত্তেজিত শরীর আমাদের আর ধরে রাখতে পারছে না। তখনও শচীপতিদা নড়েন নি, একখণ্ড পাথরের মত দুজনের মাঝখানে বসে থেকেছেন। আমাদের যন্ত্রণা দিয়ে যেন নিষ্ঠুর মজা পেয়েছেন। এ যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতিরই একটা রকমফের। ওই একটুখানি মজা পাবার বিলাস শচীপতিদা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন।”

সৌর আজও চোখ বুজলে শচীপতির শান্ত সৌম্য রূপ দেখতে পায়। ওই শান্তির রহস্যটুকুও সে জানে। সেদিন শান্ত ধ্যানাসনে বসে কী বর প্রার্থনা করেছেন শচীপতিদা? তিনি নিজে বুড়ো হয়ে পড়েছেন, লতাও কবে বুড়ি হবে সেইজন্য কি দিন গোনেন নি? বয়সের যে ধাপটিতে উঠে শচীপতিদা এখন হাঁপাচ্ছেন, সেখানে বসে বার বার কি তিনি লতাকে ডাকেন নি—তুমিও এস, এখানে আমার পাশে বস? তাঁর নিজের বাসনার কবেই তো নিবৃত্তি ঘটেছে, লতারও যেদিন ঘটবে, সেদিন দুজনে আবার মিলতে পারবেন। প্রৌঢ় শচীপতি সেই বীত-বাসনা মসৃণ-অনুদ্বেল যৌথ দাম্পত্য জীবনের প্রতীক্ষা করছিলেন। উৎসুক হয়ে একটির পর একটি দিন গুনছিলেন।

সব কথা ফুরিয়ে যাবার পরও বিজন সেদিন আরও কিছুক্ষণ ছিল। একদৃষ্টে সৌরর দিকে চেয়ে ছিল। সৌরও ছিল মূঢ় লজ্জিত স্তূপের মত হাঁটুতে মুখ গুঁজে। অনেক পরে বিজন উঠে দাঁড়াল। বলল, “না সৌর, তোর ওপর আমার কোনও রাগ নেই। যাই।”

সৌর জিজ্ঞাসা করেছিল, “কোথায়?”

“আপাতত বাড়ি। কাল সকালে অনেক লম্বা পাড়ি দেব। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া। একটা ফরেস্ট অফিসে কাজ পেয়েছি।”

সৌর বলে উঠল, "নির্বাসন !"

বিজন হাসল, "বলতে পারিস। আসলে এখানে আমার আর ভাল লাগছে না। ওখানে শিকার-টিকার নিয়ে দিনগুলো একভাবে কেটে যাবে, কী বলিস? চলি, আর হয়তো দেখা হবে না।"

কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু সৌর জিজ্ঞাসা করে বসল, "লতা বউদিকে জানিয়েছিস?"

"না। জানাবার দরকারই বা কী?"

"কিছু না। এমনি। একদিন তো সে তোকে—তোকে—" কথার সুতো জড়িয়ে গিয়ে সৌর শেষ করতে পারছিল না।

বিজনই করে দিল : "ভালবাসত, বলবি তো?"

"হ্যাঁ।"

"আরে, দূর, দূর।" বিজন ফিরে এসে সৌরর কাঁধে একটা হাত রাখল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "সৌর, লতা আমাকে কোনদিন ভালবাসে নি। তোকেও এখন ভালবাসছে না। তুই শুনে আঘাত পাবি, কিন্তু আসল কথাটা এই। আমাকে না, তোকে না, মানুষ হিসাবে ও আমাদের কাউকে ভালবাসে নি। ও ভালবেসেছে শুধু আমরা ওকে যে স্থূল সুখটুকু দিয়েছি, দিতে পারি, তাকে। তাতে ওর প্রয়োজন ছিল, নইলে ও ভালবাসে শচীপতিদাকেই।"

বিজন আর দাঁড়ায় নি।

স্তম্ভিত বজ্রাহত সৌর সেদিন তারপরেও বহুক্ষণ ধরে বিজনের শেষ কথা কয়টি মনে মনে বিচার করেছে। জীবনে প্রথম যে-নারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে, সে যে তাকে ভালবাসে নি, ভালবেসেছে তার দেওয়া স্থূল সুখকে, এ-কথা সহজে মেনে নিতে মন চায় নি। এই ভাবনাই তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। মানুষ গন্ধমাদন আর সুখটাই বিশল্যকরণী? চাওয়া-পাওয়ার এই যদি শেষ ব্যাখ্যা হয়, তবে এর মূল্য কী! কানাকড়িও না। গোটা জীবনটাই, তখনকার মত, সৌরর কাছে কানাকড়ির মত তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

পরে অবশ্য চাওয়া-পাওয়ার অন্য অর্থও সৌর আবিষ্কার করেছে। শুধু সুখ নয়, মানুষও। কেবল দানটুকুই নয়, দাতাও। প্রথমে হয়তো সুখ, পরে মানুষ। প্রথমে হয়তো দানটাকেই বড় করে দেখি, পরে যে বার বার দিল, দিয়েই চলেছে, তার দিকেও চেয়ে দেখি। তাকেও, সব নিয়েই শেষ অবধি

গ্রহণ করি। সুখের সিঁধপথেই তাকে কখনও কখনও ঘরে তুলতে হয় বটে, পরে কিন্তু তারই জন্য ঘর-জোড়া আসন পাতা থাকে।

এ-সব কথা আরও অনেক পরে, অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গৌর জেনেছিল।

সেদিন সৌর অনেক রাত অবধি ঘুমতে পারে নি। তাই বলে বলাও চলে না যে, সে জেগে ছিল। আসলে তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে একটা বিন্দু আছে যা, ধ্রুবতারার মত স্থির, সেখানে পৌঁছে সৌরও স্থির হয়ে ছিল। অথবা সে যেন কোন সমুদ্রতীরে বালির শয্যায় শুয়ে আছে। জলের একেবারে কাছাকাছি—এক-একবার অস্থির উচ্ছ্বসিত ঢেউ তার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সে তলিয়ে গেল, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র, কেননা পরক্ষণেই সে ভেসে উঠছিল, ফেনা-মাখা চোখ মেলে আকাশের দিকে চাইছিল।

সমুদ্রতটে তার শরীর নিয়ে ঢেউ যা করতে পারত, তার নিজের ঘরে তার মন নিয়ে ঘুম তাই করছিল। পিছিয়ে গিয়ে গিয়ে নিরিখ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। ঢেউ কেন, সেই ঘুমকে শিকারী বেরাল বলেও কল্পনা করা যায়, আর তার চেতনাকে ছোট্ট একটা বল বলে। নরম থাবায় ধরা দেয়, ফের ছিটকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

সৌর ছটফট করছিল আর বলছিল মনে মনে, 'আজ আর আমার ঘুম হবে না। তবু কেন শুয়ে আছি এই বিছানায়, কেন ছাতে চলে যাই নি, সেখানে আর-কিছু না হক, তারাদের তো গুনতে পারতাম। গোনা শেষ হত না জানি, কারণ রাত ফুরয় কিন্তু তারা ফুরয় না। যদি আমাদের দেশের সেই বাড়ি হত, তবে এখন চলে যেতাম বাড়ির পিছনের বাগানে, লেবুপাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বুক ভরে তার গন্ধ নিতাম। সেই ছেলেবেলায়, যখন আমার প্রায়ই খুব জ্বর হত, যন্ত্রণায় ছটফট করে করে হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম, আজও সেই রকম হলে মন্দ হয় না। অজ্ঞান হলেও আমি থাকব, কিন্তু আমার অস্থিরতা থাকবে না, এই যে মাথার ভিতরে ছুঁচ বিঁধছে, এটা থাকবে না, অজ্ঞানতা ঘুম নয়, কিন্তু ঘুমের চেয়েও গভীর। কালো একটি দহের উপরের স্তরে ঘুম, মাঝখানে জ্ঞান-বিলোপ, সবচেয়ে নীচে মৃত্যু।'

অজ্ঞানতা নয়, মৃত্যু নয়, সৌর শেষে ঘুমকেই পেয়েছিল।

সৌর চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মেয়েটিই ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় ওকে চুপ করতে বলল। ওই ভঙ্গি দেখেই সৌর তাকে চিনতে পারল। কিংবা এই রাত্রির চেয়েও কালো চোখ দেখে।

"মায়া, তুমি ?"

মায়া হাসছিল : "কী করে আমার নাম জানলে ?"

"বা রে, তোমার নাম মায়াই তো। আমি জানি।" সৌর বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে ওকে বসতে বলল। মায়া কিন্তু বসল না। একটু সরে জানলার কাছে, যেখানে জ্যোৎস্নার একটুখানি অভ্র গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিল, সেখানে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। তার ছায়াটাকে ঠেলে দিল সৌরর দিকে। সৌর হাত বাড়াল, কিন্তু অবাক হল সেই ছায়াটাকেও ছুঁতে পারছে না দেখে। দরজা এখনও ভিতর থেকেই বন্ধ, তবু ও কী করে এল—সৌরর বিস্ময়ের সেও একটা কারণ।

ছায়ার দিকে চোখ রেখে, কিন্তু জানলার কাছে দাঁড়ানো কায়াকে উদ্দেশ করে সৌর বলল, "আমি জানতাম, তুমি আজ আসবে।"

মায়া হাসছিল। ও-পাশের জানলায় শিকের ওপর চোখ রেখে যে-ভাবে তাকায়, আজ এত কাছে এসেও সেই ভাবেই তাকিয়েছিল। "জানলে কী করে ?"

সৌর বলল, "জানলাম! কিন্তু—কিন্তু তুমি বসবে না ?"

মায়া মাথা নেড়ে বসতে অস্বীকার করল।

"কী করবে তবে ?"

"দাঁড়িয়ে থাকব।"

"ওখানে—এইভাবে—সারা রাত ? বেশ, থাক তবে।" সৌর যেন রাগ করল, "আমি এই ও-পাশ ফিরলুম, চোখ বুজলুম।"

"আমি তবে যাই ?"

শশব্যস্তে উঠে বসে সৌর বলল, "না, না, না। আমি বরং চোখ খুলে রাখছি, তোমাকে দেখছি।"

সৌর সত্যিই দেখছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মায়াকে কি সুন্দরী বলা যায় ? যায় বই কি। এতদিন দূর থেকে দেখেছি, টের পাই নি তো, ওর চুল এত ঘন কালো, যা মেঘ হয়ে অনায়াসে ওর সারা পিঠ ছেয়ে ফেলতে পারে। এখন

অবশ্য ছেয়ে নেই, বিনুনির সাপ দুটিকে ও খোঁপার ঝাঁপিতে বন্ধ করে ফেলেছে। কাছে থেকে না দেখলে তো আমি টের পেতাম না যে, ওর থুতনির নীচে ছোট্ট একটি তিল আছে। কোমরটা একটু বেঁকিয়ে জানলার দিকে হাত রেখে ও যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দেখতে ভাল লাগছে। যেভাবে আছে, ও ওইভাবেই থাকুক, আমি ওকে ছোঁব না, ধরতে চাইব না। আকাশ জুড়ে যখন চাঁদের আলোর বাঁধ ভাঙে, তখনও তো চেয়ে চেয়েই দেখি, তাকে কি ছুঁতে চাই, না হাতের মুঠোয় বন্দী করি! দুর্বা ঘাসে হাত দিলেই তার গজমোতি শিশির ঝরে পড়বেই।

তার তখনই লতাকে মনে পড়ল। সেই যে চাপা নাক, ছোট তিল যেন সব-সময়েই-সাবানে-ফাঁপানো ঈষৎ বাদামী চুলের রাশি, আর ঘন জ্রর মাঝখানে স্থিরায়ত দুটি চোখের মণি, চকচকে মাজা রঙ, পালিশ-করা ব্রাউন চামড়ার মত।

লতাকে মনে পড়তেই সৌর অস্থির হয়ে উঠল, লতা সেই মেয়ে যে তাকে কয়েকটি উত্তেজিত মুহূর্তের সান্নিধ্য ছাড়া কিছু দেয় নি, অথচ নিয়েছে অনেক। অনেক? প্রকৃতপক্ষে কতখানি? ভেবে কূল পেল না সৌর, বলে উঠল, যেন নালিশ করছে এমন সুরে, "জান মায়া, লতা আমাকে ভালবাসে না।"

মায়া বলল, "জানি।" জানে? কত জানে এই মেয়েটা, আরও কী জানে! সৌরর মনে হল, একদৃষ্টে মায়া ওর দিকে চেয়ে আছে. অপলকে ওকে লক্ষ্য করছে। কেন, ওকে কি বাজিয়ে দেখতে চায়? সৌরকে বিচার করবে এই একরত্তি একটা মেয়ে? ওর কতখানি সাহস? এ অধিকার ওকে কে দিয়েছে? সৌরই তো। রোজ সন্ধ্যায় আলো জ্বেলে ওকে চিঠি লিখত মনে নেই? সে-ই আজ সময় বুঝে এসেছে, তোমার ভালবাসার মাপ নেবে।

কী মাপ, কিসের মাপ, জোরে জোরে মাথা নেড়ে সৌর বলল, কোন মাপ আমি দেব না। ওকে যখন চেয়েছি, চিঠি লিখেছি, তখনও বলতে কি, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখি নি আমি, এর রীতিনীতির প্রায় কিছুই জানতুম না। তাই ঢের ছেলেমানুষি করেছি—তোমাকে আমার চিঠি লেখার সখী করতে চেয়েছি। পাওয়ার সংজ্ঞা আমার কাছে কী নিরস্থি-নীরক্ত ছিল! আজ তো আমি জানি, পাওয়া কত নিবিড়, কী সর্বনাশী সর্বগ্রাসী! রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘের মত আজ আমি লোভী।

আমি এখন এই মুহূর্তে লোভ করছি তোমাকেও। তুমি, যাকে এতদিন দূরে রেখে, দূর থেকে ভালবেসে এসেছি। কে জানে, হয়তো লোভ করছ

তুমিও। ওই যে খানিক দূরে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছ, এটাও তোমার ছলনা। তুমি চাও, আমি উঠে পড়ি, তোমাকে ধরতে হাত বাড়াই। নইলে এই নিষুতি রাতে আসার আর কী মানে হতে পারে! আসবে, অথচ ধরা দেবে না, এ কেমন খেয়াল তোমার!

আমি তোমাকে ধরতে পারি—পারি, পারি পারি। তিনবার শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করে সৌর যেন তার সংকল্পটাকে কঠিন করল। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র, দৃঢ় হল হাতের মুঠি। সৌর বিছানায় সোজা হয়ে বসল।

মায়া তখনও হাসছে।

হাস, আর এক মুহূর্ত বই তো নয়। এখুনি আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি জান? তোমার ওই ছলনাভরা মুখে আমার বুকে নুইয়ে আনতে পারি। পাওয়ার মানেটা আমি পুরোপুরি জেনে নেব। শুধু চোখ আর কতটুকু পায়! নাসিকা, কর্ণ, স্পর্শ—আর সব শরিকেরাও আছে না? তারাও তাদের ভাগ বুঝে নেবে। আমি তোমার বুকে কান পেতে হৃৎস্পন্দের ধ্বনি শুনব, সেই ধ্বনিকে ঈর্ষাও করব, কেননা ও তোমার অন্তরের অন্তস্তলে থেকে উঠে আসছে, সেখানে তো আমি পৌঁছতে পারি নি। আমার নাক যখন ঘ্রাণ নেবে তোমার কেশগুচ্ছের, তখনও তাকে আদরের সঙ্গে সঙ্গে হিংসাও করবে। কেননা, তোমার চুলের মূলও যে গভীরে, সেখানে আমি নেই। আমার স্পর্শ দিয়ে তোমার ত্বকের শুধু ওপরের পরশটুকু পাব।

পাবই। সৌর বলল দাঁতে দাঁত চেপে। ওই শিকটাকে ধরে আছ বলেই তুমি নিরাপদ, এমন কথা ভেবো না।

সৌর বিছানা ছেড়ে বুঝি উঠেও পড়েছিল, এগিয়েছিল টলতে টলতে, কিন্তু মায়া ওখানে ছিল না। আর কিছু মনে নেই।

*　　　　*　　　　*

পরদিন, আর কোনদিন, সৌর পাশের বাড়ির জানলার দিকে চাইতে পারে নি। একটা লজ্জা আর গ্লানিবোধ ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে অবশ করে ফেলেছিল। আয়নার দিকে চেয়ে সৌর চোখের কোলের কালি দেখছিল, আর বলছিল, কাল রাত্রে আমার সব গেছে। মায়াকে আমি হারিয়েছি।

না, মায়া যে আসে নি, মায়া যে কখনও ওখানে ছিল না, সবটাই যে সৌরর কল্পনা, তাতে ভুল নেই। মায়ার আসাটা ভুল হতে পারে, কিন্তু সৌর যে তাকে পাবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, তাতে তো কোন ভুল নেই।

আর সেই লোভই তার কাল হল। দূর থেকে দেখার, চিঠি-লেখার অলস বিলাস দিয়ে সূক্ষ্ম, প্রায়-অদৃশ্য যে সম্পর্কের উর্ণাতন্তু সে রচনা করেছিল, তা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল।

লতা গেছে, মায়াও রইল না। কী থাকল তবে? কিছু না। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিল সৌর, কেন, আমি ওকে ওভাবে পেতে গেলুম! অনুক্ষণের চাওয়া দিয়ে, ভাবনা মিশিয়ে একটি পাওয়ার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি গড়ে তুলেছিলুম, তাকে কেন কাদামাটির প্রলেপ দিতে গেলুম? কেন আমাকে এমন নেশায় পেল, কেন, কেন?

সেই কারণটাও সৌর অবশ্য জেনেছিল, তার ক্ষোভের অবধি ছিল না। সেই কারণটাও লতা। লতা তাকে ঠকিয়েছে, এতক্ষণ তাই নিয়ে দুঃখ ছিল মনে, কিন্তু লতাই মায়াকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। সৌর আক্রোশে থরথর করে কাঁপছিল। নারীকে কামনা করার একটা অর্থই আমার কাছে স্পষ্ট ছিল, সে অর্থটা বিদেহী, লতাই তাকে শরীর দিল। তাকে স্থান আর কালের খাঁচায় পুরে ছোট করে ফেলল। সেই সঙ্গে স্থূলও। তাকে ওভাবে পেলুম বলেই তো মায়াকেও একই ভাবে পেতে গেলুম। লতা একদিন ওর ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমার চোখ চেপে ধরেছিল, সেদিন থেকে আমার দৃষ্টিই বিকৃত হয়ে গিয়েছে, সব মেয়েকেই আমি লতার মত দেখছি। পুরুষ আর রমণীর একটা সম্পর্কই আমার কাছে স্পষ্ট, সত্য, আর সব মিথ্যে হয়ে গেছে।

ওকে ভালোবাসা না দিয়ে লতা ঠকিয়েছে, এতক্ষণ সেই যন্ত্রণাই ছিল। এবারে সৌর অনুভব করল তার চেয়েও কত বড় ক্ষতি লতা তার করেছে। জীবনে কোন মেয়েকেই সৌর আর অন্য চোখে দেখবে না, দেখতে পারবে না। মায়াকে, মায়াদের, লতাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। পাওয়ার যে গলিটা অপরিসর অন্ধ, সৌর সেটাই চিনল। শুধু চাওয়ার না-পাওয়ার আকাশটা যে আরও বড়, অপার, সৌরর অনুভবে তা রইল না।

সৌরর অনেক সাধের মধ্যে একটি এই ছিল যে, অনেক উপরে উঠে এই পৃথিবীটাকে কেমন দেখায়, তাই দেখবে। চিল যেমন দেখে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পূর্বে এদেশের আকাশে যন্ত্র-পক্ষীর চিৎকার এমন অহরহ শোনা যেত না, তাই বিমানের কথা তার মনেও হয় নি। কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি তখনও স্বপ্নের অগোচর ছিল। চিলের মত উপরে উঠে, চিলের মত স্থির সন্ধানী

দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখবে, সৌর ভেবেছিল, অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। দিন-রজনী, সন্ধ্যা-সকাল জুড়ে। আসলে কিন্তু কতক্ষণ তার হিসাব থাকারও কথা নয়, কেননা, দিন-রাত্রির মাপে তো শুধু এই পৃথিবীরই সময় ছোট-ছোট চৌকো ঘরে কাটা, অথবা সময়কে যদি বিপুল একটি বৃত্ত বলে কল্পনা করি, তবে গোল-গোল বৃত্তচাপে, যেখানে উদয় নেই, অস্ত নেই, সেখানে সময়ও অপরিমেয়। নিরন্তুভব, অতএব তার অতি ধীর আবর্তনও প্রায় অলক্ষ্য।

সেখানে গিয়ে কী দেখতে চাইত সৌর? এই পৃথিবীকেই। সে কেন বদলায়, কেমন কেমন করে বদলায়, কতখানিই বা বদলায়, এই সব তার ধারণায় আনবে বলে। নিজের ভিতরে কিছু-কিছু পরিবর্তন তার নিজের কাছেই ধরা পড়ছিল, শুধু সে বুঝতে পারছিল না, পরিবর্তনটা ভাল, না মন্দ, বা এর জন্য সে নিজে কতখানি দায়ী। পরিবর্তনের স্বরূপ কী, সে নিজেই বা কী, এই জিজ্ঞাসার জবাব না পেয়ে সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছিল। কারও কাছ থেকে যে জেনে নেবে, সে-উপায়ও ছিল না, কারণ তার পরিচিত কাউকে এই জিজ্ঞাসা যন্ত্রণা দিয়েছে বলে মনে হয় নি।

শূন্য থেকে এই পৃথিবীর ওপর সময়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। মেঘে মেঘে কোন্ রঙ কখন জ্বলে, ঘাস কেন পিঙ্গল হয়, মরে মরে আবার বাঁচে, সবুজ হয়। প্রাণের আরও বিচিত্র লীলা সৌরর চোখে পড়ত। আবার এও হতে পারে, সৌর তখন জানতে পারত, এই চরাচর ব্যাপ্ত করে একটিই মাত্র বিপুল প্রাণ আছে, তার নাম সময়। অসংখ্য কোষ দিয়ে যেমন জীবদেহের সৃষ্টি, ব্রহ্মাণ্ড-সময় তেমনই অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের সমষ্টি। বিপুল জলধির তলে ছোট-ছোট নুড়ির মত এরা চুপ করে আছে। জল নড়ে বলেই মনে হয় নুড়িও নড়ে, আসলে তারা স্থির। সময়ের অভ্যন্তরে সূর্য-গ্রহ-ইত্যাদিরও তেমনই সত্যিকার কোন গতি নেই। গতিকল্প যে-বস্তুটা আছে, অতিমাত্রায় সীমিত বলে তার কোন অর্থ, কোন তাৎপর্য নেই।

এই অস্পষ্ট বোধগুলিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করবে, সৌরর এই বাসনা ছিল। বাসনা পূর্ণ হয় নি। যে-কারণে পর্বত বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে পারে না, তরুশ্রেণীর পাখা মেলে না, সেই কারণেই। সৌর বড় জোর উঁচু একটা গাছের ডালে বসে নীচের মাটির দিকে চাইতে পারে, কিংবা চিলে-কোঠায় উঠে দেখতে পারে, দিগন্ত আরও কতখানি ছড়িয়ে গেল। যদি পাহাড়ে উঠি, সৌর ভাবত মনে মনে, এই দিগন্ত আরও ছড়িয়ে যাবে। জ্যোতির্লেখার একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত আমাকে বেষ্টন করে থাকবে।

বিকেলের দিকে রোজই সৌরর মাথায় যন্ত্রণা হত। লতা বউদিদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাবার পর, বিজন প্রবাসী হবার পর, আর বাইরে যেতে ইচ্ছে হত না। সৌর চুপে চুপে ছাদে উঠে অনেকক্ষণ একা বসে থাকত। দেখত সব পাখি ঘরে ফিরছে বেশীর ভাগই দলবদ্ধ, কে যেন হাওয়ায় একের পর এক হালকা হার ভাসিয়ে দিয়েছে। ওরই মধ্যে কোন-কোন পাখি আবার দলছাড়া, একা। সৌরর চোখ তাকেই অনুসরণ করত। কোথায় গিয়েছিল ও? পাখিরা কোথায় যায়? খাবার খুঁজতে। এই একলা-পাখিটা বোধ হয় ক্লান্ত, তাই দলছাড়া হয়ে পিছিয়ে পড়েছে। কিংবা এ-ও কি সম্ভব যে, এই পাখিটা আসলে খাবার খুঁজতেই যায় নি, শুধু অপরিমাণ শূন্যকে পান করবে বলেই বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিল? অনেক দূর ঘুরে এল ও, দেখল, কূল নেই, পার নেই, এই অপার আকাশে আর কোথাও নিশ্চিত ঠিকানা নেই, তাই যে-ঠিকানাটা সে জানে, যে-ঠিকানাটা নিশ্চিত নিরাপদ ধ্রুব, সেই ছোট্ট বাসার দিকেই ফিরে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে সৌরর নজরবন্দী আকাশটা কুমোরের চাকের মত ঘুরত, চোখ বুজে ফেলত সৌর, কার্নিশটা ধরে সামলে নিত।

এই ভাবটা মাস তিনেক স্থায়ী হয়েছিল। এর পরই ওরা নতুন বাসায় উঠে আসে।

সেখানে সৌরর জন্য আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে ছিল।

ছাদে না উঠলে এত তাড়াতাড়ি জানাজানি হত না। এ-বাড়িতেও ছাদ কেমন, পরখ করবার জন্যে সৌর প্রথম দিনই উপরে উঠেছিল।

ছাদটা বেশ বড়, সৌর দেখল, এখনও ধুলোবালি জমে আছে। একটু সাফ করে নিয়ে গোটাকতক টব বসালে চমৎকার হবে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলিও।

ঠিক তখনই সৌর দেখতে পেল।

ছাদটার মাঝখানে গলা-সমান উঁচু একটা গাঁথুনি। ও-পাশে কী আছে? বাড়িটার দুটি অংশ। অন্য দিকে অন্য বাসিন্দা আছে। তারা কারা?

সৌরর কৌতূহল হল। গাঁথুনির দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমে চোখে পড়ল কার্নিসে-মেলে-দেওয়া থান দুই শাড়ি, অস্থির অভব্য হাওয়া কেবলই তাদের বিব্রত করছিল। তারপর সৌর দেখল, কালো চুলের রাশি।

ছাদে মাদুর পেতে, রোদে পিঠ দিয়ে দুটি মেয়ে কড়ি খেলছিল। ছোট ছোট আঙুল দিয়ে ওরা কড়িতে-কড়িতে ঠোকাঠুকি করছিল। মাঝে মাঝে সবগুলো

তুলে ছড়িয়ে ফেলছিল। কত দান পড়ল! ঝুঁকে পড়ে একজন বলল, "চার।"

"তবে তো ভাই আমার হাত খুলেছে।"

"হাত বরাত, সবই তো তোর খোলা। চাপা শুধু আমাদের।"

একটি মেয়ে হাই তুলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই দীর্ঘশ্বাসটা বোধ হয় কপট। এরা আস্তে আস্তে কথা বলছিল, মাঝে মাঝে খিল-খিল করে হাসছিল। সৌর সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না। যা শুনছিল, তারও সব মানে বুঝতে পারে নি।

একটু বিশ্রীও লাগছিল। মেয়ে দুটির হাতের আঙুলে লাল ছোপ। ওরা বুঝি খুব পান খায়? মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, নইলে সৌর ঠিক ধরে ফেলত। গায়ে ওদের খাটো জামা। পিঠের অনেকটাই খোলা।

একবার একটা কড়ি এদিকেই ছিটকে পড়ল। মেয়ে দুটি ফিরে চাইল, দুজনেই একসঙ্গে। পালাবার সময় ছিল না—সৌর তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিল। শুনল, একটি মেয়ে বলছে, "মরণ!"

বলার ধরনটা কিছু অদ্ভুত, গলাও কেমন ভরা-ভরা, ভারী-ভারী। এই পরিচিত শব্দটি শুধু উচ্চারণভঙ্গির জন্য সৌরর কানে অপরিচিত ঠেকল। এভাবে কথাটাকে তাদের পরিবারে কেউ বলে না। এরা বলে। এরা কারা?

মেয়ে দুটি আবার খেলছিল, মাঝে মাঝে এদিকে ফিরে মুচকে হাসছিল। ওরা কি তাকে ঠাট্টা করছে? সৌর বুঝতে পারছিল না, ওর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, কিন্তু রোদের জন্য নয়।

একটি মেয়ে বলল, "ঘুম পাচ্ছে।" সে হাই তুলল।

আর-একজন বলল, "আজ চিত্তবাবু আসবে।"

"ঘুমতে দেবে না।"

অন্য মেয়েটি বলল, "ইস্!"

সৌর এ-সব কথার মানে বুঝতে পারছিল না। ভাবছিল, সরে আসবে, ঠিক তখনই ও-দিকের চিলেকোঠার দরজায় মধ্যবয়সী একটি স্ত্রীলোককে দেখা গেল। তার রঙ ময়লা, থপথপে চেহারা। মাত্র দুটি গামছায় অত বড় আর ভারী শরীরটাকে ঢেকেছে। খোনা গলায় সে বলে উঠল, "এখনও খেলছিস, ঘুমবি কখন মেয়েরা?"

একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি কড়ি ফেলে উঠে দাঁড়াল। আর-একজন হাসতে হাসতে বলল, "আজ ঘুমব না।"

"বিকেলে গা ধুতে হবে না ?"

"ধোব না।"

"চুল বাঁধা-টাঁধা সব পড়ে থাকবে ?"

করতালি দিয়ে মেয়েটি বলে উঠল, "সব।" কিন্তু সৌর দেখল, সে-ও মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটির পিছে পিছে চিলেকোঠার ভিতরে অদৃশ্য হল।

নেমে এল সৌরও। এরা কারা ? যাদের ভাব বোঝা যায় না, ভঙ্গিও না, সংলাপও কানে কেমন যেন ঠেকে, তারা একটু আলাদা ধরনের সন্দেহ নেই, কিন্তু সঠিক পরিচয়টা টের পেতে সৌরর আরও কয়েকদিন লেগেছিল।

সৌর পরদিনও ছাতে উঠেছিল। কতটা স্বেচ্ছায় বলা কঠিন, দুর্বারণ একটা কৌতূহল বা টান তাকে টেনে এনেছিল।

ক্লাস বিকালে, আগে সৌর তবু প্রথম দিকেই কলেজে চলে যেত, কমন-রুমে বসে বই বা কাগজপত্র পড়ত। সেদিন বলল, 'এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোন মানে হয় না, কমন-রুমে খালি হৈ-হুল্লোড়, ভিড়, ওখানে কোনও কাজ করা যায় না, তা ছাড়া ও-ঘরটায় রোদ পড়ে না, শীত-শীত করে।'

সৌর বলল, মানে নিজেকে বলল, যেন কড়া মনিব একজন ভিতরেই আছে, তাকে কৈফিয়ত দিল। এই মনিবের নাম, গুরুজনদের মুখে শুনে শুনে সৌর অনুমান করেছিল, বিবেক। তাকে কখনও দেখে নি, তাকে দেখাও যায় না, কেননা, সে অন্তরালবর্তী, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, একটা পর্দার আড়ালে বসে সে।

না, কোন হুকুম করে না, কৈফিয়ত-তলব না। শুধু মাঝে মাঝে এক-একটা প্রশ্ন করে বসে। দুরূহ প্রশ্ন। মর্মভেদী, জবাব দিতে গিয়ে সৌরর অন্তস্তল অবধি কেঁপে ওঠে।

সৌর তাকে এড়াতে চায়। এলোমেলো, অবান্তর কৈফিয়ত দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রাখতে চায়। তার হাতে থেকে রেহাই পাবার অছিলাও খোঁজে। দুষ্টু ছেলেরা যেমন মা ঘুমিয়েছে কি না আড়চোখে দেখে নিয়েই পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করতে ছোটে। সৌরও সেইভাবেই তার বিবেককে ফাঁকি দিতে চাইত, ভাবত, এই তো একটুখানি মাত্র, ও কি আর টের পাবে?

আশ্চর্য, টের পেত কিন্তু। পর্দার আকাশবাসী মানুষটার চোখ দুটি ভয়ঙ্কর রকমের সজাগ আর তীক্ষ্ণ, সব দেখত, তখন হয়তো কিছু বলত না, কিন্তু পরে অনেক রাত্রে সৌর যখন বিছানায় এসে একলাটি শুয়ে পড়েছে, তখন কড়া গলায় প্রশ্ন করত। কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে যেত সৌর—আসামী মন তোতলামি করত জবাব দিতে গিয়ে। বলত, কই, আমি—আমি তো—

কখনও মিছে কথাও বলত। জিহ্বার জড়তাকে জয় করে, গড়গড় মুখস্থ বলার সুরে। জানত, ধরা পড়ে যাবে, পার পাবে না, তবু বলত। যার চোখ দুটির নজর এত তীক্ষ্ণ, তার কান দুটিও অবশ্যই সজাগ হবে, এ-কথা জেনেও বলত।

এই বিবেক কম-বয়সে সৌরকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছে। মাঝে মাঝে সৌরর মন বিদ্রোহ করত। বলত, 'মানি না, তোমাকে মানি না আমি।' কখনও বলত, 'তুমি নেই। যেটা আছে, সেটা আমার ভীরুতা। আমার ভিতু মন যেমন ভূত সৃষ্টি করে এখন তাকেই ভয় পায়, তেমনই ভয় পায় ভূতের দোসর বিবেককে। কখনও বা ভাবতে ভাবতে সৌরর হাতের আঙুল কঠিন হত। বিড়বিড় করে সে বলত, 'যে ভাবে ভূতের ভয়কে জয় করছি, সেই ভাবে ওকেও জয় করব। দূর করব। মারব, ওকে মারব আমি।'

তন্দ্রার ঘোরে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির হয়ে, সৌর কতদিন সেই ছায়াসত্তার গলা টিপে ধরেছে। ভেবেছে, 'মেরেছি, আমার বিবেককে মেরেছি আমি। এখন আমি স্বাধীন। পাপ-পুণ্য যা খুশি করব, কেউ জবাবদিহি করতে বলবে না। নিশ্চিত হয়ে সৌর জুড়নো স্নায়ুদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তবু পরদিন আবার মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই বিবেকের সঙ্গে। সেই রূঢ় ছায়াকণ্ঠ শুনে ওর শরীরে কাঁটা দিয়েছে। মরে নি, মরে না অথবা মরে-মরেও বার বার যে বেঁচে ওঠে, তারই নাম বিবেক, সৌর উপলব্ধি করেছে।

অতএব সেদিন ছাদে ওঠবার আগে যে-বৈরী মরেও মরে নি, তাকেই সৌর বলল, 'আমি ছাদে নিরিবিলিতে বসে পড়ব বলে যাচ্ছি। এই ঘরটা ঠাণ্ডা, রোদে পিঠ দিয়ে বসব।'

সে-দিনও ওরা ছাদে ছিল, ওরা খেলছিল। সৌর শব্দ করেই ছাদে উঠেছিল, ওরা তাকায় নি। কাক তাড়ানোর ছুতোয় সৌর একবার ছোট একটা লাঠি তুলে ঠুক করে আওয়াজ করল, ওরা তবু ফিরে চাইল না। যেমন খেলছিল, তেমনই খেলতে থাকল। সৌর অপমানিত বোধ করল, সৌর রেগে উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা টের পেয়েছে সৌর ওপরে এসেছে, ওরা দেখতেও পেয়েছে। নিশ্চয় ওদের পিঠেও দুটি লুকনো চোখ আছে, কোঁকড়ানো কালো ভিজে চুলের আড়াল থেকে সেই চোখ দুটি সৌরকে লক্ষ্য করছে।

কড়িগুলো একটা আর-একটার সঙ্গে লাগছিল, ঠোকাঠুকির ফলে টক-টকাস শব্দ হচ্ছিল, সৌর শুনছিল। তন্ময় হয়ে ওরা খেলছে। ভারি তো খেলা, আমিও খেলতে পারি, সৌর বলল আপনমনে, যে কাকটা তখন কোনখানে নেই, তাকে তাড়াতে আবার লাঠি নিয়ে দৌড়ে গেল। কার্নিস থেকে ঝুঁকে দেখল, এ-বাড়ির ছায়া ও-বাড়ির দেওয়াল বেয়ে বেয়ে কতখানি উঠেছে।

ওরা তখনও তাকাল না। ছন্দের তালের মত নিয়মিত দান পড়তে থাকল, অনেকক্ষণ ধরে, শুনতে শুনতে সৌরর মনে হল, যেন কতক্ষণ ধরে একটানা বৃষ্টি পড়ছে, এই টুপটাপ কখনও শেষ হবে না।

বোবা দুটি মেয়ে কী খেলছে? সৌরর সহসা মনে হল, মেয়ে নয়, ওরা ডাইনী। ডাইনী বলেই ওদের মুখে 'রা' নেই। ভরা দুপুর, তবু সৌরর কেমন ভয়-ভয় করে উঠল, কড়ি তো মেয়েরা বাজি রেখে খেলে, ওদের বাজি কী? কে জানে, বাজি হয়তো সে নিজেই। সৌরকে পণ রেখে নির্বাক দুটি মেয়ে জুয়া খেলছে। যে জিতবে, সৌর তারই।

একজন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, সে জিতেছে। সৌর তার। সৌর তার? মাথা ঘুরছিল, সৌর ভয় পেয়েছিল, সৌর পিছনে সরে সরে ছাদের কার্নিসে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল

ওই যে রোগা মেয়েটা হঠাৎ পিছন দিকে তাকাল, যার চোখে সুর্মা-আঁকা, যার হাতে লাল গালার বালা, সৌর তার? না না, সৌর অস্ফুট গলায় বলে উঠল, না। আমি ওর না। ওর নাকটা কেমন যেন, ওর চাউনি কেমন যেন, সুর্মা লেগেও সুন্দর হয় নি, আমি ওর হতে পারব না—আমি ওর হতে পারব না। আমি তবে কার—কটকটে ফরসা ওই থপথপে মেয়েটার? ওর চোখ কটা, ওর নাকে নাকছাবি, ওর হাতে উল্কি, আমি ওরও হব না।

আমি তবে কার?

ভাবতে ভাবতে, কাঁপতে কাঁপতে সৌর ধুলো-ছড়ানো ছাদেই বসে পড়ল, সম্বিত আর রইল না।

তখনও ওদের খেলা চলছে।

যে মেয়েটার চোখে সুর্মা, হাতে লাল গালার বালা, সে কোঁচড়ে কতকগুলো তেঁতুল-বিচি নিয়ে বসেছে। জোরে জোরে নেড়ে বলছে, "বল্ তো, জোড় না বিজোড়?"

ফরসা মেয়েটা, যার হাতে উল্কির ছাপ, নাকে নাকছাবি, সে ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল, "জোড়।"

অমনই রোগা মেয়েটা তার হাতের মুঠি খুলে হেসে উঠল। "বিজোড়। পারলি নি।"

অন্য মেয়েটি এবার বলল, "এবার আমি, এবার আমি। জোড় না বিজোড় ?"

"বিজোড়।"

হাত খুলে ফরসা মেয়েটি বলল, "ঠিক বলেছিস তো ? কী করে ঠিক বললি, ভাই ?" বলতে বলতে সে তার সখীর গলা জড়িয়ে ধরল।

গালার-বালা-পরা মেয়েটি মুখ-ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, "মরণ !" ঠিক আগের সুরে, যে-সুর সৌরর কানে বিশ্রী লেগেছিল।

"বল্ না ভাই, তোরটা কী করে ঠিক হল ?" আধো-আধো আবদারের সুরে অন্যজন বলল।

"আন্দাজে। আমাদের বিজোড় তো হবেই, জোড় জোটাব কোথা থেকে, বল্ ?"

আকাশের দিকে চেয়ে একটি মেয়ে বলল, "আজ বিষ্টি হবে। যা মেঘ করেছে !"

"আমি বলছি, বিষ্টি হবে না।"

"বাজি ?"

"বাজি। কত দিবি ?"

একসঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠে ওরা আবার খেলায় মন দিল। 'আমার দিকে ওরা তাকাবে না,' সৌর বলল, 'অথচ আমার অদৃষ্ট নিয়ে রোজ খেলবে। এরা কারা ? এই নিষ্ঠুর দুজন মায়াবিনীর পরিচয় কী ?'

ওদের টুকরো টুকরো কথা তখনও কানে আসছিল।

"ওই চিলটা এবার সামনের এই ছাতেই বসবে।"

"না, ওই ছাতে।"

"আমি বলছি এই ছাতে। বাজি ?"

"বাজি।"

অবসন্ন দেহ নিয়ে সৌর অনেকক্ষণ পরে নীচে নেমে এসেছিল।

মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি সেদিনও ছাদে এসেছিল, ফিসফিস করে কী যেন

বলেছিল মেয়ে দুটিকে, ওরা কাঠবিড়ালির মত তরতর করে নীচে চলে গিয়েছিল।

তারও প্রায় এক ঘন্টা পরে সৌর অপরিচিত মোটা গলায় আবৃত্তি শুনতে পেল। প্রথমে মনে হয়েছিল কবিতা। পরে মন দিয়ে খানিক শুনে সৌর বুঝতে পারল, কবিতা নয়, নাটক। কেউ থিয়েটারের পার্ট করছে।

লোকটা থামল। হাততালি পড়ল। শ্রোতারা তারিফ করছে।

লোকটিকে সৌর বলতে শুনল, "এ বইটা ডায়না থিয়েটারে নেবে। কথা ঠিক হয়ে আছে।"

"আমরা পার্ট পাব না? ও নিশিবাবু, বলুন না, আপনার প্লে-তে আমাদের পার্ট দেবেন কি না?"

মেয়ে-গলায় কে যেন জিজ্ঞাসা করল, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "দেব।"

"কবে দেবেন?"

"রোস, রোস। থিয়েটারের ম্যানেজারকে বলি আগে।"

"কবে বলবেন, কাল?"

"অত তাড়াতাড়ি কী হয়?"

"তবে পরশু?"

"আচ্ছা।" কতকটা বিব্রতভাবে, কতকটা যেন রেহাই পেতেই লোকটি যেন বলল, "আচ্ছা।"

"উঁহু, মুখে বললে হবে না। পিতিজ্ঞে করুন, ও নিশিবাবু, আমাকে ছুঁয়ে আপনাকে পাকা কথা দিয়ে যেতে হবে।"

"ছুঁয়েই তো বলছি।"

"ছাই। নেহাত দায়-সারা ঢঙে বলছেন। মিছে কথা বললে দেখবেন, আমি ঠিক মরে যাব। অবিশ্যি, আমি মলে আপনার কী আসে-যায়?"

"সব যায়, নয়ন।" লোকটা ধরা-ধরা গলায় বলল, একটু আগে যেভাবে থিয়েটারের পার্ট বলছিল, তেমনই আবেগ মিশিয়ে দরদ দিয়ে, "সব যায়, নয়ন।"

আর তখনই সৌর টের পেল, একটি মেয়ের নাম নয়ন। কোন্‌টির? যার হাতে উল্কি—তার, না, যার নাকে নাকছাবি-তার? সৌর অনুমান করল, যার চোখ দুটি ঢলঢল, তার নামই নয়ন হবে। চোখ বুজে সৌর ভাবতে চেষ্টা করল, কার চোখ বেশী ঢলঢল।

প্রতিবেশী কারা সৌর জানত না, তাই নতুন বাসায় ওর কৌতূহলে, কল্পনায় একটুখানি রহস্যের ছিটে লেগেছিল। খানিকটা মাধুর্য আর মমতা দিয়ে মেয়ে দুটিকে ওর ভাবনা ঘিরে রেখেছিল।

আরও কিছু কাল পরে যখন ওই বাসা ছেড়ে আসে, সৌরর মনে তখন মমতা বা রহস্যের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

ওদের ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সৌরর খারাপ লেগেছিল ; সৌর আঘাত পেয়েছিল।

তখনকার ভাল বা খারাপ লাগার রীতিই আলাদা ছিল। সময় বয়স ইত্যাদির সঙ্গে ওটা আপনা থেকেই বদলে যায়। খুব কম বয়সে মাটিতে পড়ে গেলে বা খিদে পেলে আমরা কেঁদেছি। আমাদের হাসানোর জন্য কাতুকুতুই যথেষ্ট ছিল। (হাসিও মানসিক ক্রিয়ার ফল, না কয়েকটি পেশীর কুঞ্চন-প্রসারণ?) সঙ দেখে আগে হাসি পেত, এখন পায় না কেন? আগে আমি কত সহজে কাঁদতে পারতাম, এখন পারি না কেন? তার মানে কি এই যে, আমি আগে যতটা সজীব ছিলাম, এখন ততটা নেই? সৌর প্রশ্ন করত নিজেকে, ভাল আর খারাপ লাগার রহস্যের অন্ত পেত না? ওরা তারই মনোজাত, দেহলীন, কিন্তু অশাসন প্রজার মত, কাউকে কাজের কৈফিয়ত দেয় না।

কোন মেঘলা দিনে সারাদিন ঘুমিয়ে উঠে বিকেলটাকে যদি ভোরের মত লাগে, আমার মন খুশী হয়, নেচে ওঠে। আমি জানি না কেন। আবার বৃষ্টির জন্য যদি কোনদিন বাড়িতে বন্দী থাকতে হয়, যদি জানলায় বসে বসে দেখি, মরা বিকেলটাকে রাত্রি হঠাৎ এসে ঢেকে দিল, আমার দুঃখের অবধি থাকে না। কেন? সে কি জীবনে একটা সন্ধ্যা কম দেখতে পেলাম বলে? এই ছোট্ট একটা লোকসানের শোকে? জানি না।

জানি না, ম্রিয়মান সৌর বলত, আমার মনের কোন খবর আমি রাখি না।

ওদের ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সৌরর খারাপ লেগেছিল।

ওরা বসে ছিল, ঠিক সন্ধ্যার মুখে, রকে পা ঝুলিয়ে। যার হাতে গালার চুড়ি, সে। যার হাত উল্কি, সে-ও। একজনের নাম তো সৌর জানে, নয়ন। আর-একজনের নাম কী? একজনের পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, অন্যজনের নীলাম্বরী। দুজনের কারও জামারই হাতা নেই। এ-সব সৌর লক্ষ্য করে

দেখছিল তা নয়, ছবিটা আপনা থেকেই এক লহমাতেই ওর মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। অনেক কবিতা একবার পড়লে যেমন মুখস্থ হয়ে যায়, এ-ও তেমনই।

সৌর আলাদা করে ওদের দেখছিল না, হাতের বালা না, উল্কির ছাপ না, হাত-কাটা ব্লাউজ না, টকটকে লাল শাড়িও না। সৌর ওদের বসে থাকাটাই দেখছিল। আরও ভাল করে দেখবার লোভে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে বসেছিল।

লালশাড়ি মেয়েটার কোলে একটা বিড়াল ছিল, তার রোঁয়াগুলোয় লালচে ছোপ—হোলির দিনে কেউ রঙ দিয়ে থাকবে। বিড়ালটা ককিয়ে ককিয়ে তাই দুঃখ জানাচ্ছিল, আর মেয়েটি ওর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছিল, "কেঁদো না সোনা, কেঁদো না মানিক, এই বোশেখেই ঘটা করে তোর বিয়ে দেব।"

বিড়ালটা তবু থামছিল না, থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল।

আর-একটু দূরে ওই রকেই পা ঝুলিয়ে বসে যে মেয়েটি বিড়ি টানছিল, সে থেকে থেকে কাশছিল আর হাসছিল।

"হাসছিস যে?"

'তোর রকম দেখে।"

"রকমটা আবার কী দেখলি?"

"বেরালের আবার বিয়ে?"

অন্য মেয়েটি রেগে উঠল: "দেবই তো, বিয়ে দেবই তো আমি। এই বোশেখেই ঘটা করে বিয়ে দেব, কত লোকজন ডেকে খাওয়াব দেখিস।"

তার সখী বিড়িটা ফেলে দিয়েছিল, তখন আর কাশছিল না শুধু হাসছিল।

"তবু হাসছিস?"

"তোর সাধের কথায়। বেরালের বে দিবি কেন? তোর নিজের বে কোনদিন হবে না বলে? নিজের শখ পরকে দিয়ে মেটাবি?"

কোলে যার বিড়াল ছিল সে রাগ করে বলল, "মুখপুড়ি!" আসলে রাগ করে নি। পরে সে নিজেই হাসতে লাগল, যে-বিড়িটা নিবেও নেবে নি উঠে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটাকে থেঁতলে দিয়ে ফের রকে উঠে বসল।

বলল, "তুই হাসছিস, কিন্তু দেখিস কনে হলে ওকে কী চমৎকার মানাবে!" বলে লাল আঁচলের কোণা দিয়ে বিড়ালটাকে ছোট একটা ঘোমটা পরিয়ে দিল।

গৃহবধূ হতে বিড়ালটার বোধ হয় কিছু আপত্তি ছিল, কেননা সে সঙ্গে-সঙ্গেই লাফিয়ে রাস্তায় পড়ল। মেয়ে দুটি এল পিছে-পিছে, তারাও রাস্তায় নামতে যাচ্ছিল কিন্তু সৌরকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

একজন ইশারায় কী বলল আর-একজনকে। জুতোর ফিতে বাঁধা কখন শেষ। সৌর এখন দেয়ালে 'জ্বরের যম' লেখা বিজ্ঞাপনটা পডছিল বা পড়বার ভান করছিল, কান গরম হয়ে উঠেছিল, ছুটে পালাবার শুধু একটা অছিলা খুঁজছিল সৌর।

একজন বলল, "সাহস পাচ্ছে না।"

অন্যজন বলল, "ডাকি?"

"সাহস আছে?"

"সাহস না থাক্, জোর আছে। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনেও আনতে পারি।"

"খুব যে বড়াই, আন্ তো?"

"বাজি?"

"বাজি।"

ছাতে যারা নিত্য সৌরকে পণ রেখে কড়ি খেলে, আজ তারাই ওর হাত ধরে টানাটানি করবে বলে বাজি ধরছে।

সৌর এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ওদের কেউ সত্যি-সত্যিই ওর হাত ধরে টানবে বলে পিছনে আসছে কিনা সেটা দেখে নেবার জন্যেই সৌর খানিক এগিয়ে ফিরে তাকাল। আসছে না, এ ওর কাঁধে হাত দিয়ে দুই সখী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে ফিরে তাকাতে দেখে একজন অর্থপূর্ণভাবে গলা দিয়ে খুক্ খুক্ শব্দ করল।

সৌর জোরে জোরে চলতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যার হাওয়া গলির ধুলো দু হাতে তুলে তুলে আবীরের মত ছড়িয়ে ফেলছিল।

সৌর ওদেরই একজনকে বলতে শুনল, "ভয় পেয়েছে।"

আর-একজন খিলখিল করে হেসে উঠে সায় দিল।

পাছে আবার ছাদে উঠতে হয়, সেই ভয়ে সৌর পরদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পকেটে যে কটি খুচরো পয়সা ছিল, তাই দিয়ে পর পর খেয়েছিল অনেকগুলো সিগারেট, পার্কে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

পাছে ওদের সঙ্গে দেখা না হয় সেই ভয়ে দ্বিতীয় দিন সকাল-সকালই উঠেছিল ছাদে। ওরা তখন কেউ ছিল না, ও-পাশের ছাদের তারে ওদেরই জামা-কাপড় শুকচ্ছিল। এ-পাশের ছাদটায় একটি কাক একলা বসে পাহারা দিচ্ছিল। সৌরকে দেখে কাকটা উড়ে পালাল।

ওরা এল তারও অনেক পরে। সৌরকে দেখল, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন আগে দেখে নি, যেন চেনে না। লাল গালার বালাজোড়া একজন আজ খুলে রেখে এসেছে, অন্যজনের নাকেও নাকছাবি নেই। তবে ফরসা হাতে উল্কি ঠিকই আছে।

মাদুর পাতাই ছিল।

ওরা এইবার বসবে, আমাকে নিয়ে খেলবে, সৌর বলল মনে মনে। ভয় পেল, তবু নড়ল না, কখন প্রথম কড়ির দান পড়ে, সেই অপেক্ষায় চেয়ে রইল।

দান পড়ল, ঠক করে তার আওয়াজ পড়ল সৌরর কলজেয়।

আরও একজন সাক্ষী ছিল। সেই কাকটা। সেটা ফের উড়ে এসেছিল। কার্নিসে বসে কড়িখেলা দেখছিল। খেলাটা ওর মনোমত হচ্ছিল না, মাঝে মাঝে কা-কা করে ডেকে উঠে টিটকারি দিচ্ছিল।

একটি মেয়ে মাথা তুলে বিরক্ত গলায় বলে উঠল, "হু-উস।" কাকটা তবু নড়ল না, ঘাড় নুইয়ে নিজের গলার পালকগুলো ঠোট দিয়ে খুঁটতে থাকল।

আর-একটি মেয়ে তখন কাকটাকে তাড়াবে বলে লাঠি তুলল। মুখ নেড়ে বলল, "মরণ!"

ঠিক তখনই হাওয়া উঠল, ও পাশের তার থেকে ওদেরই একটা জামা ছিটকে এসে এদিকে পড়ল। সৌর দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু কুড়বে বলে হাত বাড়াল না।

মেয়ে দুটি নিচু পাচিলের এদিকটায় ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। লাঠি বাড়িয়ে তুলে নিতেও চেষ্টা করল জামাটাকে, পারল না। তখন বলল, "শুনছেন?"

সৌর শুনল না।

মেয়েটি আবার বলল, আবার—সৌর তখন মুখ তুলল।

"তুলে দিন না!" ইশারায় একজন জামাটা দেখিয়ে দিল।

তুলে দেবে না, এমন কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না সৌরর, তবু সে হাত বাড়াল না। সেই বিশ্রী ছবিটা চোখে ভাসছিল। রকে বসে বিড়ালকে আদর করছে একজন, আর-একজন বিড়ি টানছে। এর মধ্যে কুৎসিত কিছু নেই.

তবু ছবিটা সৌর সহজভাবে নিতে পারছিল না। ওদের খিলখিল হাসি বাজছিল কানে।

দুষ্টু কাকটা এদিকে এসে জামাটাকে ঠোকরাচ্ছিল। সৌর তাড়া দিতেই কাকটা উড়ল, কিন্তু জামাটাকে তুলে নিল ঠোঁটে। তুলল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, জামাটা খসে পড়ল গলিতে।

মেয়ে দুটি তখন চেঁচিয়ে উঠল।

আর সৌর কী ভেবে অথবা কিছু না-ভেবেই নীচে ছুটল।

* * *

সৌর কাঁপছিল। সৌবর মুখে কথা ফুটছিল না। জামাটা ওর হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে গিয়েছিল, জামাটায় গলির নোংরা জল লেগেছিল, সেই নোংরা লাগছিল সৌবর আঙুলেও, আর সে আড়ষ্ট বিব্রত হয়ে উঠছিল।

অনেক পরে সৌর বলল, "এনেছি।"

মেয়েটি বলল, "দিন।" হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত সৌরর হাতে ঠেকল। সৌর কেঁপে উঠল।

ময়লা মেয়েটি বলল, "পাখি, ওটা ফের ধুয়ে আন্।"

পাখি! ফরসা মেয়েটি তবে পাখি। ময়লা মেয়েটিই তবে নয়ন। ওরই চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু কি না, দেখবে বলে সৌব নিজের চোখ তুলল। বলবার মত কথা ভেবে না পেয়ে বলল, "যাই।"

"যাবে? এখুনি যাবে কা? এই তো এলে। আমাদের জন্যে কত কষ্ট করেছ, ছুটেছ, এখনও ঘামছ। এক গ্লাস জল খাও, একটু বস।"

সৌর লক্ষ্য করল, ওরা তাকে 'তুমি' বলছে। প্রথম আলাপেই—আলাপের শুরুতেই।

মাদুরে বসে একটি মেয়ে বলল, "আমার নাম নয়ন।"

অন্য মেয়েটি বলল, "আমার নাম পাখি।"

সৌর বলল, "জানি।"

"জান?" গালে আঙুল রেখে পাখি অবাক হবার ভঙ্গি করল: "কেমন করে?"

"ডাকতে শুনলাম।"

বলে স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করে সৌর হাসল।

নয়ন বলল, "এই তো বুলি ফুটেছে। আমরা কী—" শুধরে বলল, "আমরা কে তাও জান বোধ হয়?"

"তা-ও জানি।" সৌর অতঃপর যোগ করল, "কাল টের পেয়েছি।"

নয়ন তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছিল, বলল, "ও, তুমিই সেই। কাল পালিয়ে গিয়েছিলে!"

"পালাই নি। আমার খারাপ লাগছিল।"

"আমরা দুজনে খু-ব হেসেছিলুম। পাখি বলেছিল 'ঝুটো নয়—একদম সাচ্চা।' আমি কী বলেছিলুম জান?"

"কী?"

"সাচ্চা নয়, বাচ্চা। ভয় পেয়েছে।" নয়ন হাসতে থাকল।

"আমার খারাপ লাগছিল।" সৌর আবার বলল, "তোমরা বেরাল নিয়ে খেলছিলে। বিড়ি টানছিলে। আর বিড়ি খেও না।"

"ও মা, বিড়ি খাব না? ও পাখি, এ বলে কী! বিড়ি খাব না তবে কি রকে ঠাণ্ডায় বসে থেকে থেকে শীতে শিটিয়ে মরব?"

সৌর নির্বোধ গলায় বলল, "রকে বস কেন?"

"বসি কেন?" নয়ন প্রশ্নটাকে নিজেই উচ্চারণ করল, জবাবেও বলল, "বসি।"

পাখি বলে উঠল, "রোজ তো চিত্তবাবু আসে না। নিশিবাবুও না।"

সৌর বলল, "ও।"

"চিত্তবাবু আসেন ফি বেস্পতিবারে, শুক্কুরবারে আর রোববার দুপুরে। নিশিবাবুর শনিবার বাঁধা, তা ছাড়া মঙ্গলবারে।"

নয়ন বলল, "তুমি কিন্তু রোজ আসবে, এই দুপুরে।"

"কেউ কিছু বলবে না?"

"কে আবার বলবে! বললেও বয়ে গেছে। তুমি তো আমার ভাইয়ের মত।"

নয়নের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। বলল, "আমার ভাই নেই। একজন ছিল। মাসি তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"তাড়াল কেন?"

"চুরি করেছিল বলে। আর ফিরে আসে নি। অথচ—অথচ গয়নাগুলো গিল্টির ছিল।"

"সোনা নয়?"

"উঁহু, পেতল, সব পেতল। তুমি জান না ভাই, আমরা পেতলের গয়না পরে থাকি?"

"তার মানে ফাঁকি ?"

নয়ন বলল, "তার মানে ফাঁকি।"

"তোমাদের ভালবাসার মত।" সৌর বলল রুদ্ধস্বরে, "তোমরা তো টাকা নাও।"

নয়ন বলল, "আমরা টাকা-ই নিই। দু-চারজন অবিশ্যি জাল নোটও চালায়।"

"আমার টাকা নেই।" সৌর উঠে পড়ল, "আমি আর আসব না।"

"আসবে," নয়ন বলল জোর দিয়ে, "রোজ আসবে। তুমি তো ভাই। তোমার সঙ্গে হল আলাদা সম্পর্ক।"

সৌর বলল, "ও।" সৌরর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলছিল, জিতেছে, আমাকে নিয়ে ওরা কড়ি খেলত, আমাকে ও জিতে নিয়েছে।

চলে আসবে বলে সৌর পা বাড়িয়েছিল, তখন গোঙানিটা ওর কানে এল।

চমকে বলে উঠল, "ও কা !"

পাখি বলে উঠল, "কাঁদছে। ও রোজ কাঁদে।"

"কে ?"

"মালা। নতুন যে এসেছে। যাকে ধরে আনা হয়েছে।"

"ধরে এনেছে ?"

পাখি ইশারায় একটা ঘর দেখিয়ে দিল। বাইরে থেকে শিকল-টানা। ভিতরে অসুখের ককানির মত একঘেয়ে কান্নার সুর।

সৌরর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, বলল, "জোর করে এনেছে ?"

"ঠিক জোর করে নয়, নিশিবাবুর বন্ধু আছে না,—ললিতবাবু ? তার দেশের মেয়ে। ললিতবাবুর সঙ্গে ভালবাসাবাসি ছিল। ললিতবাবু পরে নিশিবাবুর হেফাজতে ফেলে পালিয়েছে। নিশিবাবুই ওকে এনে তুলেছে এখানে।"

"তাই কাঁদে ?"

নয়ন বলল, "তাই। এখনও পোষ মানে নি যে।"

পাখি বলল, "মানবে, মানবে। নিশিবাবু বলেছেন, পোষ মানবে। বলেন—অনেকেই প্রথম-প্রথম ওই রকম থাকে, পরে সিধে হয়।"

"যতদিন হয় না, ততদিন কাঁদে ?"

পাখি বলল, "কাঁদে। থামেও। এই তো নয়ন, তোর ভাই যখন পালিয়ে গেল, তখন তুই তো খুব কেঁদেছিলি। পরে থেমে যাস নি, চুপ করিস নি ?"

মাথা নিচু করে নয়ন বলল, "করেছি।" সৌরর মনে হল ওর চোখ দুটি বিষণ্ণ, গলায় অনেক দিন-আগে-থেমে-যাওয়া কান্নার ছোঁয়া লেগেছে।

ঘটনাগুলি ঘটল প্রায় পর পর। মাঝখানে মাত্র একটি কি দুটি দিনের যতি দিয়ে। সব দিনগুলো সৌরব মনে থাকাব কথা নয়। তবু অনেক ছাইয়ের আড়ালে কয়েকটা ফুলকির মত তারা সৌরর মনের কোণে লুকিয়ে ছিল। পরে পরে, অনেক কাল পরে সৌর যখন এই দিনের শিকলে হাত ছুঁইয়েছে তখন তারা একসঙ্গে বেজে উঠেছে। সৌর অবাক হয়েছে। স্মৃতির বিচিত্র লীলার কথা ভেবে সৌর অবাক না হয়ে পারে নি। ছোট বড়ব কথা নয়, যে ঘটনা, যে দৃশ্য মনের গায়ে আঁচড় কাটে তা আবাব একদিন মনে পড়বেই—এ তত্ত্ব সৌরর জানা, কিন্তু ঘটনা হিসেবে এরা কী? এদের মর্যাদা কতটুকু? নয়ন, পাখি নেহাতই একই বাড়ির আর-এক পিঠের বাসিন্দা বলে সৌবর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল। এই দেখাদেখির ব্যাপারে সৌরর কৌতূহল যেটুকু বা ছিল, বিস্ময় যে মোটেই ছিল না সৌব সেটা জানত। কী দেখে অবাক হবে সৌর? রূপ? কিন্তু নয়ন পাখির আগে সৌর লতা বউদিকে দেখেছে। শুধু দূর থেকে দেখা নয়, কাছে গিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা। লতা বউদিকে আগে দেখা ছিল বলেই হয়তো ওদের মধ্যে রূপের কঙ্কালকে দেখতে পেয়ে সৌর প্রথম দিন অত্টা খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আশ্চয, অরূপা নয়ন পাখির কথা সৌবব মনে থেকে গেছে। পরে যখন ওদেব কথা সৌব ভেবেছে তখন একটা দৃশ্য প্রায়ই ওর মনে পড়ত। যেন দুপুরের রৌদ্রজ্বলা কলকাতারই কোন একটা বড় রাস্তা। লোকজন নেই। শুধু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা জটলা করছে। ওরা তিনজন—নয়ন, পাখি আর নিশিকান্ত। সেই নাটুকে নিশিকান্ত। লম্বা ফরসা চেহারা। মাথায় পাতলা কটাশে চুল। গায়ে নকল সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবি। সৌব অনেক ভেবেও এ দৃশ্যের মানে করতে পারে নি। দুপুরের চড়া রোদের কথা কেন মনে হত? রোদের সঙ্গে নিশিকান্তর চকচকে জামার কি কোন মিল ছিল? নাকি ওরা তিনজনই এক অর্থে রোদে-পোড়া মানুষ বলেই দৃশ্যটা মনে পড়ত সৌরর? সৌর আর বেশী ভাবতে পারে নি। কিন্তু স্মৃতি সম্বন্ধে সৌর মনে মনে এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করেছে। অনুরাগের কি বিরাগের কোন ঘটনাই মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। মনের তলায় তারা লুকিয়ে থাকে। অনুরূপ কোন ঘটনার ছোঁয়া পেয়ে তারা জেগে উঠতে পারে তো ভাল। না পারলেও মরে যায় না।

যে বিস্মৃতিকে আমরা মৃত্যু বলে মনে করি, আসলে তা রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়। স্মৃতির সেই ধ্বংসাবশেষ আমাদের চরিত্রে আমাদের মানসিকতায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

মাঝে একটা দিন শুধু বাদ গেল। পরের দিন দুপুরবেলা সৌর সোজা গিয়ে নয়নদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল। অথচ এটা ওর কলেজে যাওয়ার সময়। দরজা খুলে দিয়ে নয়ন বলল, "এস ভাই, কী কপাল আমাদের ভাই, যেচে এসেছে দিদিদের খোঁজ নিতে!"

সৌর জানে নয়ন ঠাট্টা করছে না। তবু ঢঙটা সৌরর ভাল লাগল না। নিচু হয়ে জুতো খুলে সৌর পাশের তক্তপোশের উপর উঠে বসল, বলল, "পাখি কোথায়? তাকে দেখছি না?"

"আসবে এক্ষুনি, পাখি ওদিকের ঘরে থাকে।" নয়ন আঙুল দিয়ে পাখির ঘর দেখিয়ে দিল। তারপর একটু হেসে বলল, "তুমি বুঝি ভেবেছিলে ছাদে একসঙ্গে কড়ি খেলি বলে আমরা থাকিও এক ঘরে। তাই থাকা যায় নাকি?"

'যায় না কেন?' কথাটা বলতে গিয়েও সৌর ফিরিয়ে নিল। এক ঘরে দুজনে থাকবে কী করে? ওদের প্রত্যেকের এক-একখানা আলাদা ঘর দরকার। অন্তত রাত্রে দরকার। নয়নের ঘরের দিকে সৌর তাকিয়ে দেখল। আসবাব সামান্যই। তক্তপোশ ছাড়া বসবার মত আর আছে একটা চেয়ার। পুরনো তেলচিটে চেয়ার। সৌরর সেটাতে বসার সাহস হয় নি। এক কোণে কলাই-করা-ডিশ-ঢাকা-দেওয়া অ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, ভাতের হাঁড়ি, তার পাশে কিছু রান্নার সরঞ্জাম। খাওয়া শোয়া বোধহয় একই ঘরে। দেয়ালে দুখানা ক্যালেণ্ডার। একটার তারিখের পাতাগুলি উড়ে গেছে। আদর শুধু ছবিটার। ক্যালেণ্ডারের মাথায় কাঠের গুলিওয়ালা আলনায় দুখানা রঙিন শাড়ি, একটা ব্লাউজ। আর সম্পত্তির মধ্যে এই আকাঠার তক্তপোশ। তক্তপোশের কথায় রাত্রির কথা সৌরর মনে পড়ল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল সৌরর! কিন্তু এখন অস্বস্তি লাগলে কী হবে? তুমি কি অন্য কিছু দেখবে বলে ভেবেছিলে? সব জেনে শুনে, অনুমানে সব জানতে পেরেই কি কলেজ ফাঁকি দিয়ে তুমি এখানে আস নি? সৌর বুঝতে পারল এ গলা ওর বিবেকের। বিবেকের শাসনকে সৌর এখন আর ভয় করে না। হ্যাঁ, সৌর নিজে থেকেই আজ এসেছে আর-একটি জীবনকে জানবে বলে। এমন করে না এলে একই বাড়ির বাসিন্দা হয়েও যে-জীবন সৌর কোনদিনই দেখতে পেত না, সৌর সেই জীবনকে দেখতে এসেছে।

একটু পরে পাখিও এসে জুটল। নয়নই বোধ হয় ওকে ডেকে আনল। দুজনেই আজ একটু সকাল সকাল চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িরও সেই ঢিলে-ঢালা ভাবটা এখন ওদের নেই। ওরা যেন তৈরী। কিন্তু কার জন্যে তৈরী?

সৌর বলল, "আজ তোমরা কড়ি খেলতে গেলে না?"

নয়ন আর পাখি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নয়নই জবাব দিল। "খেলবে একদিন আমাদের সঙ্গে?"

সৌর বলল, "না না, আমি কড়ি খেলব? তোমরা খেললে না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"আহা, খেললেই বা, দোষ কী? ভাই-বোনে বুঝি কড়ি খেলে না?"

"খেলবে না কেন, খেলে।"

"তুমিও একদিন আমাদের সঙ্গে খেলবে।"

সৌর এবার একটু হাসল।

"আমি কি খেলতে জানি যে খেলব?"

পাখি ঠোঁট টিপে বলল, "কড়ি খেলতে কি মন্তর লাগে? লাগে তো সে মন্তর তোমাকে আমরা শিখিয়ে দেব।"

সৌর বলল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু হঠাৎ আজ খেলা বন্ধ কেন?"

পাখি বলল, "আজ যে তুমি এসেছ।"

নয়ন ধমক দিয়ে বলল, "থাম্, তোকে আর পাকামো করতে হবে না। আজ ভাই আমাদের খেলা হবে না। খেলব কী করে, একটু বাদেই তো নিশিবাবু এসে উঠবেন। আজ না শনিবার!"

সৌর তাড়াতাড়ি বলল, "তা হলে আজ যাই! আর-একদিন বরং আসব।"

নয়ন অবাক হয়ে বলল, "ওমা, নিশিবাবু আসবে তো তোমাকে যেতে হবে কেন? সে তো এখন আসবে সেই থিয়েটারের বই শোনাতে। তোমাকে উঠতে হবে না, বোস। একটু চা আনাই। চা খাও।"

আর-একটু হলেই নয়ন বাড়িউলীকে ডাকতে ছুটত। কিন্তু সৌর হাত তুলে তাকে থামাল।

"না না, চা আনাতে হবে না। চা আমি খেয়ে এসেছি।"

পাখি ফোড়ন কাটল "খেয়ে এসেছি।" তারপর নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুইও যেমন! আমাদের ঘরে এসে বসেছে বলেই যেন আমাদের হাতে চা-ও খাবে।"

সের কেমন করে ওদের বোঝাবে, দোষটা ওদের হাতের নয়, ওদের হাতের ছোঁয়া চা খেলে সৌরর জাত যাবে না। কিন্তু নোংরা গ্লাসে করে কোথা থেকে কী চা নিয়ে আসবে কে জানে! সে চা সৌর ঠোঁটে ছোঁয়াতে পারবে না। মরে গেলেও না।

সৌর বলল, "সত্যি আমি একটু আগে চা খেয়েছি।"

এবার বোধ হয় সৌরকে ওরা অবিশ্বাস করল না।

উঠে যাওয়ার ইচ্ছাটা সৌরকে আবার যেন ঠেলতে শুরু করল। কী হবে বসে বসে? নিশিকান্ত এলে বসে বসে তার নাটক শুনতে হবে। সে-নাটকের নমুনা সৌর ছাদে দাঁড়িয়েই দু দিন শুনতে পেয়েছে। সব জেনে সব বুঝেও সেই অদেখা নিশিকান্তকে না দেখে সৌব উঠতে পারল না। সৌর থেকে গেল।

নিশিকান্ত এল একটু বাদে। ঢ্যাঙা লম্বা চেহারা। গায়ে ঢোলা-হাতা সিল্কের পাঞ্জাবি। গলার দিকের দুটো বোতাম খোলা। রোল্ডগোল্ডের বোতামের অবলম্বন যে কালো ফিতেটা, সেটা গলার পাশে মুখ বার করে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে জালি গেঞ্জির ওপরটা চোখে পড়ে। গেঞ্জির আড়ালে ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড়ের আভাস। সৌরকে দেখে নিশিকান্ত ভুরু কোঁচকাল। নয়নের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, কে?

নয়ন হেসে বলল, "ও নিশিবাবু, অমন করে ওর দিকে তাকাচ্ছ কেন? ও যে আমাদের পাতানো ভাই, এই বাড়িরই ও-পাশটাতে থাকে।"

"ভাই? তাই বল, আমি ভাবলাম কে না কে!"

"ভয় ধরেছিল বুঝি?"

নিশিকান্ত নিশ্চিত হয়ে চেয়ারটায় বসল। সৌর লক্ষ্য করল, নিশিকান্তর হাতে মোটা একটা বাঁধানো খাতা। বোধ হয় সেই নাটকটা। নিশিকান্ত গায়ের ভর গায়ে রেখে সেই নড়বড়ে চেয়ারটাতে বসল। ভয় পেল না। অথচ সৌরর ভয় করছিল। ভাবছিল, ওটায় বসতে গিয়ে ভেঙে-চুরে না পড়ে যায়!

খাতাটা কোলের ওপর রেখে নিশিকান্ত সৌরর সঙ্গে আলাপ শুরু করল।

"কী নাম?"

সৌর নাম বলল।

"কী করা হয়?"

"কলেজে পড়ি।"

কলেজের কথায় একটু বোধ হয় ভক্তি হল নিশিকান্তর। মুখের মারমুখো ভাবটা যেন কাটল এতক্ষণে।

সৌর সাহস পেয়ে বলল, "আপনি কী করেন ?"

"আমি ? আমি এটর্নি। মামলা করি। তা শালা নামেই যা কিছু। না হলে দেখ, আজ শনিবার। একটায় ছুটি হয়েছে। উঠতে উঠতে দুটো বেজে গেল। মক্কেলের কাছে পাব কী ? কাঁচকলা। কিন্তু খাটাবার বেলা ? হাড় কালি করে ছাড়বে। এ-সব করে কিছু হয় না, বুঝলে ? হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমাকে কিন্তু ভাই 'তুমি'ই বলব। আপনি-টাপনি আমার আসে না। আর বলবই বা না কেন ? বয়সে তো তুমি ঢের ছোট। নয়নের যখন ভাই তখন তুমি আমারও ভাই। না, কী বলিস নয়ন ?"

নয়ন সায় দিল।

নিশিকান্ত ফের শুরু করল, "হ্যাঁ, কাজের কথা বলছিলাম। চাকরি করে কিস্সু হবে না। ব্যবসাতেও না। নতুন লাইনের চেষ্টা করছি। বরাত যদি খোলে! লেখার বাতিক আমার গোড়া থেকে একটু ছিল। কাগজে কিছু কিছু ছাপাও হয়েছে। তারপর ভাবলাম, ও খুচরো লেখার কাজ নয়। পার তো গোটা বই লিখে ফেল একটা। লিখেছি। নিজের মুখে নিজের গীত গাইব না। কিন্তু ভাই বইটা সত্যি ওদের পছন্দ হয়েছে। ডায়নার মালিক আমাকে বলেছে, এ বইয়ের মার নেই, এ বই আমি করব। কী রে নয়ন, তোকে বলি নি সে-কথা ?"

"বলেছ। কিন্তু আমার পার্টের কী হল ?"

নিশিকান্ত অভয় দিয়ে বলল, "পাবি পাবি। বই যখন ধরাতে পেরেছি, তখন তোরা পার্ট পাবি না, পাবে কে ? তবে হ্যাঁ, শেষের দিকে একটু বদলাতে হয়েছে। ডায়নার মালিকের আবদার, শেষটা আর-একটু চড়া করে দাও। দিলাম বদলে। আরে, সবই পারি ; নরমও জানি, গরমও জানি। শেষটা শোন দেখি একবার নয়ন। তুমিও শুনো ভাই। কানে কোথাও খুট করে লাগলেই আমাকে বলবে।"

নিশিকান্ত স্বরচিত নাটক পড়তে লাগল। সৌরর মনে পড়ল, এই নাটকেরই গোড়ার অংশ সেদিন ছাদ থেকে শুনতে পেয়েছিল। আজ শেষটা শুনছে। গলায় দরদ আছে নিশিকান্তর। শুধু পড়া তো নয়, সেই সঙ্গে হাতের মুদ্রা,

মুখের ভাব, নিশিকান্ত যেন স্টেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নয়ন আর পাখি মন দিয়ে ওর পড়া শুনল। আর সৌর বসে বসে তিনটি মুখের ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল।

পড়া শেষ হলে মনে হল, নিশিকান্তর রোগা শরীরও যেন ঘেমে উঠেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিশিকান্ত মুখ ঘাড় মুছে ফেলল, তারপর সৌরর দিকে তাকিয়ে বলল, "কেমন লাগল?"

সৌর বলল, "খুব ভাল।"

আসলে সৌরর ভাল লাগে নি। মন দিয়ে সবটা সৌর শোনেই নি। তবু বলল, বলতে হল, ভাল লেগেছে। পুরনো সামাজিক প্রেমের নাটক। হাস্যকর কিছু কিছু বড় বড় কথা ছাড়া আর কী আছে ওর মধ্যে? আর কী থাকা সম্ভব? তবু এই মুহূর্তে বিরূপ সমালোচনা করে নিশিকান্তকে নিবিয়ে দিতে সৌরর মন সরল না। ওর নাটক ভাল না হতে পারে, কিন্তু ওর এই ঘাম মিথ্যা নয়, উত্তেজনা অনুভূতি মিথ্যা নয়।

নিশিকান্ত খুশী হয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে সৌরর হাতে দিল। বলল, "খাও, লজ্জা কী? আমার সামনে আর লজ্জা করতে হবে না।"

নিশিকান্তর মেজাজ এসে গেছে। শুধু সিগারেট নয়, এর পরে নিশিকান্ত হয়তো আরও কিছু সৌরকে খেতে বলবে। কিন্তু তার আগেই সৌর ওখান থেকে চলে যেতে চায়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সৌর বলল, "চলি।"

নিশিকান্ত বলল, "যাবে? আচ্ছা, এস। মঙ্গলবার এসো কিন্তু আবার। আরে, এখানে এলে কিছু লোকসান নেই। চেহারা-টেহারা ভাল আছে। পার্ট-ফার্ট একটা লেগেও যেতে পারে। বল তো ডায়নার মালিকের কাছে নিয়ে যেতে পারি।"

সৌর একটু হাসল। তারপর যাওয়ার আগে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ জানলার ফাঁকে এক জোড়া চোখের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে এই মেয়েটিই তো সেদিন কাঁদছিল। নয়ন, পাখি ছাড়াও আর-এক পাখিকে আজ দেখে গেল সৌর। পিঞ্জরের পাখি।

মালা হাসছিল। এক রাশ রুক্ষ চুল পিঠের উপর ঢালা, রুক্ষ বাদামী রঙ-ধরা এক চোখে কাজল ছিল মালার, অন্য চোখে নেই। যে-চোখে কাজল, সেই চোখটা হাসিতে আরও যেন কালো হয়ে গিয়েছিল, অন্য চোখের মণি আরও সাদা। দুটোতে মিলে উদ্‌ভ্রান্ত চপল দৃষ্টি—সৌর ভয় পেয়েছিল।

অগোছালো শাড়ির আঁচলটা মালা মাঝে মাঝে মুখে পুরছিল হাসির তোড় সামলাবে বলে। তখন ওর গাল আর চিবুক আর নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠছিল, কপাল টকটকে।

যে-হাসিতে চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়, সে-হাসি কখনও স্বাভাবিক নয়, সৌর বুঝেছিল, কিন্তু বুঝেও নড়ে নি। কারণ এক-একবার হাসি থামিয়ে মালা নির্নিমেষ চোখে ওকে লক্ষ্য করছিল। তখন ওর দৃষ্টি স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সকৌতুক, অংশত নির্লজ্জও। সৌর নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল, কে জানে, তার চেহারাতেই বুঝি কোথাও হাস্যকর কিছু আছে। হয়তো তার টেড়িতে, হয়তো মুখে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সৌর মাথায় হাত বুলিয়ে পরখ করছিল, চুলগুলো অবিন্যস্ত কি না!

আবার যেন লজ্জা পেয়েই মালা আঁচল দিয়ে সমস্ত মুখটা ঢেকে ফেলছিল, তার চোখ চিবুক হাসি সব আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। ব্রীড়াবতীর ভঙ্গিতে এখন চপলতার লেশমাত্র ছিল না।

সৌর মনে মনে বলছিল, তোমার পায়ে পড়ি, ওই হাসি একটু থামাও, আমাকে ছুটি দাও, আমি এবার যাই।

ওকে তো ডেকেছিল মালাই। হাতছানি দিয়েছিল। সৌর প্রথমে অবাক হয়েছিল। তারপর, এই মেয়েটি হয়তো তাকে কিছু বলতে চায়, এই কথা ধরে নিয়ে সৌর এগিয়ে গেল।

মালা কিন্তু কিছুই বলল না, হাসতে থাকল। দরজায় তালা, জানলায়

শিক, ও-পাশে মালা, এ-পাশে সৌর, মালা হাসছে তো হাসছেই। সে যে কত হাসতে পারে, তাই জানাতেই মেয়েটা হাতছানি দিয়ে সৌরকে ডেকে আনল না কি!

ধৈর্য হারিয়ে সৌর চলে আসতে যাবে, হঠাৎ মালার হাসি থামল। চোখ দুটো চকচকে। মালা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল, প্রথমে নিঃশব্দে, পরে তার সঙ্গে ফোঁপানি যোগ হল। এই ফোঁপানির একটানা একঘেয়ে সুর সৌরর চেনা, আরও কতদিন শুনে চঞ্চল হয়েছে।

ঠিক তখনই তার জামার আস্তিন ধরে কেউ টান দিল। সৌর ফিরে চেয়ে দেখল, নয়ন।

নয়ন ফিসফিস করে বলল, "এস।"

সৌর তবু নড়ল না।

এবার ধমকের সুরে নয়ন বলল, "চেয়ে চেয়ে দেখছ কী! এদিকে এস।"

"কেন?"

"আসবে না, তবে কি সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের হাসি দেখবে আর কান্না শুনবে?"

সৌর বলল, "পাগল?"

"তা ছাড়া কী! মালা কাল সন্ধ্যা থেকে ওই রকম করছে। পাগল হয়ে গেছে।"

মালা পাগল হয়ে গেছে—কথাটা নয়ন অনায়াসে উচ্চারণ করল, যে-ভাবে বলে—আমার মাথা ধরেছে।

ওই ভঙ্গির জন্যেই জ্বলে উঠল সৌর, সেই মুহূর্তে ঘৃণা করল নয়নকে। বলে উঠল, "এর জন্যে দায়ী তোমরা। নিজেরা পাপে ডুবেছ, ডুবে আছ, সেখানে নেমে নামাতে চাইছ ওকেও।"

নয়ন রাগ করল না, বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইল। সৌরর তখনও বুঝি জ্বালা যায় নি, বলল, "তোমরা—তোমরা খারাপ।"

এবারও প্রতিবাদ করল না নয়ন, বরং আবার হাসল। সৌরর কথাতেই সায় দিয়ে বলল, "ঠিক। কিন্তু তুমি এবার এস তো। ওখানে ওভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে না।"

সৌর যখন বলল, "না যাব না," নয়ন তখন আরও কাছে ঘেঁষে এল। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "একেবারে ছেলেমানুষ।"

সৌর তবু রোখ ছাড়ল না, বলল, "আমি যদি পুলিসে খবর দিই ?"

"কী খবর দেবে ?"

"এই—এই একটা মেয়েকে তোমরা জোর করে ধরে রেখেছ।"

"আমরা ?"

"ওই একই কথা হল।"

"পুলিস হদিশই পাবে না। চিত্তবাবুরা ভারি সেয়ানা। ওদের তুমি তো চেন না ভাই। পাখি সরিয়ে নিয়ে অন্য খাঁচায় পুরবে।"

নয়নেব ঘরে গিয়ে পাটিতে বসল সৌর। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নয়ন বলল, "বন্দিনীদের উদ্ধাব করে বেড়ানো তো তোমার কাজ নয়, ও-সব করত সেকালের যোদ্ধারা আর বীর হনুমান।"

বলতে বলতে নয়ন সৌরর নাকের ডগা নেড়ে দিয়ে অস্পষ্টভাবে একটু আদর কবল।—"একটা পাগলী মেয়ের কথা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছ; কই, আমাদেব কথা তো একবারও ভাব না ?"

সৌর বলল, "সেকালের বীর যোদ্ধাদের কথা তুমি জানলে কোথা থেকে ?"

নয়ন বলল, "বা বে, নিশিবাবু নাটক লেখে না ? বই না পড়ি, শুনি তো। এসব যা-কিছু শিখেছি সব নিশিবাবুর বই থেকে।" নয়ন একটু থেমে বলল, "কিন্তু কই, তুমি আমার কথার তো জবাব দিলে না ?"

সৌর বলল, "আমি কী কবতে পারি, আমি এখনও ছাত্র। তা ছাড়া—"

ওব মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নয়ন বলল, "তা ছাড়া তুমি এখনও ছেলেমানুষ।"

ফোঁস করে উঠে সৌর বলল, "বার বার ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলবে না। আমার বয়স কত জান ?"

নয়ন ভ্রুভঙ্গি করে ভাল কবে ওকে দেখে নিযে যেন বয়সটাই যাচাই করতে চাইল। মুখ টিপে হেসে বলল, "কত আর, পনের-ষোল ?"

সৌর গম্ভীর গলায় বলল, "একুশ উতরে গিয়ে বাইশে পড়েছি।" হয়তো মিথ্যাই বলল।

একটু একটু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, আর নয়ন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। হঠাৎ সৌরর মনে হল তার আর বসে থাকা উচিত না, নয়ন তা চাইছে না, কী কাজ যেন বাকী আছে নয়নের, সে উঠলেই তাতে হাত দেবে। তাই এত উসখুস করছে নয়ন।

হাতে একটা ফরাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে। সেই মেয়েটি—নাম

যার পাখি। তাকে দেখে নয়ন বলল, "এসেছিস, আয় ভিতরে আয়।" সৌরর দিকে ফিরে চেয়ে বলল, "কিছু মনে কোর না ভাই, একটু উঠবে ? এটা এখানে পাততে হবে।" সৌর উঠল তবু চেয়ে রইল কতকটা জিজ্ঞাসু চোখে।

তার জিজ্ঞাসাটাই যেন অনুমানে ধরে নিয়ে নয়ন বলল, "আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে নিশিবাবুর নতুন নাটকটার মহলা হবে।"

মাথা নিচু করে সৌর আস্তে আস্তে চলে এল।

সেই সন্ধ্যার যন্ত্রণা সৌর সহজে ভুলতে পারে নি। ইকনমিক্সের বইয়ের পাতা আপনা থেকে উড়ছিল। সৌরর চোখ ছিল বইয়ের পৃষ্ঠায়, কিন্তু মন অন্যখানে। সৌর পড়ছিল না, পড়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা মাঝখানে তো শুধু কাঠের পার্টিশনটাই, তার ওপার থেকে কয়েকটি মিলিত গলার হল্লা আর চিৎকার ভেসে আসছে। বার বার সৌর নিজেকে বলল, এ ভাল নয়, এসব শোনা উচিত নয়। তবু ইকনমিক্সে কিছুতেই মন দিতে পারল না।

ক্রমশ সৌরর এই ধারণা হচ্ছিল যে, বইয়ে সব কথা থাকে না। ছাপানো হরফে সব জ্ঞানের কথা নেই। জীবনে অনেক কিছু জানতে হলে বাঁচতে হয়। বেঁচে দেখে, বেছে নিতে পারলে তবে সব বস্তুর স্বরূপ জানা যায়।

শ্লথ গলায় এক কলি গান গেয়ে উঠল, ও কে ? নয়ন, না পাখি ? ঝন ঝন শব্দে হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ল কার ? চিত্তবাবুর, না নিশিকান্তর ? হঠাৎ এক জোড়া ঘুঙুর বেজে উঠল কেন, কে নাচবে ? নয়ন ? নয়ন কি নাচ জানে ?

সৌব কল্পনায় নয়নের নৃত্যরত রূপ দেখতে পেল।

দেখা যে শুধু চোখ দিয়েই হয় না, কান দিয়েও চলে, এই অভিজ্ঞতা সৌরর সেই প্রথম। এই তো চোখ বুজে কান খাড়া করে শুনছে, কই, কিছুরই তো ঘাটতি নেই। ফেঁপে-ওঠা ঘাঘরার রঙও যেন সৌব দেখতে পেল, চিত্ত আর নিশিবাবু এক হাতে গ্লাস ধরে, অন্য হাতে তুড়ি দিয়ে তারিফ করছেন— এ-চিত্রটাও মনে মনে এঁকে নিতে কষ্ট হল না।

আমি যদি এখন ওখানে থাকতুম, সৌর ভাবছিল, তা হলেও এর চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পেতুম না। বড় জোর অভিজ্ঞতাটার স্বাদ আলাদা হত। কিন্তু সেটাই সত্য, আর এখন যা দেখছি তা কল্পনা এ আমি কিছুতে মেনে নেব না। দুই-ই ঠিক। আসলে বাইরের যে পৃথিবী তার অবিকল একটা প্রতিচ্ছবি আমার মনেও আছে। সেই পৃথিবীরও কতকগুলি নিয়ম-নীতি আছে। তাকে ভুল

বলে উড়িয়ে দিই কী করে! এই পৃথিবীও আমারই কতকগুলি অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরী। আমার কল্পনাই সেখানে বিধাতা।

ঘুঙুরের বোল ক্রমশ দ্রুততাল হচ্ছিল। চড়া পর্দায় হারমোনিয়াম বাজছিল। আর সঙ্কোচে লজ্জায় সৌর যেন এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল। পা তুলে নিয়েছিল চেয়ারের উপরে। যেন মেঝে দিয়ে কতকগুলি কেঁচো হেঁটে যাচ্ছে, পা ঝুলিয়ে বসলে তাদেরই গায়ের কস ওর পায়ে লেগে যাবে। মনের ঘৃণাবোধ দেহের স্নায়ুতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

নয়ন নাচছে, পাখি গাইছে, আর রক্তলোচন দুটো লোক ঢুলতে ঢুলতে বাহবা দিচ্ছে—এই তোমাদের নাটকের মহলা, ছিঃ! তোমরা বড় মিছে কথা বল, বড় ঠকাও। তোমাদের চেয়ে পাশের ঘরের ওই মালা বরং ভাল। সে এখন কী করছে? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে, কেবলই হাসছে? অথবা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে অন্ধকার ঘরে দেয়ালের কোণে সরে গিয়ে কাঁদছে? এ কি পাগলামি? পাগল তো তবে সৌরও। সে-ও তো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

তাল কাটছিল বলে কে যেন নৃত্যপরা মেয়েটির গালে কষে থাপ্পড় মারল। গান গাইছিল যে মেয়েটি, ভয় পেয়ে সে থেমে গেল, আর হঠাৎ অশ্লীল গলায় গালি-গালাজ শুরু করল অন্য লোকটি। অকস্মাৎ রসভঙ্গ তার বুঝি মনঃপুত হয় নি।

আর তখনই সৌরর মনে হল ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে ওই ঘরে, দেয়ালে খান খান হয়ে ভাঙল হয়তো গোটা দুই বোতলই, তার পরেই হঠাৎ আলো নিবে গিয়ে ঘরটা যেন বোবা হয়ে গেল।

সৌরর গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, সৌর ঘৃণায় কাঁপছিল। কখন ঘুম এসেছিল, সে টের পায় নি।

ওর গালে টোকা দিয়ে নয়ন বলেছিল, "কী ভাই, রাগ করেছ?"—এটা পর দিনের ঘটনা।

সৌর ছাদে এসেছিল। বলল, "আমি তোমার ভাই নই।"

"নও? ও মা, কেন?"

"তুমি—তোমরা খারাপ। তোমার তো—" বলবে না বলবে না করেও সৌর কথাটা বলেই ফেলল, "তোমরা তো বেশ্যা।"

নয়নের হাতের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে যেন অবাক হল। সৌর ভেবেছিল, নয়ন লজ্জা পাবে, আহত হবে। হয়তো রাগ করবে। আশ্চর্য, সে-সব কিছুই ঘটল না, নয়ন বলে উঠল, "তাতে কী?"

আশ্চর্য, এত উষ্মা ছিল সৌরর মনে, নয়নের ভঙ্গি দেখে সব যেন উবে গেল। নিজেকে বলল, পালাও, এখান থেকে পালাও তুমি। এই ডাইনী মেয়েটা নির্ঘাত জাদু জানে। তোমার রাগকে নিমেষে জল করে দিয়েছে, সময় পেলে হয়তো তোমাকে সুদ্ধ বদলে দেবে। ছেলেবেলা থেকে পড়ে পড়ে আর শুনে শুনে যা-কিছু ভাল বলে শিখেছ তুমি, ওর চোখের ঢলচল চাউনি দিয়েই সব ভুলিয়ে দেবে। সৌর, পালাও।

সেদিন রাত্রেই স্বপ্নে মালা সৌরর কাছে এসেছিল।

কয়েকটি জলজ শ্যাওলা মালাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। সৌর দেখছিল, মালা ডুবছে।

গভীর দীঘির পাড়ে মালা পা ঝুলিয়ে বসে ছিল, কালো কয়েকটি হাত হঠাৎ জলের তলা থেকে উঠে এসে মালাকে টেনে নিল। এক লহমায় জন্য তারা ভেসে উঠেছিল, তবু সৌর দেখতে পেয়েছিল। হাতগুলি রোমশ। মাছের আঁশ-মাখা, বড় বড় নখে কাদা লেগে আছে।

মালা ছটফট করছিল, নিজে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। ওর চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন স্পষ্ট, সৌর দেখতে গেল। মালার মুখের রঙ নীল। সৌরর অবাক লাগছিল। মালার রঙ, সে যতটুকু দেখেছে, মাজা-মাজা বাদামী। মালা হঠাৎ নীল হয়ে গেল কী করে! সৌর ভাবল, আমি কি ভুল দেখছি? কই, না তো, সত্যিই ও তো মালাই, পরুষ রোমশ কয়েকটি হাত যাকে জাপটে ধরেছে, জলের তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নখের আঁচড়ের দাগ লাগছে মালার মুখে, নীল মুখে রক্তের আভা দেখা দিয়েছে। মালার লাগছে, ব্যথা লাগছে। বেদনায় মানুষ নীল হয়ে যায়, সৌর শুনেছিল, মালাব মুখের রঙ এখন তাই বুঝি নীল। ওর রুক্ষ চুল উড়ছে, ওর গায়ের আঁচল দীঘির জলে ফেঁপে উঠল, ওর চোখে জল, মায়া করুণ চোখে সৌরর দিকে চেয়ে আছে। মালা সৌরকে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

সৌর চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঁচাব যে, তার উপায় কী, আমি যে ভাল সাঁতার জানি না,—সৌর ক্ষোভের সঙ্গে স্বগত উচ্চারণ করল, আর আমি ওকে ছিনিয়ে আনব কী করে, আমার গায়ে এত কি জোর আছে!

মালা ডুবে গিয়েছিল, রুক্ষ চুলের রাশ জলে জবজবে হয়ে গিয়েছে, দুই-এক গুচ্ছ মাত্র তখনও জলে ভাসছে, মাঝে মাঝে মালার লিকলিকে সরু দুটি হাত

দেখা দিয়েই তলিয়ে যাচ্ছিল, হাতেরও ভাষা আছে, সৌর পড়তে পেরেছে— হাত দুটিও মিনতি করে ওকে বলছিল, বাঁচাও।

সৌর আত্মগ্লানিতে অস্থির হয়ে উঠছিল, নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল বার বার, ভাবছিল এই অক্ষমতার বালাই নিয়ে আমিও ডুবে মরি। কেন ভাল করে সাঁতার শিখি নি, আমার গায়ে জোর নেই কেন?

এক-পা এক-পা করে সৌরও জলের দিকে এগচ্ছিল। পা ডুবল, কোমর, ক্রমে ক্রমে বুক গলা চিবুক কান চোখ।

মালাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

কয়েকটি জলজ শ্যাওলা ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে। এর আগে সৌর রোমশ কয়েকটি হাত দেখতে পেয়েছিল, পলকে তাদেরই শ্যাওলায় রূপান্তর ঘটল নাকি? আমিই বা এতক্ষণ জলে ডুবে আছি কী করে, সৌর জিজ্ঞাসা করছিল, আমার শরীর এমন হালকাই বা হল কিসে? একটা জোঁক লেগেছে মালার কানের লতিতে, একটা শামুক ওর পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরেছে। জলও নীল, মালাও নীল, তবু ওকে এখনও চেনা যায়; কেননা সৌরও যে মালার খুব কাছাকাছি আছে। জলের তলে এতক্ষণ ডুব দিয়ে থেকেও সৌরর কষ্ট নেই, দমবন্ধ হয়ে আসছে না, কারণ—

সেটা সৌর একটু আগেই টের পেয়েছিল, সে মাছ হয়ে গিয়েছে। সাঁতার ভাল জানা নেই বলে যতক্ষণ সৌর আক্ষেপ করছিল মনে মনে, ততক্ষণ সঙ্গোপনে, নিজেরও অগোচরে সে বুঝি এই প্রার্থনাই জানিয়েছিল: এক্ষুনি যেন মাছ হয়ে যেতে পারি।

সে-প্রার্থনা ঈশ্বর রেখেছেন। সৌর নিমেষে মাছ হয়ে গিয়েছে। মাছের চোখ, তাই পলক নেই, মালাকে দেখছে, কিছু করতে পারছে না, তাই মালারই চারপাশে পাক দিয়ে ঘুরছে।

শ্যাওলার ফাঁস পড়ছে মালার গলায়। মালা আরও নীচে নামছে।

সৌর সভয়ে নীচে চেয়ে দেখল, সেখানে শামুকের খোলা আর ঝিনুক ছড়ানো, আর অজস্র পাথরের নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে থকথকে কাদা। নুড়িগুলো জ্বলছে। এখানে তো সূর্যের আলো নেই, ওই পাথর থেকে ঠিকরানো আলোতেই চার পাশ ঝাপসা হলদে হয়ে আছে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি, ওই নরম থকথকে কাদায় মালার শরীর বসে যাচ্ছে। ওর কোমর অবধি প্রোথিত হয়ে গেল, ওর দেহের বাকী অংশটা তবু স্থির,

মালা আর হাত-পা ছুঁড়ছে না, ছুঁড়তে পারছে না, শ্যাওলার ফাঁস ওর গলায়, শ্যাওলার হাতকড়ি ওর হাতে।

মালা এইভাবেই ডুববে। একটু পরেই কাদা আর পঙ্ক ওকে একেবারে ঢেকে দেবে, আমি কিছু করতে পারব না, আমি অক্ষম অপটু, সৌর, তাতে আবার এখন মাছ হয়ে গিয়েছি, আমি কী-ই বা করতে পারি!

তার চেয়ে এই জলের তলাতেই ভাসি খানিকক্ষণ, একটি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করি। ও যতক্ষণ একেবারে তলিয়ে না যায়, ততক্ষণ ওরই চার পাশে ঘুরে ঘুরে ফিরি।

যেই মালা অদৃশ্য হল, অমনই সৌর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, সে আর মাছ নেই, ফের মানুষ হয়ে গিয়েছে।

নিজের প্রতি তীব্র বিরাগ আর নয়ন-পাখিদের সম্পর্কে গভীর ঘৃণা নিয়ে সৌর সেদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল।

সেই বিরাগ আর ঘৃণা মুছে দিয়েছিল নয়নই।

নতুন নীতি-বোধের পাঠ সম্পর্কে সৌরর 'দিনান্তলিপি'তে আছে :

'নয়ন বলছি-ল, আর আমি শুনছিলুম। একটু দূরে বসে ছিল পাখি, সে-ও শুনছিল।

নয়ন বলছিল, "আমরা খারাপ কিসে ?"

"তোমাদের বাড়িতে কত লোক আসে !"

"তোমাদের বাড়িতে আসে না ?"

থতমত খেয়ে বললুম, "আসে। কিন্তু—কিন্তু তোমরা তো ওদের নাচ দেখাও।"

নয়ন বলল, "হুঁ। আর ?"

"আর যা-তা সব জিনিস খাও। আমি সেদিন গন্ধ পেয়েছি। বোতল-ভাঙার শব্দ শুনেছি।"

নয়ন বলল, "বুঝলুম। এবার ভাই আমার কথার জবাব দাও। তুমি লেখাপড়া করছ কেন ?"

ভাল করে না ভেবেই জবাব দিলুম, "চাকরি পাব বলে। চাকরি না হলে পরে খাব কী ?"

নয়ন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, বলল, "তোমার কথার জবাব ভাই, তোমার কথাতেই আছে।"

রেগে বললুম, "হেঁয়ালি ছাড়।"

নয়ন বলল, "বুঝলে না? দুজনেরই দশা এক।"

আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, "এক হল? তোমরা খারাপ আর—"

"তোমরা ভাল, এই কথা বলবে তো?" আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নয়ন হাসতেই থাকল।

সে-হাসির অর্থ তখন বুঝি নি, পরে একটা মানে নিজেই করে নিয়েছিলুম। জগতে আসলে ভাল মন্দ বলে আলাদা দুটো জিনিস নেই, নয়ন কি সেদিন এই কথাই বলতে চেয়েছিল? হয়তো তাই। পরবর্তী জীবনের উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতায় আমিও বুঝেছি, সব জিনিস শুধু আছে, আমরাই তাদের ভাল আব মন্দ বলে দেখি। বস্তুর যদি কোন ধর্ম থাকে তবে তা তাদের থাকাটাই, তাদেব নিজস্ব কোন সদসৎ গুণ নেই। এখানে যা ভাল, ওখানে তা মন্দ হতে পারে, এখনকার ভাল তখন হয়তো মন্দ ছিল, পরে হয়তো আবার মন্দ হবে। আসলে আমাদের কালটাকেই আমরা চিরকাল, আর আমাদের গণ্ডীকে ব্রহ্মাণ্ড বলে ভুল করি।

সেই ভুল নয়ন ভেঙে দিয়েছিল।

আরও একটা ভুলও সেই ভেঙে দেয়, সে-কথায় এখন আসছি। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সকলকেই কিছু না কিছু গুণপনা অর্জন করতে হয়, আমি অর্জন করেছি আমার ডিগ্রী, নয়ন-পাখিরা তাদেব নৃত্যগীতকলা। জীবিকার জন্য আমাকেও তো শত লোকের মনোরঞ্জন করে চলতে হয়, কই, কখনও তো মনে হয় নি, আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি! আমার কাজটা সম্মানেব, আর নয়নদের যা করতে হয় সেটা অসম্মানের, আমার আপত্তি কি তাই? কিন্তু সম্মান-অসম্মানের লেবেলও এঁটেছি আমরাই।

তবে প্রশ্ন উঠবে, শুধু বেঁচে থাকবাব প্রয়োজনেই আমরা কে কতখানি দিই। সন্দেহ নেই, কাউকে কিছু বেশী দিতে হয়, কাউকে কম। কেউ মগজ বিক্রি করে, কেউ শরীরের শক্তি, কেউ হয়তো পুরোপুরি শরীরটাই। কিন্তু অনেকখানি দিয়েও কি অনেকখানি বাকী থাকে না? না থাকলে জীবনের মূল্যবোধ শূন্যে গিয়ে ঠেকত, বেঁচে থাকারই কোন মানে থাকত না। তা যে হয় নি তাতেই তো প্রমাণ পাওয়া গেল, দিয়ে-থুয়েও আমাদের হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। আমার যেমন আছে। আমার প্রতিদিনের কয়েকটি ঘণ্টা আমি আমার জীবিকার খাতিরে বিক্রি করেছি, কিন্তু বাসায় ফিরে আমি স্নানঘরে

ঢুকি, বেরিয়ে যখন আসি তখন আমার দেহ স্নিগ্ধ, মন স্নিগ্ধ, আমি আবার নিজেকে ফিরে পাই। নয়নও যে তা পায় না জানলুম কী করে! হয়তো পায়। হয়তো জীবিকা ওদেরও সবটা গ্রাস করে নি, বৃত্তিটাই মনোবৃত্তি হয়ে ওঠে নি। বাইরে থেকে যেমনই দেখি ওদের ভিতরের মানুষটা যা ছিল তাই আছে। মগজকে পণ্য করার চেয়ে দেহকে পণ্য করা বড পাপ, এই ধারণাটা প্রচলিত হতে পারে, কিন্তু আজ এর মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই নে।

এ-সব সৌরর পরিণত বয়সের ভাবনা, অভিজ্ঞতাকে নিকষে ঘষে ঘষে বিচারের ফল। তবে নয়নদের খানিকটা আলাদা রূপ সে তখনই দেখেছিল।

মনে আছে পর পর তিন-চার দিন ছাদে উঠে নয়ন বা পাখিকে দেখতে পায় নি। খানিকটা পায়চারি করে চলে আসত নীচে।

একদিন সৌর শুধু পাখিকে দেখতে পেল। তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনল কাছে।

"আজকাল তোমরা আর ছাদে আস না, কড়ি খেল না?" বলল পাখিকে। পাখি পাঁচিলের ঠিক ও-পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

"সময় পাই না যে।" পাখি বলল, "মাসির অসুখ।"

"নয়ন কোথায়?"

"ডাক্তারখানায় গেছে। মাসির জন্যে ওষুধ আনতে।"

"নয়ন গেছে কেন?"

"বা-রে!" পাখি ওর ঢলঢলে চোখ সৌরর চোখে রেখে বলল, "আমাদের আর কে আছে?"

হয়তো বেশী কিছু ভেবে বলে নি পাখি, অন্যমনস্কভাবে বলেছিল,—আর কে আছে? তবু কথাটা প্রবলভাবে সৌরকে আঘাত করল। আর কেউ নেই? তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখল পাখির দিকে; এই মেয়েটি আর তার এক সখী, যাদের ঘরে নানা ধরনের লোকের যাওয়া-আসা, সন্ধ্যায় যাদের গলায় সুর আর পায়ে ঘুঙুরের বোল ফোটে, তালে তালে হাতের তালিতে মুগ্ধ চোখের তারিফ বাজে, আসলে তাদের কেউ নেই, বিশ্বাস হতে চায় না, তবু কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্য।

তবু সৌর জিজ্ঞাসা করল, "চিত্তবাবু নিশিবাবু—এরা?"

"ওরা আর আসে না তো!"

"আসে না? কেন?"

পাখি আস্তে আস্তে বলল, "মাসির যে খুব খারাপ অসুখ। ছোঁয়াচে রোগ শুনছি। ওরা খুব ভয় পেয়েছে।"

সৌর বলল, "ও।" তার পর হঠাৎ বলে বসল, "আমাকে প্রেসক্রিপশন এনে দিও, আমি ওষুধ এনে দেব।"

পাখি বলল, "বেশ। নয়ন আসুক, ওকে বলব।"

সব শুনে নয়ন বলল, "থাক্ ভাই, কে আবার কী বলবে! তোমার এখানে বেশী এসে কাজ নেই। তাছাড়া অসুখটা তো সত্যিই ছোঁয়াচে।"

সৌর গোঁয়ারের মত গলায় বলল, "আমি কাউকে ভয় পাই না। মানুষকে না, অসুখকেও না।"

মাসির পিঠে আঙুল দিয়ে মলম মাখিয়ে দিচ্ছিল নয়ন, সৌর অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। বোঝাই যায়, নয়ন স্নান করে নি, কদিন করে নি কে জানে, ওর চুলের রঙ কটা, হাতে খড়ি উড়ছে।

নয়নের এই রূপ সৌর কোনদিন দেখে নি। একটা নিতান্ত সাদাসিধে শাড়ি পরে আছে নয়ন, এখন মাসির মাথা কোলে তুলে নিয়ে আলগোছে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছে। এই কি সেই নয়ন, যাকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সৌর রকে বসে বিড়ি টানতে দেখেছে, যার মুখে এক-এক সময় বিশ্রী কথার ফোয়ারা আর কুৎসিত ইয়ারকির তুবড়ি ছোটে, চোখে সুর্মা মেখে আর ভুরুর ভঙ্গিতে যে বিলাসিনী সাজে? এই নয়নই কি সন্ধ্যার আসরে পায়ে নির্লজ্জ নূপুর বেঁধে নেয়, আর ক্লান্ত হলে পুরুষ বন্ধুদের পাশে ধপ করে বসে পড়ে, গলা জড়িয়ে ধরে তাদের হাত থেকে মদের গ্লাস ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করে আর আরও পাঁচ রকম আবদার এবং বায়না ধরে?

সেই বিলাসিনী নয়নই কি বদলে গিয়ে এই সেবিকা হল, না এই সেবিকা সেই বিলাসিনীর মধ্যেই ছিল?

সৌর মুগ্ধ বিস্মিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এই পণ্য-রমণীর জীবনের অভ্যাসের একটা দিকই সে এতদিন দেখেছে, তার মমতাময়ী রূপের দিকটা আড়ালে ছিল। টানাটানির সংসারে যেমন গৃহিণীরা কখনও হাতের দুগাছি বালা বা কানের দুল খুলে দিতে বাধ্য হন, নয়নও জীবিকার কারণে তেমনই যা দিয়েছে, সে তার বাইরের জিনিস; ভিতরকার বস্তু খোয়া যায় নি।

কোমরে আঁচল বেঁধে এক বালতি জল টেনে নিয়ে এল নয়ন, মাসির মাথা

থুইয়ে দিল সে আর পাখি ধরাধরি করে। মাসি ঘুমিয়ে পড়লে সৌরর পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

"একটা কথা বলবে ?" সৌর বলল, "ও তোমার কেমন মাসি ?"

"নয়ন বলল, "সে আবার কী ! কোন সম্পর্ক আছে কি না জিজ্ঞাসা করছ ?"

"আপন নয় ?"

নয়ন খুব নিচু গলায় বলল, "না। পাতানো। ওরা তাই হয়।"

"ও !" সৌর উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ছেলেমানুষি কাজ করে ফেলল। নয়নের হাত দুটি চেপে ধরে বলল, "তুমি সত্যিই অদ্ভুত। তুমি দেবী।"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নয়ন বলল, "না ভাই, অতটা বাড়াবাড়ি কোর না। তা ছাড়া দেবীটেবী শুনে শুনে কান পচে গেছে। আমরা—আমরা তুমি সেদিন যা বলেছিলে তাই। মেয়েমানুষ—হয়তো খারাপ মেয়েমানুষ।"

সৌর প্রতিবাদ করল, "খারাপ হলে নিঃস্বার্থভাবে এমন সেবা শুশ্রূষা কেউ করে ? আচ্ছা এই মাসিই কি তোমাদের মারত না ?"

নয়ন বলল, "মারত। রাগ হলেই কিংবা ওর মতের বাইরে কিছু করলেই ঠাস ঠাস করে চড়-থাপ্পড় মারত। সেরে যদি ওঠে তবে আবার মারবে।"

'আবার মারবে।' নয়ন অত্যন্ত নির্বিকার গলায় বলল।

"ও কি তোমাদের টাকা ফাঁকি দেয় না ?"

নয়ন বলল, "দেয়।"

"তবু এত টান ?"

নয়ন বলল, "তবু। কী জান ভাই, এই টানটা একেবারে নিঃস্বার্থ না-ও তো হতে পারে !"

সৌর বুঝল না দেখে অগত্যা নয়নই বুঝিয়ে বলল, "মাসি না থাকলে আমরা দাঁড়াব কোথায় ?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নয়ন, "হয়তো আরও ঢের নীচে নেমে এত দিন বাড়ি-বাড়ি বাসন মেজে চালাতে হত। আমরা ঝি হয়ে যেতাম। আমাদের মাসিই বাঁচিয়েছে।"

হঠাৎ আর-একটা কথা মনে পড়ল সৌরর।—"কেন, চিত্তবাবু নিশিবাবুরা তো আছে !"

তিক্ত হেসে নয়ন বলল, "ভাই, সব বাবুকেই চিনি।"

"তোমাদের ওরা থিয়েটারে পার্ট দেবে না ?"

নয়ন বলল, "ধাপ্পা, সব ধাপ্পা। ধাপ্পা যে তা ওরাও জানে, আমরাও জানি।

তবে জানি যে, সেটা টের পেতে দিই না। ওরা মিছে কথা বলে একটু বেশী খাতির পাবে, আরও দুটো মিঠে বুলি শুনবে, এই আশায়। আমরাও বুঝেসুঝেই ভান করি। তা ছাড়া নাটকের কথাগুলো মুখস্থ করতে নেহাত খারাপও তো লাগে না। ওই নাটক ছিল বলেই তো আমরা আলাদা ধরনের কথা বলা শিখলাম, আলাদা জগতের ছিটেফোঁটা খবর পেলাম। আমাদের বরং উপকারই হয়েছে।"

নয়ন বলল, "মাসি নেই।"

পাখি বলল, "মাসি নেই।"

পাখি কাঁদছিল। নয়নের চোখ শুকনো। আর, কারও মৃত্যু-সংবাদ শুনলে মুখটিতে কতটা আহত ভঙ্গি ফুটিয়ে রাখতে হয়, সেটা ঠিক করতে না পেরে সৌর হতভম্বের মত চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিল।

কামিনী মাসি মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে আজ দুপুরে, যখন কাকগুলো কা-কা করে ডেকে ওঠে আর গেঞ্জির কলের বাঁশিটা ভাঙা গলায় মরা কান্না জুড়ে দেয়, তখন।

নয়ন সৌরকে সব বলছিল। সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই প্রথমটায় টের পায় নি। মাসি মরবার আগে ওকে ডেকেছিল কিনা, একটু জল চেয়েছিল কিনা, সে জানে না, জানবার এখন উপায়ও নেই।

মাসিকে দু হাত দিয়ে ঠেলছিল নয়ন, আর বলছিল, 'মাসি, ওঠ, ওঠ।' মাসি নড়ছিল না। ওর চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভয় হল নয়নের, সে পাখিকে চেঁচিয়ে ডাকল।

পাখি এসেই ডুকরে কেঁদে উঠল। বয়সে ছোট হলে কী হয়, একবার দেখেই সে টের পেয়েছিল।

পাখি কাঁদছিল তখনও। মাসি তাকে কত ভালবাসত, কবে মেরেছিল, আদর করেছিল কবে, সব এই শোকের মুহূর্তে পাখির মনে পড়ছে। মাসি কী খেতে ভালবাসত, পাখি তাও বলল।

নয়ন ধমক দিয়ে বলল, "তুই থাম্ তো। আমার দরকারী কথাটা সেরে নিই।" সৌরর দিকে চেয়ে বলল, "ভাই, এখন কী করব?"

সৌর কী আর জবাব দেবে! চেয়েই রইল।

উপায় নয়ন নিজেই ঠিক করল। বলল, "তোমাকে তাই একটা কাজ করতে হবে। চিত্ত আর নিশিবাবুকে খবর দিতে হবে।"

"ওরা আসবে ?"

নয়ন বলল, "আসতেও পারে। খোঁজ কর তো আগে।"

সেদিন, সৌরর মনে আছে, অকাল-বর্ষণে পথে পথে কাদা, কোথাও জল, ট্রাম-বাস থমকে দাঁড়িয়ে আছে, রাগী আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ করে আছে, মাঝে মাঝে আস্ফালনও করছে, সুবিধে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই শহরটাকে রসাতলে পাঠাবে।

পা টিপে কাদা বাঁচিয়ে সৌর এগতে থাকল।

চিত্তবাবু বা নিশিবাবুর বাসা সে চিনত না। কলকাতার রাস্তা তখনও তার নখদর্পণে আসে নি। চিরকুট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে, লোককে জিজ্ঞাসা করে করে যে-বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিল, তার বিশ্বাস, সেই বাড়িটাই চিত্তবাবুর। তবুও চৌকাঠে আঁটা ফলকে লেখা নম্বরটা মিলিয়ে দেখল সে—এই বাড়িই বটে।

ভারী কাঠের দরজা, সেকেলে প্রাসাদের সদর দেউড়ির মত। কব্জাগুলো রাগে গজগজ করছিল, তবু অনিচ্ছায় সরছিলও একটু একটু, অবশেষে পাল্লা সামান্য ফাঁক হল। সেই ফাঁকে একখানি মুখ দেখা গেল, যার মুখ, সৌরর ধারণা, সেই লোকটা হিমালয়ের সানুদেশের কোন অঞ্চলের হবে।

সন্দিগ্ধ, মূঢ়, ভাবলেশহীন দৃষ্টি দিয়ে লোকটা সৌরকে দেখছিল। লেহন করছিল বললেই ঠিক বলা হয়। তার বয়স কত অনুমান করার সাধ্য সৌরর নেই, সে বারো বছর বয়সের বালক, না চল্লিশ-পার-করা-প্রৌঢ়, তার মুখে অন্তত তার কোন হিসাব লেখা নেই।

সৌর বলল, "চিত্তবাবু আছেন ?"

লোকটা তখন দরজার পাল্লা আলগা করে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ভরসা পেয়ে দু পা এগিয়ে গেল সৌর। না, লোকটা তাকে বাধা দিল না, বরং সৌর কাছে আসতেই মুখ ফিরিয়ে চলতে শুধু করল।

সৌর অনুমান করল, লোকটা তাকে পথ দেখাবে। ভিতরে উঠন, কিন্তু ঢাকা নয়, জাল-লাগানো। উঠনের তিন পাশে বারান্দা, বারান্দা বরাবর ছোট ছোট ঘর—পাখির খুপরির মত। জানলা নেই, ঘুলঘুলি আছে, এসব ঘর মালিকদের কী কাজে লাগে ? এরা কি পায়রা পোষে ?

পায়রা না পুষুক, অন্ধকার পোষে। কে জানে, অন্ধকার পোষাও হয়তো কোন কোন মানুষের শখ।

উঠনের এক কোণ এঁটো বাসনের স্তূপ, আম-কাঁঠালের খোসা থেকে পচা ভাপসা গন্ধ উঠছে, ঝাঁঝরি বন্ধ হয়ে গিয়ে উঠনটা একটা ছড়ানো চৌবাচ্চার চেহারা নেবার উপক্রম করেছে। কয়েকটি মোচার খোলা জলে ভাসছিল। একটি ঘরে উনুনে আঁচ দিয়েছিল কারা। সৌরর চোখ জ্বালা করছিল; পথ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না, কতকটা আন্দাজে, কতকটা নির্বাক পাহাড়ী লোকটাকে অনুসরণ করে সৌর এগিয়ে যাচ্ছিল।

এক কোণে দড়ির চারপাই বিছিয়ে কারা তাস খেলছে, আশ্চর্য, এই ধোঁয়ায় ওদের কোন ধৈর্যচ্যুতি নেই। ঢিলে পিরেন আর খাটো প্যাণ্ট পরা একজন লোক তার চুলগুলো চূড়োর মত করে বাঁধছিল। সৌর অনুমান করল, লোকটি পঞ্চনদবাসী হবে। কয়েকটি ছাগল বাঁধা ছিল এক কোণে, একটি কুকুর ওকে দেখেই তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছিল, আর উপবীতধারী সুপুষ্টাঙ্গ জনকয়েক লোক বড় একটা লোটায় শরবত ঘুঁটছিল। আর একটা লোক, এও পাহাড়ী বোধ হয়, একটা ধারালো ছুরিতে শান দিচ্ছিল। ছাগল কয়টি ভীত-করুণ চোখে তার কাজ দেখছিল।

এরা কারা, এ-বাড়ি কার?

একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ির নীচে এসে সৌরর পথপ্রদর্শক থামল। এক নিমেষ মাত্র। তার পরই আবার সে স্ক্রুর মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। সৌর বুঝতে পেরেছিল, তাকেও উঠতে হবে।

সিঁড়ি টলছিল, বলা যায় না হয়তো টলছিল সৌরর পা দুখানাও। অনিশ্চয়তায়, শ্রমে, এককালে যখন রন-পায়ে চলা অভ্যাস করেছিল তখনও এ-রকম হত। দোতলায় একটা বন্ধ দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটি সরে গেল।

ভয়ে ভয়ে, সঙ্কোচে সন্তর্পণে সৌর দরজা ঠেলল। বন্ধ ছিল না, ঠেলতেই আলগা হয়ে গেল কবাট। কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার, সৌর প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। কোথায় পচা মাছ ভাজছিল বুঝি কেউ, সৌরকে নাকে রুমাল-চাপা দিতে হল।

গলা পরিষ্কার করে সৌর ডাকল, "চিত্তবাবু—চিত্তবাবু বাড়ি আছেন?"

ততক্ষণে ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের নিজেরই বুঝি গোপন একটুখানি আলো আছে, প্রথমে সেটা বুজিয়ে রাখে, পরে মুঠি আলগা করে সেই আলোয় নিজেকে দেখে।

ঝাপসা আলোয় সৌর দেখতে পেল, ঘরের মেঝেয় মুড়ি ছড়ানো, কয়েকটি বাচ্চা গোল হয়ে বসে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, মুরগী কবুতর যেমন করে। হঠাৎ ঝনঝন করে কাঁসার একটা বাটি কার হাত থেকে মেঝেয় খসে পড়ল, একসঙ্গে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল দুটি বাচ্চা, তারপর ঘরময় কিছুক্ষণ ধরে যা চলতে থাকল, তার একমাত্র উপমা মেছোহাটায় ভূতের নৃত্য। মোটা, সরু, ভাঙা, খোনা, শিশুদের কণ্ঠস্বর যে কত রকমের হতে পারে সৌর তার অভিজ্ঞতা অর্জন করল।

এই অনৈকতানকে ডুবিয়ে দিয়ে চিত্তবাবুকে ডাক দিতে হবে। সৌর সেই চেষ্টাই করল।

এইবার ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল ছোট একটি ছেলে। আট কি নয় বছর তার বয়স হবে—অবাক হয়ে দেখল, তার পরনে কিছু নেই। ঘরে অন্য যেসব শিশু এতক্ষণ কলরব করছিল, তাদের বসনের স্বল্পতাও সে তখনই লক্ষ্য করল।

ছেলেটি বলল, "কাকে চাই ?"

"চিত্তবাবু—চিত্তবাবু আছেন ?"

কোন মন্তব্য না করে ছেলেটি ফিরে গেল ভিড়ের মধ্যে, বাকীগুলির মধ্যে মিশে গেল, কানে কানে সে যেন কী বলল একজনকে। যাকে বলল, সে আবার আর-একজনকে কানে কানে কিছু বলল। এক মুহূর্তে চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে সমস্ত ঘরে ফিসফিস আর কানাকানি শুরু হল। তারপর সব কটি ছেলেমেয়ে পলকে অদৃশ্য হল, পাশের কামরার দরজা ঠেলে পালাল সকলে, বারান্দায় তাদের দুদ্দাড় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

সৌর বিচিত্র এক নতুন দেশে এসেছে। ঝুল-বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে উঠনটা ঠাহর করতে চাইল—চারপায়ার তাসের আসর তখনও চলেছে। উঠনে জল নেই, ধোঁয়াও নেই, খানিক আগে যিনি তাঁর কেশরাশি চূড়ার মত করে বেঁধেছিলেন, তিনি এখন দাড়ির পরিচর্যায় ব্যস্ত। রঙিন ঘাঘরা পরা কয়েকটি মেয়ে অকারণেই বারান্দায় বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে গেল।

সেই নির্বাক পথপ্রদর্শককে সৌর কোথাও দেখতে পেল না।

আজ সারাদিনই মেঘ ; মেঘে মেঘে কতখানি বেলা গেল সৌর অনুমান করতেও পারল না। এখন বৃষ্টি ধরেছে, কিন্তু আকাশের ঘনঘোর কাটে নি, যে-কোন মুহূর্তেই আবার প্রবল ধারে বর্ষণ শুরু হতে পারে।

ওদিকে, অনেক দূরে যে দুটি অনাথ-অসহায় মেয়ে একটি স্ত্রীলোকের শব আগলে বসে আছে, তাদের কথাও সৌরর মনে পড়ল। সে ফিরবে, খোঁজ নিয়ে যাবে চিত্তবাবু বা নিশিবাবুর, তবে কামিনী মাসির সৎকারের একটা হিল্লে হবে।

দেখতে দেখতে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হল—সৌরর গা ছমছম করছিল। কতক্ষণ সে এসেছে এখানে কে জানে! আরও কতক্ষণ থাকতে হবে, তাও জানা নেই, এখান থেকে এই রহস্যপুরীর অধিবাসীরা তাকে বেরু হতে দিলে হয়!

একটি গামছা পরনে, আর একটি দিয়ে গা ঢেকে এক মহিলা এক ঘড়া জল নিয়ে এদিকেই আসছিলেন, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে সৌর ফিরে তাকাল। ভাবল, এঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি না! কিন্তু সঙ্কোচে এগতে পারল না।

একবার সৌর ভাবল, পালাই, চিত্তবাবুর খবর নিয়ে কাজ নেই, তার পরেই তার মনে হল, যাবই বা কোথায়? নয়ন যে আমার আশায় বসে আছে, কী বলব তাকে গিয়ে? সৌর যেন একটু রেগেও উঠল—সেধে আচ্ছা দায় নিয়েছি নিজের ঘাড়ে। কেন, আমি না থাকলে কী হত? ওদের মড়া কি পুড়ত না, ঘরেই বাসী হত, পচত? এই তো ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এর পর দিনটা হঠাৎ চোখ বুজবে—তখন এই গোলকধাঁধা থেকে আমি বেরবার পথও পাব না।

পিছনের দরজা তখনও হাঁ হয়ে ছিল। যদি কাউকে দেখা যায়, সেই আশায় সৌর ফিরে তাকাল। না, কেউ নেই। সেই নগ্ন-অর্ধনগ্ন কাচ্চাবাচ্চার পাল পলকে অদৃশ্য হয়েছে, এই বাড়িটাতে সবই যেন ভোজবাজি, কারও আর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

সারা ঘরে মুড়িগুলো হাওয়ায় আরও ছড়িয়ে পড়ছিল, দু-একটা চৌকাঠ ডিঙিয়েও এসেছিল এ-ধারে। কয়েকটা চড়ুই কোথা থেকে উড়ে এসে সেগুলো খেতে শুরু করেছিল। বারান্দায় ঝোলানো খাঁচায় একটা কাকাতুয়া তাই দেখে চঞ্চল হয়ে ছটফট করছিল, আর রেলিংয়ে বসে ভিজে একটা ঈর্ষাতুর কাক কর্কশ গলায় চড়ুইগুলোকে ধমক দিচ্ছিল।

সৌর কাকটাকে তাড়িয়ে দিল।

এবারে বুঝি জোর বৃষ্টি নামল। এই বর্ষার দিনকে বিশ্বাস নেই,—এই রোদ, এই প্রলয়। বারান্দায় দাঁড়ানো মুশকিল হবে, সৌর বুঝতে পারছিল। অগত্যা

দাঁড়াল দেয়াল ঘেঁষে। এখান থেকে আড়চোখে তাকালে ঘরের ভিতরটা আরও স্পষ্ট দেখা যায়।

ওদিকের জানলা খোলা, ছাটে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

যাকে নয়নদের ঘরে দেখেছে ফুরফুরে শৌখিনবাবু, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি, পায়ে লপেটা জরিদার নাগরা, অথবা অ্যালবার্ট বা চকচকে গ্রীসিয়ান, সাবানে ফাঁপানো ওলটানো চুল হাওয়ায় ফুরফুর, যার মণিবন্ধে জড়ানো থাকে বেলফুলের মালা, আর রুমালে আতর-এসেন্সের গন্ধ ভুরভুর করে—(চিত্তবাবু যে কী বাবু, তুমি জান না, নয়ন সৌরকে একদিন বলেছিল) —তার ঘরের এমন চেহারা, ওই হতশ্রী, অভব্য বাচ্চাগুলো তারই ছেলেমেয়ে ?

সৌরর ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল।

নয়নদের ঘরে চিত্তবাবুরা যখন মাইফেল বসিয়েছেন, সৌর তখন তার কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। সে দেখেছে, চিত্তবাবুর হাতে দামী দামী পাথরের চার-পাঁচটা আংটি, যাকে বিজলী আলো ছুঁতে গিয়ে ঠিকরে ফিরে আসে। আর সেই হাতে সরু-কোমর কাচের গ্লাস থরথর করে কাঁপে। গান শোনেন চিত্তবাবু আব স্খলিত গলায় তারিফ করেন। সৌর অনুভব করল, বাইবের চিত্তবাবু আর ঘরের চিত্তবাবুতে অনেক তফাত।

ঠিক তখনই যিনি ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলেন, সৌর বুঝতে পারল না, একটু আগে তাকেই সিক্ত-সংক্ষিপ্ত প্রচ্ছদে এখান দিয়েই এক-ঘড়া জল নিয়ে যেতে দেখেছে কিনা। এই মহিলাটির আবক্ষ ঘোমটা।

শেষবারের মত মরিয়া হয়ে সৌর জিজ্ঞাসা করল, "চিত্তবাবু আছেন ?"

ঘোমটা নড়ে উঠল, সৌর বুঝল, নেই। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, "চিত্তবাবু কোথায় ?"

ঘোমটা আবার নড়ল, সৌর বুঝল এই ব্রাডাবতী কলাবউ তার কথার উত্তর দেবে না। হতাশায় অধীর হয়ে সে বলে উঠল, "আর-কাউকে ডেকে আনুন না, সে আমার কথার জবাব দিক। চিত্তবাবুকে আমার যে বড় দরকার।"

উলঙ্গপ্রায় একটি ছেলে তখনই কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়াল। ঘোমটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই মহিলাটি তাকে ঠেলে দিলেন।

ছেলেটি বলল, "ইস ! ভারি যে লজ্জা ! দাও টাকা দাও।"

ঘোমটার আড়াল থেকে এবার চাপা একটা তর্জন শোনা গেল।

একে একে ওরা আবার ফিরে আসছিল, সেই নগ্ন-অর্ধনগ্ন কাচ্চাবাচ্চার পাল। হামাগুড়ি দিয়ে এসেছিল একটি ফড়িংয়ের মত রোগা শিশু, সে তার মায়ের পায়ের বুড়ো আঙুলটায় মুখের লালা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ওরা সকলে আবার কলরব শুরু করে দিয়েছে। নাছোড় ছেলেটি তখনও থেকে থেকে বলছে, "দাও, টাকা দাও।"

ছেঁড়া-ফ্রক-পরা একটি মেয়ে—সেই সবচেয়ে মাথায় বড়—ধমক দিয়ে বলে উঠল, "কেন মিছিমিছি বকছিস? জানিস নে, টাকা নেই? বাড়িওয়ালা সকালে মাকে যাচ্ছেতাই কী সব বলে গেল, মনে নেই? আজ তিন দিন খেস্তিটার জন্যেও মা দুধ রাখতে পারে নি, জানিস না? বাবাও তিন দিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে—"

মেয়েটি আর বলতে পেল না, ঘোমটা-পরা মহিলাটি একটি হাত বাড়িয়ে ওর মুখ চেপে ধরেছিলেন।

সৌর এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝেছিল, আর অপেক্ষা করা বৃথা—চিত্তবাবুর দেখা পাওয়া যাবে না।

ঘোরানো টলমল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সৌর এ-ও ভাবছিল, চিত্তবাবুর সে যে দেখা পেল না, তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। চিত্তবাবুকে সে আজ দেখতে পেয়েছে বইকি—যার হাতে মদের গ্লাস কাঁপে, ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে যে রসিক ভদ্রলোক নয়নদের ওখানে সন্ধ্যা কাটান, ঠাট্টায় কথায় সকলকে মাতিয়ে রাখেন, সেই চিত্তবাবু নন, ইনি অন্য একজন।

এঁর পরিচয় এই নিরাবরণ অশিষ্ট ক্ষুধার্ত লোভী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

এই চিত্তবাবুকে ঠকিয়ে ওখানকার চিত্তবাবু হাজারো মজার মাশুল যোগাড় করেন। এই চিত্তবাবুকে সৌর আজ দেখেছে বইকি। ছেঁড়া গেঞ্জি আর লুঙ্গি-পরা মানুষটি চিটচিটে বিছানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকে, বাড়িওয়ালা আর গোয়ালা আর হরেক পাওনাদারকে সামলায় তার বউ, তার ছেলেমেয়েরা মুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

চোখে না দেখেও এই মানুষটির ছবি সৌর মনে মনে এঁকে নিয়েছে।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বিড়িতে টান দিতে দিতে সকালের চিত্তবাবু স্বপ্ন দেখেন, কখন ঘাড়ে-গলায় পাউডার ছড়িয়ে, জামায় আতর ঢেলে আবার বিকালের চিত্তবাবু হবেন।

নিশিবাবু বললেন, "চিনি ভাই, চিনি। তোমার চিত্তবাবুকে চিনি। আর নয়নবিবি পাখিবিবিদের সকলকেই চিনি। কলকাতার বাবু আর বিবিদের কাউকে চিনতেই বাকী নেই।"

সামনে কাগজপত্র ছড়ানো, চোখে চশমা আঁটা, নিশিবাবু ঘরে বসে নথিপত্র দেখছিলেন।

মুখ তুলে সৌরর কথা শুনছিলেন, কদাচিৎ মন্তব্য করছিলেন দুই-একটা কথার ওপরে, আবার কাগজপত্রের মধ্যেই ডুব দিচ্ছিলেন।

সৌর নিশিবাবুকে সেদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিচ্ছিল। দিচ্ছিল, থামছিল, চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মাঝে মাঝে, ওর মুখ যখন বন্ধ নেই তখনও, মনে মনে ভাবছিল, মিছেই আমি বক বক করে মরছি, উনি একটা কথাও হয়তো শুনছেন না।

অথচ বেলা যায়। নয়ন আর পাখি এতক্ষণ নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কামিনী মাসির একটা গতি তো করা চাই।

চিত্তবাবুর বাড়িতে যা যা ঘটেছিল, সব বলে দম নেবার জন্যে সৌর চুপ করল।

চশমাটা ঠেলে একেবারে নাকের ডগায় এনে নিশিবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই।" চশমার ওপর দিয়ে নিশিবাবু তার দিকে চেয়ে আছেন। বলছেন, ঠিক বলেছ। সৌর বুঝতে পারছিল না, তার কোন্ কথাটা ঠিক। আর বেঠিক কথাও কি সে কিছু বলেছে?"

"ঠিক বলেছ," নিশিবাবু বললেন, "চিত্তটা ওই রকমই। বাইরে ফুটানি আর চেকনাই, ভিতরটা ফাঁপা। ওকে জানি তো অনেক দিন থেকেই। স্মিথ জনসন অ্যাণ্ড স্মিথ শেয়ার-ডীলার কোম্পানির বাড়িতে ওকে কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল কে? আর আমার কাছেই কিনা ও চাল দেখাতে আসে! আরে, ও-রকম বাজে কাপ্তান আমার ঢের ঢের দেখা আছে।"

নিশিবাবু একটু সময় চুপ করলেন, কিন্তু তখনও ওঁর চোখ সৌরর ওপরই ছিল। চোখ দুটি বলছিল, দম নিই, ফের বলতে শুরু করব।

শুরু নিশিবাবু করলেনও। মিনিট দশেক ধরে একটানা বক্তৃতা দিয়ে চিত্তবাবু কবে তার সঙ্গে কী কী চালাকি করতে গিয়েছিল, তার একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন। অবশেষে বললেন, "মিথ্যুক, জালিয়াত, জোচ্চোর।"

সৌর বুঝল, গল্পের শেষে যেমন নীতিবাক্য থাকে, এই বিশেষণ তিনটিও তাই, নিশিবাবুর বক্তৃতার সারকথা।

সে ভাবছিল, আবার নয়ন-পাখিদের প্রসঙ্গ তুলে নিশিবাবুকে মনে করিয়ে দিতে হবে, কামিনী মাসির শব বাসী হতে চলল।

নিশিবাবু আবার দরকারী কাগজপত্রে নিমগ্ন-মন হয়ে পড়েছিলেন। দেওয়ালের প্রকাণ্ড বড় ক্লকটা টক টক করে বাজছিল। আর কিছুই করবার নেই বলে হতাশ সৌর অগত্যা ওই ঘড়িটার কথাই ভাবতে বসল। কী আশ্চর্য দেখ, সময় চলে যাচ্ছে, সময় বাজছে। আবার ভাবল, সময় তো বাজে না, সময়ের সঙ্গীত অনাহত, কানে শোনাও যায় না। এই ঘড়িটা তবে কী! অনেক ভেবেচিন্তে সৌর ঠিক করল ঘড়িটা আসলে তবলার মতন, সময়ের অশ্রুত সঙ্গীতে নিয়মিত তালে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সৌরর অবশ্য মিনিট তিনেকের বেশী লাগে নি। সে আবার চোখ ফিরিয়ে চাইল নিশিবাবুর দিকে। নিশিবাবু তখনও কাগজপত্র দেখছেন। শেষ-বেলার মেঘ-ভাঙা রোদের খানিকটা পড়েছে তাঁর মুখের একাংশে আর চুলে, মুখটাকে কেমন বুড়ো-বুড়ো আর চুলগুলির কাঁচা-পাকা প্রকৃতিটাকে একেবারে প্রকট করে দিয়েছে। মুখের সর্বত্র তো রোদ পড়ে নি, পড়েছিল নিশিবাবুর চোয়ালের উঁচু হাড়টাতে, সেটাকে ছোট্ট একটা গুলির মত লাগছিল। তার নীচেই একটা গর্ত, সেখানে চামড়া কোঁচকানো। সেখানে আলো নেই, তাই অন্ধকার। নিশিবাবুর কানের লতিতে একটা পাকা চুলও সৌরর নজরে পড়ল।

এইবার, সৌর স্পষ্ট অনুভব করল, সে ভুল ঠিকানায় এসেছে। এই নিশি-বাবুকেও তো সে চেনে না, আগে কোনদিন দেখে নি। নথিপত্রের উপরে ঝুঁকে-পড়া মাথাটা কেমন রোগা শুকনো আর লম্বাটে দেখাচ্ছে। এঁর মধ্যে সেই ভদ্রলোক কই, যিনি গদগদ গলায় নয়ন আর পাখিকে নাটক পড়ে শোনান?

সে-সব নাটকের কিছু কিছু কথা সৌররও জানা ছিল: প্রণয় অভিমান

হা-হুতাশ ঈর্ষা আত্মদান ইত্যাদি যার বিষয়বস্তু, সেই পাণ্ডুলিপিগুলি কি এঁরই রচনা ?

টেলিফোন বেজে উঠল, হাত বাড়িয়ে নিশিবাবু তুলে নিলেন রিসিভার। কথা বলতে শুরু করলেন, মৃদু-গম্ভীর স্বরে, আর মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দিগ্ধ চোখে সৌরর দিকে চাইছিলেন। সৌর কিন্তু কিছু বুঝছিল না, যদিও এটুকু ধরে নিতে তার অসুবিধে হয় নি যে, কথাটা গোপন এবং বৈষয়িক। এর চেয়ে বেশী কিছু সেও জানে না। জানবার কৌতূহলও নেই, তবু নিশিবাবুর এই অস্বস্তি কেন ?

প্রৌঢ়, পরম পাকা একখানি মুখ সৌরর চোখে ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত চেহারার মত আরও যেন কিম্ভূত হয়ে উঠেছিল।

টেলিফোন রেখে দিয়ে নিশিবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তারপর কী যেন বলছিলে?"

নিশিবাবুর মুখে বিরক্তির কয়েকটি রেখা, কণ্ঠস্বরেও কিছু যেন অধীরতা, কিছু অসন্তোষ। একজন সাক্ষীর সম্মুখে গোপনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে হল বলে তিনি নিজের ওপরই যেন খানিকটা চটে গিয়েছেন।

তাই কাগজগুলোর গোলাপী ফিতেতে গিঁট দিতে দিতে অসহিষ্ণু গলায় বললেন, "কী যেন বলছিলে—"

সৌর বলল, "কামিনী মাসি—" (বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল, সে নিজেও কখন কামিনীকে মাসি বলতে শুরু করেছে।)

নিশিবাবু বললেন, "সী ওয়াজ এ বিচ্। মরেছে ? বাঁচা গেছে।"

হতভম্ব সৌর হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

নিশিবাবুই বলে গেলেন, "শয়তানী। সারা জীবন লোককে ঠকিয়েছে। সবাইকে। আমাকে—হ্যাঁ, আমাকেও।"

ক্ষীণ গলায় সৌর তবু বলতে গেল, "সৎকারের কোন বন্দোবস্ত হয় নি, ঘরেই পড়ে থাকবে ?"

"থাকুক। গলুক। পচুক।" নিশিবাবু বললেন থেমে থেমে, প্রতিহিংস্র উল্লাসে।

সৌর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হয়তো সে ভুল শুনছে। কিন্তু নিশিবাবুর দৃষ্টির নির্মমতা তো ভুল হবার নয়। সৌর ভাবল, এরা এমনই। আসলে মায়া-দয়া-প্রীতি বলে কোন কিছু কারও প্রতিই এদের নেই। যে-চিত্তবাবুর সঙ্গে নিশিবাবুকে সে নয়নদের ঘরে গলাগলি করতে

দেখেছে তাকে নিশিবাবু কী চোখে দেখেন, তাঁর পরিচয় সে তো খানিক আগেই পেয়েছে। চিত্তবাবুর সঙ্গে দেখা হলে তিনিও হয়তো ঠিক একই উক্তি করতেন নিশিবাবুর প্রসঙ্গ উঠলে।

আর যে-কামিনীর ঘরে গড়াগড়ি দিয়েছেন নিশিবাবু, তার সম্পর্কে কুৎসিত কটূক্তি সৌর তো স্বকর্ণেই শুনল।

এই জগতের মানুষেরা একে অপরের সঙ্গে মেশে, শুধু নেশার বিলাসে স্ফূর্তির প্রয়োজনে ; কিন্তু মেলে না, কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

সৌর উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল, "আপনি তা হলে উঠবেন না? ব্যবস্থা করবেন না?"

"আমি?" মাথার উপরে দু হাত তুলে নিশিবাবু বললেন, "আমি কোথায় যাব, কী করেই বা যাব, আমার সময় কই? এক্ষুনি বেরুতে হবে এক মক্কেলের বাড়িতে, একটা প্রপার্টি ডীলের ব্যাপার আছে।"

নিশিবাবু বলে গেলেন দ্রুত, কিন্তু ঠাণ্ডা সুনিশ্চিত স্বরে। তাঁর মধ্যে অভিনয়-পটু নাট্যকারের চিহ্নমাত্র সৌর খুঁজে পেল না। সে যেন কালো-আচকান-পরা এক ঝুনো ঝানু উকিলকে দেখছিল।

সৌর তবু বলল, "নয়ন আর পাখি খুব অসুবিধেয় পড়বে।"

নিশিবাবু বললেন, "ওয়েল দ্যাট'স দেয়ার ফিউনারাল।" আস্তে আস্তে সৌরর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "আরে ভাই, তোমাদের বয়সে আমরাও নাইট-এরান্ট্রি করেছি, শিভালরি দেখিয়েছি। এখন এই বয়সে সার কথা বুঝি, আগে কাজ পরে নয়ন আর পাখি।"

পাইপ ধরালেন নিশিবাবু: "দিনরাত নথি, মুহুরী মক্কেল নিয়ে কাটে, তাই মাঝে মাঝে নাটক লিখি, ওখানে গিয়ে ওদের পড়ে শোনাই। খানিকটা রিলাকসেশন। কোমরের কসি ঢিলে করে দিয়ে একটু হাঁপ ছাড়া আর কি! একা একা পেশেন্স খেলা বা ক্রশওঅর্ড সলভ্ করার মধ্যে একটা মজা আছে না! এও অনেকটা সেই রকম।"

সৌর বলল, "কিন্তু আমি জানতাম, ওদের আপনি স্নেহ করেন।"

ঠোঁট দুটি ছুঁচলো করে তার ভিতর দিয়ে হাওয়া বের করে নিয়ে নিশিবাবু তাচ্ছিল্য সূচনা করলেন। বললেন, "পুঃ, স্নেহ? করতাম এক কালে, তখনও ওরা এমন ব্যবসা শেখে নি। কামিনী ওদেরও নষ্ট করেছে, ওদের লোভ বাড়িয়েছে; আমার কাছে থেকে মাসহারা পেত এই শর্তে যে, ও-বাড়িতে

ঢোকার এক্তিয়ার একা আমারই থাকবে। কিন্তু সে-কথার খেলাপ কামিনী করল কেন? এরাই বা কেন তার সহায় হল?"

সৌর মৃদু গলায় বলতে গেল, "ওরা ছেলেমানুষ" কিন্তু নিশিবাবু তাকে এক রকম ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "লেট দেম স্টু ইন দেয়ার ওন জুস।"

উচ্চারণের ভঙ্গিতে তাঁর কথাটা প্রাণদণ্ডের রায়ের মত শোনাল।

সৌর বেরিয়ে আসছিল, নিশিবাবু ওর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "ইয়ং ম্যান, তুমি বরং একবার সৎকার সমিতির অফিস যাও। সেবা ওদের ব্রত—এ-সব কাজ ওরা করে থাকে বলে শুনেছি।"

সেই টাকা সৌর নেয় নি, সে হেঁটে হেঁটেই ফিরে আসছিল, এখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টিই বিকালটাকে সন্ধ্যা করে দিয়েছে। বাতাসের ঝাপটায় মাঝে মাঝে এক-একটা লাইটপোস্ট কানা হয়ে ছায়া-শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এখনও কি ওরা, সৌর কাদা বাঁচিয়ে কাপড় সামলে চলছিল আর ভাবছিল, এখনও কি ওরা ওর অপেক্ষায় বসে আছে? কোন একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে। সৌর প্রার্থনা করতে লাগল, তাই যেন হয়, হে ভগবান, কামিনীর জীবন তো তুমি নিয়েছ, এবার তার দেহটার একটা গতি করে দাও।

ফলের আড়তের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা পচা ভাপসা গন্ধ নাকে এল: ন্যাসপাতিগুলো কতদিন ধরে পচছে কে জানে! থোকো থোকো আঙুরগুলোর গায়ে কালো কালো তিলের মত ছিটে লেগেছে। সৌরর গা বমি-বমি করছিল। মিঠাইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পেটের ভিতরটাই যেন ঠেলে বাইরে আসতে চাইল।

তাড়াতাড়ি পা চালাতে হল সৌরকে। ভাগ্যিস একটা ফুলের দোকান ছিল সামনেই, ভিজে ভিজে কেয়ার গন্ধ ভুরভুর করছে। রজনীগন্ধার শীর্ণ ডাঁটাগুলো শো-কেসের পাশে দাঁড় করানো আছে।

কী জানি কেন, সৌরর ঠিক তখনই নয়ন আর পাখির কথা মনে পড়ে গেল।

বুক ভরে শ্বাস টেনে সৌর এগতে শুরু করেছিল, কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে তাকে আবার থমকে দাঁড়াতে হল। বৃষ্টিটা আবার বড় বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু হয়েছে।

আর তখনই সৌরর চোখে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা পড়ল।

একটা বাঁশে কী একটা যেন পুঁটলির মত জড়িয়ে নয়ন আর পাখি পথ চলছিল। বৃষ্টিতে ওদের জামা-কাপড় ভিজে যাচ্ছিল, তবু ওরা থামছিল না, এক হাত দিয়ে কাঁধে রাখা বাঁশের কোণ শক্ত করে চেপে ধরে ছিল। অন্য হাতে যতটা নির্লজ্জ হতে পারে, ততটাই হয়ে পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিল। রাস্তার দু পাশের লোক দেখছিল আর হাসছিল।

কী আছে ওই পুঁটলিতে? বুঝতে অবশ্য সৌরর দেরি হল না—কামিনী মাসির মৃতদেহ। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে নয়ন আর পাখি শেষ অবধি এই বুদ্ধি বের করেছে।

বুড়ী পণ্য-রমণীর শব বয়ে নিয়ে চলেছে কমবয়সী দুটি মেয়ে—তারাও স্বৈরিণী। এ-দৃশ্য সৌর এর আগে বা পরেও কোনদিন দেখে নি।

একটি ভিজে মেঘঘোর সন্ধ্যা করুণায় গলে গলে কাঁদছিল। সৌর পুরুষ অতএব কাঁদছিল না, কিন্তু বিষণ্ণ আকাশ ওর সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

ওরা এইরকমই হয়, সে ভাবছিল মনে মনে। যতদিন বাঁচে, ততদিন আছে, ততদিনই ওদের ঘরে নানা লোকের আনাগোনা। যেই নেই, সেদিন আর-কেউই নেই।

কামিনী মাসির মড়া নয়, নয়ন আর পাখির ভবিষ্যৎ জীবনটাই যেন বোঝার মত ওদের কাঁধে চেপেছিল। এই বোঝা নামাতেও যদি পারে, তখনও কি ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে?

যারা ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তা চলছিল, কিংবা বৃষ্টির জন্য যারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারা সবাই সকৌতুকে মজা দেখছিল, জোরে জোরেই হাসছিল। বিড়ির দোকানী একনজর দেখে নিয়েই ফের বিড়ি-বাঁধায় মন দিচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই যে বিশ্রী একটা হিন্দী গান এক-কলি গেয়েই চুপ করেছে, আর তখন তার শাকরেদ কারিকর ছোকরা দুটির একজন হাঁটুতে চাপড় দিয়ে আর-একজন করতালি দিয়ে তাল দিয়েছে—হয়তো গানের সঙ্গে, হয়তো নয়ন-পাখির চলার ছন্দে। একজন তো পাটতন থেকে নেমে ফুটপাথে পড়ে দৌড় দিল—শব্দ করে থুথুও ফেলল।

বাকী লোকগুলো, যাদের সভ্য-শহুরে সংস্কার এতক্ষণ তাদের ধরে রেখেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল হো-হো করে। একটা কুকুর খানিকটা

এগিয়ে পাখির গোড়ালিতে নাক ঠেকিয়ে ফিরে এস ফের কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

সৌর একবার ভাবল, আমি যাই, ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু লোকগুলির চোখের দিকে চেয়ে সাহস হল না, বৃষ্টির চেয়েও তীক্ষ্ণ ধারায় ওদের টিককারি পিঠে বিঁধবে এই ভয়ে সৌর দাঁড়িয়েই রইল।

যতক্ষণ রইল, ততক্ষণই সৌর মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। বলল, আমি ভদ্র, আমি সভ্য, আমি শহুরে, আমি কাপুরুষ।

এই চারটি বিশেষণই যে মূলে এক, তাতে তার সন্দেহমাত্র ছিল না, তার গ্রামীণ মনের প্রবণতার বিনিময়ে সে যা অর্জন করেছে। এই শহুরে সংস্কার, সংকোচ আর ভয়ই সৌর অনেক পরে লিখেছিল দিনান্তলিপিতে: "আমাকে নাগরিক করেছে, কিন্তু মানুষ হতে দেয় নি, অন্তত আমি যা হতে চেয়েছিলাম, তা হতে পারি নি। ওই পাখি আর নয়নকে আমি তো আর ঘৃণা করতাম না, বরং তখন ওদের বিপদে আমার দুঃখ হয়েছে, তবু ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নি।"

নয়ন আর পাখির মুখ চোখ জামা সব ভিজে গিয়েছিল। হয়তো বৃষ্টিতে, হয়তো পথশ্রমের ঘামে। হয়তো ওদের চোখেও জল ছিল।

সৌর কিন্তু সেদিন ওদের পিছু নিয়েছিল। ওরা যেই চোখের আড়াল হল, তখনই যেন বৃষ্টিটা ধরে এল আর সৌরও অমনিই এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়াল।

খানিকটা চলার পরই ওদের আবার দেখা গেল। দুটি তো মেয়ে, কত তাড়াতাড়ি আর যাবে!

সৌর ওদের কাছে গেল না, একটু দূরত্ব রেখে চলতে থাকল।

ওরা মাঝে মাঝে কাঁদ বদলে নিচ্ছিল, নয়ন মাঝে মাঝে বলতে চেষ্টা করছিল, 'বল হরি, হরিবোল—' কিন্তু খুব ক্ষীণ আর ক্লান্ত আর লজ্জিত একটুখানি চাপা গোঙানি ছাড়া আর-কোন শব্দ ফুটছিল না। পথের পাশের মুড়ি-বাতাসার দোকান থেকে কয়েক মুঠো খই কে যেন ওদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

একটু পরে ওরা অন্য একটা রাস্তায় বাঁক নিল। এ-রাস্তায় লোকজন কম, দোকান নেই, শুধু বসতি অঞ্চল, তাই বৃষ্টির সন্ধ্যায় দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে কেমন যেন বোবা আর কানা হয়ে গিয়েছে।

এইখানে নয়ন আর পাখি থামল। সন্তর্পণেই নামিয়ে রাখল ওদের

কাঁধের পুঁটুলি। রাস্তায় বসে পড়ে আঁচল খুলে প্রথমে ঘাম মুছল, পরে আঁচল ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে শুরু করল।

সৌরর তখন আর লুকোবার উপায় ছিল না। ওরা ওকে দেখতে পেল। হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ওরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সৌর বলল, "চিন্তবাবুকে পেলাম না। নিশিবাবু এল না।"

নয়ন হাঁপাচ্ছিল। বলল, "জানি পাবে না। জানি আসবে না।"

ওরা আর কোনও প্রশ্ন করল না। নয়ন বলল, "বাপস, কাঁধ ধরে গেছে। একটু জিরিয়ে নিই।"

পাখি বলল, "ঘণ্টাখানেক নেচেও কোনদিন পা এমন টনটন করে নি।"

নয়ন বলল, "দে, একটা বিড়ি দে।"

"এখানে খাবি? এই সদরে—বাইরে?"

"দে—দে, দম ফুরিয়ে গেছে, নইলে বাঁচব না।" সৌরর দিকে চেয়ে বলল, "দেশলাই আছে?"

সৌর বাক্যব্যয় না করে বাক্সটা পকেট থেকে বের করে ওদের হাতে তুলে দিল। ধরিয়ে দিতেও হল ওকেই। কেন না, নয়নের হাতে ভিজে কাঠির একটাও জ্বলছিল না, নিবে যাচ্ছিল।

ফেরবার সময় কোন-কোন ঘড়িতে পৌণে দশটা, কোনটাতে দশ বেজে পাঁচ কিংবা দশ, কোনটাতে সওয়া দশটা বাজছিল। সময়টা যে দশটারই কাছাকাছি, তাতে সন্দেহ ছিল না।

মৃদু গলায় সৌর বলল নয়নকে, "যাক, চুকল তা হলে। কিন্তু তোমরাই বা এই কাণ্ডটা কেন করলে বল তো? আর খানিকটা অপেক্ষা করলেই তো পারতে। আমি যে-ভাবে পারি কিছু লোকজন যোগাড় করে আনতামই।"

নয়ন বলল, "না ভাই, আমরা ভয় পেয়েছিলাম।'

সৌর হেসে বলল, "মড়া নিয়ে এক বাড়িতে থাকার ভয়?"

নয়ন বলল, "তা বলতে পার বটে। তবে আরও কারণ ছিল।"

"কী কারণ?"

নয়ন চট করে জবাব দিল না। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, "দেখ, সারা জীবনই তো মাসি পাপ করেছিল, যমের কাছে তার জবাবদিহি

দিতে দিতেই অস্থির হবে। আবার ওর মড়া যদি বাসী হত, তবে ওর নরকেও জায়গা হত না যে!" বলে নয়ন অল্প একটু হাসল, "পাপ করুক আর যাই করুক, তার বিচার ভগবানের কাছে। আর ও একা তো করে নি, ওকে দিয়েও অনেকে করিয়েছে। দায় তাদেরও। আমাদের সে সব ভেবে কাজ কী! আমাদের কাছেও মাসি ঢের দোষ করেছে সত্যি—অনেক যন্ত্রণাও দিয়েছে, কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক করেছে। তারই একটু শোধ দিলুম আর কী, ওকে নরক থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলুম।"

নয়নের গলা ধরে এসেছিল। নয়ন থামল।

আর পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে সৌর ভাবছিল, বৃষ্টি থেমে গিয়ে হাওয়া স্নিগ্ধ হয়েছে, আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে। এই মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নায় আজ রাতে একটা নতুন জিনিস দেখলাম। নয়নকে। যে-নয়নকে আমি কখনও দেখি নি। কেউ দেখে নি। এক ভিখারীকে একবার দেখেছিলাম বটে—আর-এক অন্ধ ভিখারীর হাতে দুটো পয়সা তুলে দিচ্ছে। সমাজের চোখে যে-নয়নের পাপের সীমা নেই, সেই নয়নই আজ আর-এক নয়নের পাপের বোঝা একটু হালকা করে দিল—তারই শাস্ত্রজ্ঞান আর বিশ্বাস মতে।

সৌর ভাবছিল, নয়নের শুদ্ধি ঘটে গিয়েছে, নয়ন এখন মূর্তিমতী করুণা।

ফিসফিস করে সৌর বলল নয়নকে, "তুমি—তোমরা কোথায় যাবে?"

"কেন, আমাদের বাড়ি!"

আর সঙ্গে সঙ্গে সৌর প্রচণ্ড একটা ঘা খেল। ফিরে যাবে না, নয়ন আর পাখি আর তাদের পুরনো জীবনে ফিরবে না, সে কি তাই ভেবে রেখেছিল?

তবু বলল, "ফিরবে?"

নয়ন সবিস্ময়ে বলল, "বাঃ রে, ফিরব না? তবে যাব কোথায়? গা হাত পা সব চিবচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জ্বরও এসেছে। পাখি, তোর ঘরে দু নম্বরের সেই বোতলটা লুকনো আছে না?"

কথাগুলো নয়ন বলল কেমন টেনে টেনে, কপট ভয়ের ভঙ্গিতে; পাখি—যে এতক্ষণ চুপ করে ছিল—সে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর সৌর, সর্বাঙ্গে কাঁটা, সর্বাঙ্গ কঠিন, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে বলল, "নির্লজ্জ, বেহায়া, বদমাশ!"

নয়ন সে-কথা শুনতে পায় নি। পাখির গালে আলগোছে চড় মেরে সে তখন বলছিল, "মর্ ছুঁড়ি—হেসেই যে মলি! চল্, চল্, পা চালিয়ে চল্।"

নয়ন বলল, "এস বঁধু, এস এস, আধো আঁচরে বোস। তার পর? দু দিন দেখি নি কেন?"

সৌর বলতে পারল না, তার ঘেন্না হয়েছিল, বলল, "এই—নানা কাজের চাপ ছিল।"

কথাটা নয়ন বিশ্বাস করল, না অবিশ্বাস করল, ঠিক বোঝা গেল না। তেরছা নজরে চেয়ে বলল, "ও!" আর তখনই সৌর লক্ষ্য করল, নয়নের চোখ দুটো ফুলো-ফুলো।

বলল, "চোখের এ দশা কেন?"

পলকের জন্য আঁচল দিয়ে চোখ আড়াল করেই নয়ন আঁচল সরিয়ে নিল: "কেন, কী আবার দশা দেখলে?"

"চোখ ফুলিয়েছ কেন?"

নয়ন মাথা কাত করল, এমনভাবে যে মাথা না হয়ে কলসী হলে জল গড়িয়ে পড়ত: "যদি বলি, কেঁদে কেঁদে!"

"বিশ্বাস করব না।"

"তবে কি তুমি ভেবেছ, মদ খেয়ে?"

"তোমার মুখে কিছু আটকায় না।"

"তবেই দেখ, কথায় এঁটে উঠবে না। আমি কিন্তু এ দু দিন তোমার কথা ভেবেছি।"

"আমার কথা?"

"তোমাকে যে আমার খুব দরকার।"

পাখি কাছেই ছিল, ফোড়ন কেটে বলল, "সো-ও-ত্তি। আমাকে ও কতবার যে ওপরে যেতে ফরমাশ করেছে তার ঠিক নেই। আমি ওপরে গিয়েছি, কিন্তু তুমি ছাদে একবারও আস নি।"

পাখি মুখ ভার করল। নয়ন বলল, "বিশ্বাস করলে না ?"

"বিশ্বাস তো করেছি," সৌর বলল, "কিন্তু—কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না, এমন কী দরকার পড়ল !"

"তুমি ভাই মোটে শাস্তর মান না। মাসির তেরাত্তিরের শ্রাদ্ধ করতে হবে না ?"

"শ্রাদ্ধ ?"

"শ্রাদ্ধই তো। করব আমরাই।"

সৌর আবার বলল, "কামিনী মাসির শ্রাদ্ধ ?"

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুখিয়ে দাঁড়াল নয়ন: "কেন হবে না, শুনি ? আমাদের ইহকাল নেই বলে বুঝি পরকালও নেই ?"

ঠিক এই কথাটার জবাব সৌর দিতে পারল না।

আর জ্বর ছেড়ে যাবার সময় লোকে যেমন টের পায়, দেহের তাপ জল হয়ে ঘাম হয়ে ফুটে বেরোয়, সৌরও তেমনই টের পেল, তার মনের রাগও তেমনি জল হয়ে যাচ্ছে। জল হয়ে গেল বলেই সৌর একটু পরে বলতে পারল, "আমি সেদিন তোমাদের খুব—"

সৌর বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিল, থেমে গিয়েছিল। নয়ন ওর কনুইয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, "খুব কী ? থামলে কেন।"

"খুব, মানে—এই বিশ্রী লেগেছিল ?"

"ঘেন্না হয়েছিল, তাই বলতে চেয়েছিলে তো ?" নয়ন বলে হাসতে থাকল, আর অপ্রস্তুত সৌর কী বলবে ঠিক করতে না পেরে বলে বসল, "ঘেন্না হবে না ? সেদিন—সেদিনও তুমি—"

নয়ন বলল, "তুমি ভাই বড় অবুঝের মত কথা বল। সেদিনই তো আরও বেশী করে খাব—নইলে মনের দুঃখ ঢাকতাম কী করে ? আর মনের দুঃখ-টুকুখ ছেড়ে দাও। সেদিন আমার খুব ঘুমের দরকার ছিল, নইলে গতরের ব্যথা যেত কি ? ধরে নাও ওটা ঘুমের ওষুধ।"

তর্কে পরাস্ত সৌর শুধু ফুঁসছিল।

নয়ন নিজেই যেচে সন্ধি করল: "ও-সব কথা ছেড়ে দাও। তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার আছে। সুস্থ হয়ে বোস, বলি। আমাকে গোটাকতক টাকা দিতে পারবে ?"

"টাকা ? আমি ? কত টাকা ?"

"এই মরেছে!" ওর গালে টোকা দিয়ে নয়ন গড়িয়ে পড়ল: "দুধের বাচ্চা যেন আঁতকে উঠল! এখানে এলে টাকা লাগে, জান না?"

নয়ন হাসতে হাসতেই বলছিল, কিন্তু সৌরর মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, "আমি সে ভাবে আসি না। জানলে আসতাম না।"

সৌর উঠে পড়ছিল, নয়নই জামার আস্তিন ধরে টেনে ওকে বসিয়ে রাখল: "তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। সত্যিই আমার টাকার খুব দরকার। নইলে মাসির শ্রাদ্ধ হবে না। আমার হাতে কিছু নেই। মাসির কি গতি হবে না? এত কষ্ট করে পোড়ালুম, এর পরেও পেত্নী বা শাকচুন্নী হয়ে থাকবে?"

"হাতে কিচ্ছু নেই?"

"বিশ্বাস কর ভাই, কিচ্ছু না।

"পাবার আশাও নেই?"

নয়ন এক মুহূর্ত কী ভেবে বলল, "না। যদি না—যদি না মালাকে বিক্রি করি। ও-ঘরে আর-একটা মেয়েকে ওরা আটকে রেখে গেছে, মনে আছে?"

সৌরর মনে নেই? সেই স্বপ্নটাও মনে আছে যে। বিবর্ণ মুখে বলল, "বিক্রি?"

নয়ন আস্তে আস্তে পুনরুক্তি করল, "বিক্রি। আমাদের মধ্যে এ রকম হয়। মালার জন্যে কটা দালাল দিনকতক ঘোরাঘুরি করছিল, খবর দিলেই আসে।"

সৌর তীব্র গলায় বলে উঠল, "ছিঃ!" বলে আর বসল না, নয়নের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে নেমে এল নীচে। পকেটে হাত দিল। মোটে সাড়ে সাত আনা আছে।

নয়নের মুখে বিস্ময়ে কথা ফুটছিল না: "বিশ টাকা? এত টাকা পেলে কোথায় তুমি?"

সাফল্যে গর্বে উত্তেজনায় সৌরর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। বলল, "বই বিক্রি করে এলাম। পুরনো বইয়ের দোকানে।"

"পড়ার বই?"

সৌর মাথা নিচু করে বলল, "পড়ার বই।"

তখন কী করেছিল নয়ন, এতদিন পরে ভাল মনে নেই। সে কি কৃতজ্ঞতার ঝোঁকে সৌরকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল, নাকি সঙ্কোচে সৌর পিছিয়ে গিয়েছিল বলে নয়ন শুধু তার একটা হাত চেপে ধরতে পেরেছিল?

ভাল মনে নেই, কিন্তু নয়নের কথাগুলো সৌর ভোলে নি।

ধরা-ধরা গলায় নয়ন বলেছিল, "তুমি যে উপকার করলে আমরা কখনও ভুলব না ভাই। আর এ-টাকা আমরা শোধ দেব।"

সেই আশ্বাসে সৌর চমকে উঠল। একবার সে চাইল নয়নের মুখের দিকে, একবার পাখির। এই মেয়ে দুটির টাকা শোধ দেবার পথ বা উপায় তো মোটে একটাই, সেই উপায়টার কথা কল্পনা করে সৌর শিউরে উঠল।

পরবর্তী জীবনে সৌর নয়ন-পাখির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে এই কারণে যে, ওরা ওর মনটাকে সংস্কারের কৌটো থেকে বাইরে বের করে এনেছিল ; 'দিনান্তলিপি'তে ছিল—

"গরম কাপড় বরাবর তোরঙ্গজাত থাকলেই পোকায় কাটে, তাই মাঝে মাঝে রোদে মেলে দিতে হয়। আমাদের মনও তাই। পারিবারিক বন্ধন আর সামাজিক নিয়মের মধ্যেই যে শুধু সৎ বাস করে না, তার বাইরেও উপরে-নীচে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারাও যে মানুষ, এটা নয়ন-পাখিদের জীবন-মন আর ভাবনাকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেই আমি জেনেছি। আমি জেনেছি কোন গুণই অপরিবর্তনীয় নয়, এমন কি বস্তুর ধর্ম শুধু হওয়াতে, শুধু থাকাতে। গুণের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে শুধু যে দেখে তার দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক সময় অন্যের অনেকের রায় আমরা নির্বিচারে নিজের বলে গ্রহণ করি : আকাশকে বলি নীল, পাতাকে সবুজ, দীঘির জলকে কালো। সবটা আমরা নিজেরাও বিচার করে দেখি না, অন্যের মুখে শোনা কথার উপরে নির্ভর করি। কে জানে, আকাশ নিজে হয়তো নীল নয়, দীঘি নয় কালো, আমাদের চোখই হয়তো ওদের নীল আর কালো করেছে! সুন্দর তো করেছেই।"

পুরোপুরি মানে হয় না বলে সৌর পরে এই লাইনগুলো কেটেও দিয়েছিল।

•

অতি-প্রাকৃতে সৌরর বিশ্বাস নেই, কিন্তু অতি-প্রাকৃতকে সে ভয় করে ; যুক্তি আর বিচার তাকে দিয়েছে অবিশ্বাস, মনের দুর্বলতা, ভয়। ভূত তার জীবনে বহুদিন ভয় হিসেবে সত্য হয়ে ছিল।

মালার দোলনায় দোল খাওয়ায় ঘটনাটার রহস্য সে কোনদিন উন্মোচন করতে পারে নি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তবে বুঝি সত্যিই অতি-প্রাকৃতের ছায়া পড়ে! আর এমন ঘটনা সত্যিই বুঝি আছে, যা প্রথম ঘটে মনে এবং স্বপ্নে, পরে জীবনে।

মালা দোলনায় বসে ছিল।

একটা টকটকে শাড়ি ওর পরনে, ওকে ঘিরে, ওকে জড়িয়ে। দেখতে ভাল লাগছিল, তবু সৌরর মনে অদ্ভুত একটা তুলনা এল কেন? কেন তাঁর মনে হল, শাড়ি নয়, ওটা চিতার আগুন? চিতার আগুন ওর অনাবরণ দেহ ঘিরে যদি জ্বলত, তবে ওকে এমনি দেখাত। মালার রুক্ষ চুল উড়ছিল। সৌরর কেন মনে হল, ওর চুল উড়ছে শ্মশানের হওয়ায়? এ কি আগামীর ছায়া?

মোহিত সৌর অপলকভাবে মালার ভীষণ-সুন্দর রূপ দেখছিল।

দোলনা থেমে গিয়েছিল। মালা থেকে থেকে দুলতে চাইছিল। দোলনাটা কিন্তু নড়ছিল না। মালা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

"দাও না একটু দোলা দিয়ে। দেবে?"

সৌর এগিয়ে গেল। কয়েক পা মাত্র, আর পারল না। যেন ভয় পেল। যেন আরও কাছে গেলে ওর গায়ে মালার আগুন-শাড়ির আঁচ লেগে যাবে, হাতে ফোস্কা পড়বে, মুখ-চোখ ঝলসে যাবে। স্থির চোখে সৌর কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

"দাও না একটু দোলা।" মালা আবার বলল।

এবার সাহস করে এগিয়ে গেল সৌর, হাত বাড়িয়ে ঠেলল দোলনাটা।

মালা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। ঠোঁটে চাপা কৌতুক, মালার চোখ বিস্ফারিত। আর মালার চোখের মণি—সৌর খুব কাছে গিয়ে প্রথম অনুভব করল—কটা কিংবা সাদাই যেন। দোলনার দড়ি শক্ত করে ধরে আছে মালা যে-হাত দিয়ে, তার আঙুলগুলোও যেন কঠিন। বাঁকানো।

সৌর ভয় পাচ্ছিল, দোলনাটাকে আরও জোরে জোরে ঠেলে দিচ্ছিল ও। মালা এক-একবার সোঁ করে আকাশে উঠে গিয়ে আবার মাটির কাছাকাছিই ফিরে আসছিল। ওর চুলের বাঁধ সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে আরও বেশী উড়ছিল, আরও লকলক করছিল চিতার মত শাড়িটা, সেটা শাড়ি আর ছিল না, একটা রক্তাক্ত তৃষ্ণার্ত রসনার মত হয়ে গিয়েছিল।

সৌর ভয় পেয়ে গিয়েছিল মালা একবারও হাসল না বলে। ওর ঠোঁট একবারও নড়ল না কেন? কেন একটুও কাঁপল না চোখের পল্লব? মালা দুলছে, দুলছে, দুলছে—যেন নেশার ঝোঁকে, যেন দোলাটার সঙ্গেই ও এক হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ একবার অনেক উপরে উঠে গেল মালা আকাশ যত দূরে যেন ততটাই উঁচুতে। দড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্ত ভীত

কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মালা। সেই চিৎকারে সৌরর পা থেকে মাথা অবধি চমকে উঠল, সে চেয়ে দেখল, মালা পড়ে যাচ্ছে।

মালা পড়ে যাচ্ছে, মালা বলছে, "আমাকে ধর, বাঁচাও।" সৌর হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু ধরতে পারল না। হয় সে জড় হয়ে পড়েছিল, নয়তো তার দিশা ছিল না, পলক পরে মাথা নিচু করে দেখল, মালা মাটিতে।

মালা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দেহে স্পন্দন নেই, উগ্র রঙের শাড়িটা কয়েকটি অগোছালো স্থির ঢেউ হয়ে ওর শরীরটাকে খানিক আঁকড়ে রেখে, খানিক অসতর্ক করে দিয়ে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে।

সৌর ঝুঁয়ে পড়ে মালাকে আস্তে আস্তে ঠেলছিল, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছিল, "ওঠ, ওঠ।" কিন্তু মালার দিক থেকে কোনও সাড়া ছিল না।

একটু আগেই মালা চিৎকার করে উঠেছিল, সেই চিৎকারের শব্দের রেশমাত্র এখন নেই, মালা নিথর-নিস্পন্দ পড়ে থাকার ভঙ্গিতে, নেই প্রাণের লেশ।

ভয় পেয়ে সৌর নিজেই এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল।

পরদিন সকালে, কৌতূহলী পুলিসে আর ডাক্তারে মিলে মালার দেহটা যখন ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাশ ফিরিয়ে পরীক্ষা করছিল, সৌরও তখন বাড়ির ছাদ থেকে অবাক হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, এই দৃশ্যটা তার কাছে একদিন আগের রাত্রেই এসেছিল কী করে? একটি মর্মান্তিক ঘটনার অগ্রিম স্বাদ তাকে দেবার আয়োজন করেছিল কে?

আশ্চর্য, যে-দড়িটা ধরে কাল দোলনায় দুলছিল মালা, সেটা এ-ঘরেও ছিঁড়ে পড়ে আছে, যদিও দোলনা নেই। মালা কি আজ এই দড়িটা ধরেই ঝুলেছিল কিছুক্ষণ—তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে? অত উঁচুতে উঠল কী করে মালা, ছাতের হুকটার নাগাল পেল কোন্ উপায়ে?

পা টিপে টিপে আরও এগিয়ে গেল সৌর, ও-বাড়ির যত কাছাকাছি যাওয়া চলে: মালাকে ওরা এখন টেনে এনেছে বাইরে, সকালের রোদ্দুরে বারান্দায় চিত করে শুইয়ে দিয়েছে।

আগুন-রঙের শাড়িটার আঁচল লালচে কয়েকটা সাপের মত মালাকে ঘিরে কিলবিল করছে। মালা সরছে না, নড়ছেও না, মালার আর ভয় নেই। সাপের বিষে ওর আর কোন্ ক্ষতি হবে?

মালার গলার কাছে কালো গভীর দাগ—ওই দড়িটা ধরে মালাকে বুঝি

অনেকক্ষন ঝুলে থাকতে হয়েছিল ? কখন ওটাকে সংগ্রহ করল মালা, কোথা থেকেই বা করল ? হুকটার সঙ্গে বাঁধল কী করে ? নিজেকেই যখন বাঁধনটার কাছে সঁপে দিল, তখন মালা কি ভয় পায় নি ? দড়িটা যখন গলায় গেঁথে গেঁথে বসছিল, তখন কি মালা তীব্র তীক্ষ্ণ ভীত গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল ?

ওর স্বর কারও কানে কি পৌঁছয় নি ? পৌঁছেছিল, হয়তো সৌরর কানেই পৌঁছেছিল। বাকী সব ছিল স্বপ্ন, কিন্তু মালার আর্ত স্বরটা সত্য—ওই একটা মর্মভেদী চিৎকারের শব্দ হয়তো মৃত্যু আর জীবন, অপ্রকৃত আর বাস্তবের সীমারেখাচিহ্নিত করে তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে।

ওরা ফিস ফিস করে কানাকানি করছিল—পুলিসের লোক আর ডাক্তারে মিলে। ওদের এখানে ডেকে আনল কে, ওরা খবর পেল কী করে ?

মালার মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে সৌর তখন এই সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল আর তলিয়ে তলিয়ে ভাবছিল, নয়ন বা পাখিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না।

চিত্তবাবুকে দেখা গেল একটু পরে তিনি টলতে টলতে ঘর থেকে বেরচ্ছিলেন, পাঞ্জাবির সব বোতামই খোলা, কাছা-কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, বিপর্যস্ত।

পুলিসের লোকেরা কী যেন জিজ্ঞাসা করল চিত্তবাবুকে, চিত্তবাবু জড়িত-অস্পষ্ট গলায় কী একটা জবাবও দিলেন, ওদেরই একজন কড়া গলায় চিত্তবাবুকে ধমক দিয়ে উঠল, আর একজন এগিয়ে এসে ওঁর কব্জি চেপে ধরল।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিত্তবাবু ওই ধুলোতেই বসে পড়লেন। বিড় বিড় করে তিনি কী যেন বলছিলেন ! তোতলামি, না প্রলাপ কে জানে !

একটা সাদা কাপড় খুলে একজন জড়িয়ে জড়িয়ে মালাকে বাঁধল। ওর রুক্ষ চুল আর আঁচলের আগুন সব ঢাকা পড়ে গেল।

মালাকে ওরা এবার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। মালা আর আপত্তি করছে না, ভয় পাচ্ছে না, চেঁচাচ্ছে না। মালা আর আপত্তি করবে না, ভয় পাবে না, চেঁচাবে না।

আর মালাই তো নেই, চেঁচাবে কে ? ক্যাম্বিসের পর্দা দিয়ে তৈরী বিছানায় তুলে ওরা যাকে নিয়ে গেল, সে তো মালা নয়। মালা তো তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে সেই চিৎকারেরই পিছে পিছে পালিয়ে গিয়েছে। ওরা কতটুকু বা নিয়ে যেতে পারল ! গলায় একটা শুকনো কালো দাগ, রাশি রাশি রুক্ষ চুল, আর মালারই ফেলে-যাওয়া খানিকটা আগুন। সে-আগুনেও তাত নেই, নিবে এসেছে।

"এই !"

চমকে সৌর মাথা তুলে তাকাল।

পাখি কখন পা টিপে টিপে উঠে এসেছে, সে কিছু তো টের পায় নি!

"এই!" পাখি ডাকল আবার আরও কাছে এসে।

সৌর বলল, "কী?"

"মালা মরে গেছে।"

"জানি।"

"মালাকে ওরা নিয়ে গেছে।"

"তাও জানি।"

"আজ শেষ রাত্রে—চুপি চুপি উঠে—"

"তোমরা কখন টের পেলে?"

"খুব ভোরে নিশিবাবু যখন চলে গেল।" বলতে বলতেই একটু থেমে একটু যেন লজ্জা পেয়ে পাখি বলল, "নিশিবাবু কাল এসেছিল।"

সৌর বলল, "ও।"

"আমি জানতাম," পাখি আস্তে আস্তে বলল, "জানতাম, মালা বাঁচবে, বেঁচে যাবে।"

"বাঁচবে?" সৌর থতমত খেয়ে বলল।

"বাঁচল না?" চোখ ঘুরিয়ে পাখি বলল, "বাঁচল না?"

আর সঙ্গে সঙ্গে সৌর সায় দিয়ে বলে উঠল, "বাঁচল।"

একটু পরে সৌর আর-একটা রহস্যের কিনারা করতে পারছিল না বলে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু পুলিসে খবর দিল কে?"

"জানি না," অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পাখি কতকটা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "নিশিবাবুও দিয়ে থাকতে পারে।"

সৌর বলল, "ও।"

"ওরা চিত্তবাবুকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাদের—আমাদেরও ধরে নেবে। আমরা যে এখানে এভাবে আছি, এটা নাকি বে-আইনী।"

"বোধ হয়।"

"আর দেখা হবে না।"

সৌর এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাখির দিকে তাকাল। পাখির গলা কি ধরা-ধরা? এই কয়েক ঘণ্টা আগেও যার ঘরে নিশিবাবু ছিল, সৌরর সঙ্গে আর দেখা হবে না বলে হঠাৎ কি তার চোখে কুয়াশা জমল, গলা ধরে এল?

"তোমার কাছে আমরা অনেক ধারি", পাখি বলে চলেছিল, "সে-ধার শোধ দেওয়া আর হবে না। কত টাকা যেন ?"

সৌর বলল, "টাকার কথা থাক্।"

"যদি কোনদিন পারি, টাকা নয়ন এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আর সব তো বাকী থেকেই যাবে।"

"আর ?" সৌর ধীরে ধীরে বলল, "আর তো কিছু ছিল না পাখি।"

"ছিল না ?" পাখি যেন আহত হল : "তোমার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। আরও কত লোক আমাদের কাছে আসে তো, তোমার মত কেউ নয়। আমাদের তারা মানুষ বলে মনে করে নি। অথচ আমরা কত খারাপ দেখ, জান, প্রথমে নয়ন আর আমি মিলে তোমাকে খারাপ করে দেব ঠিক করেছিলাম।"

"তার পর ?"

"তুমি টের পেয়েছিলে, না ? তারপর আর কী, খারাপ তো তুমি হও নি, আমরাই বরং—" পাখি থেমে গিয়ে মাথা নিচু করল।

সৌর বুঝতে পেরেছিল, পাখি কী বলতে চায়, কিন্তু মুখে না বলে মনে মনে জবাব দিল : না। পাখি, তোমরাও ভাল হও নি, আমিও খারাপ হই নি। আসলে আমরা কেউই কিছু হই না, যা আছি তাই থাকি।

"যাই।" পাখি একটু পরে বলল, "ওরা বোধ হয় আমাকে খুঁজছে।"

বলেও পাখি এক মুহূর্ত দেরি করল।

আলিসার ওধার থেকে বাড়িয়ে দিল একখানা হাত, সৌরর ডান হাত ধরল। একটু চাপ দিয়ে বলল, "আসি।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গেল না, সৌরর হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুটি ঠোঁট রাখল। রাখল ঠিক বলা যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই তুলল, কিন্তু সৌরর চোখে চোখে আর তাকাল না, হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে ত্রস্তপায়ে, এক রকম দৌড়েই নীচে ছুটে গেল।

সৌর তখন চিত্রার্পিত পুত্তলিকা। পাখি কি ধারেরই খানিকটা এইভাবে শোধ দিয়ে গেল ?

[রাত বাড়ছে, রাত ফুরচ্ছে, রাত মরছে। সৌরেশ চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। চাঞ্চল্যের কোন প্রকাশ ছিল না। অন্য কোন লোক ঘরে ঢুকলে দেখতে পেত, সৌরেশ চোখের ওপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে হেলান-চেয়ারে শুয়ে

আছেন, নাকটা লুকিয়েছে কনুইয়ের খাঁজে। 'বাইরে থেকে আমি এখন নিস্তরঙ্গ দীঘির মত প্রশান্ত, যার তলাকার খবর কেউ রাখে না, সেখানে হয়তো গভীর কল্লোল, হাজার-হাজার ছোট ছোট মাছের পুচ্ছ আলোড়ন। কিন্তু রাত পুইয়ে এল, আর-একটু পরে সব ফরসা হবে, আমার কাজ শেষ হল না তো!'

কী কাজ? সৌরেশ শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে। আমি কী করছি? হয়তো নিজেকে খুঁজছি। আমার মধ্যে এই আমি-টা কী করে এল, কবে এল, আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রণালী কিছু অদ্ভুত—নিজেকে আমি দেখছি অনেক মুখের পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে। কে আমাকে কতটুকু দিল, কে কেড়ে নিল কতখানি! কিংবা একের পর এক হাত ধরে ধরে ওরা আমাকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল এখানে। অন্ধকারে সকলের মুখ আমি ভাল করে দেখতে পাই নি, সব ছোঁয়া হয়তো মনে রাখতেও পারি নি।

চোখ মেললুম, আমার ঘরের খোলা জানলার ওপারেই আকাশ, আকাশ নীচে নেমে এল। ওই আকাশ আমার অতীত, আমার সব অভিজ্ঞতা ওখানে মিটিমিটি তারা হয়ে জ্বলছে। সব তারা আমি দেখতে পাচ্ছি না, ওরা জ্বলে, নেবে, জ্বলে, আর নাগালের বাইরে বলেই অস্থির করে তোলে। আকাশ নীচে এল, ওর আঁচলটা ঝেড়ে সব তারা বুঝি ছিটিয়ে দেবে আমার গায়ে, আমি জ্বলব। আর, সেই জ্বলুনির ভিতর দিয়েই ফিরে পাব আমার অতীতকে, আমার হারানো অভিজ্ঞতার কণাগুলিকে।]

আজ পুরনো ক্ষণগুলিকে তারা বলে ভাবলেন সৌরেশ; অনেক—অনেক দিন আগে আরও একবার কল্পনা এর অনুরূপ হয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। পাখি আর নয়ন যেদিন চলে যায়।

সেদিন বিকালে সৌর একটা সিনেমায় গিয়ে ঢোকে; পর্দায় হাত-পা নাড়া, মুখ-চোখের বিলোল ভঙ্গি কুৎসিত ঠেকে, গান আর কথা—সব অসহ্য ন্যাকামি আর বোকামি। বেরিয়ে এল সৌর, এখনও বাতাবিলেবুর মত রোদ ছিল; সূর্যের রঙ ছিল বাতাবির ভিতরটার মত টকটকে, আর রোদ্দুর বাইরের মত হলদেটে।

সৌর চলতে শুরু করল। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে না-চেনা একটা পথ ধরল। দু পাশের সার-দেওয়া বাড়িগুলো তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না,

খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে চলে শহরতলিও যেন হাঁপিয়ে পড়ে পিছিয়ে গেল। আস্তে আস্তে শহরের শেষ ছাপটুকুও লুপ্ত হল।

নয়ানজুলি, দু পাশে ঢালু জমি, মাঝখান দিয়ে পথ, খানিকটা দূরে দূরে কালভার্ট। এখানকার মাটি ভিজে, এখানকার মাটি কালো, এখানকার মাটি গন্ধ ছড়ায়। সেই গন্ধ আকাশের পাখিকে ডাকে। তারা নেমে নেমে ফসলের গুঁড়ো ঠোঁট দিয়ে কুড়োয়, চক্রাকারে ওড়ে, আবার ক্লান্ত হয়ে কখনও বাঁশঝোপের আগায় গিয়ে বসে।

সেই বাঁশ-ঝাড়গুলি এক-একটি বিদীর্ণ তুবড়ির মত—সবুজ ফুলকিগুলি চিরকালের মত স্থির হয়ে আছে।

এ পথে বাস বিরল, একটি-দুটি ট্রাক চলে। সৌর বাঁধা রাস্তা ছেড়ে নীচের কাঁচা পথে নেমে এসেছিল।

পথে লোক ছিল না। অনেক দূরে কোন গ্রামে ডুগডুগি বাজছিল, তাল নিয়মিত কিন্তু একটানা, শুনলে অস্বস্তি লাগে, গা সিরসির করে। সৌরর করছিল। একটু একটু ছায়া নামছিল, হওয়ায় হিম-হিম ভাব—আর খানিক পরেই বুঝি অন্ধকার নামবে। ছায়া আর অন্ধকার সোদর—অথবা বুঝি একই, কিশোরী ছায়াই ধীরে ধীরে প্রগাঢ় যুবতী অন্ধকার হয়ে যায়।

সৌরর অল্প-অল্প ভয় করছিল। এই ভয়-ভয় ভাব আর হাওয়ার শীত এরাও আসলে এক, সৌর ভাবল, বাইরের সিরসিরে শীত যা আমার শরীরে লাগে, কাঁটা দেয় মনের ভিতরে গিয়ে তাই পলকে ভয় হয়ে যায়।

সন্ধ্যা হল, না-চেনা পথ, আমি আর চলছি কেন, সৌর ভাবছিল কিন্তু থামছিলও না। যতক্ষণ চলব, ততক্ষণই বাঁচব, যেই থামব অমনই এই অন্ধকার আমাকে আত্মসাৎ করে নেবে, আমি—আমি আলাদা থাকব না, এই অন্ধকারই হয়ে যাব।

এই ভয় ছিল বলেই সৌর চলছিল, আবার এই ভয় ছিল বলেই সে ফেরার কথাও ভাবছিল। আমি চলছি কেন, কত দূরই বা যাব, থামতে তো হবেই, ফিরতেও হবে। কী করে ফিরব! এখনও দু-একটা বাস শহরের দিকে ফিরছে বটে, ওদের রাগী-রাগী জ্বলজ্বলে চোখ, ওদের অন্তর-যন্ত্রেও গরর-গরর রাগ, ওরা আমাকে তুলে নেবে কেন, ওরা আমাকে কি তুলে নেবে? যদি হাত তুলি? যদি দু হাত তুলে সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তা হলে হয়তো থামবে বা হয়তো থেঁতলে চলেই যাবে। আমি কি 'বাঁচাও' বলে চেঁচাব, চেঁচাতে কি পারব,

কে শুনবে ? মালাও তো 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়েছিল, কে শুনেছিল ? ধোঁয়া, কুয়াশা আর কালি দিয়ে অন্ধকারের শরীর তৈরী—সেই অন্ধকারে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, আমি আর শহরে ফিরব না।

কালভার্টে পা ঝুলিয়ে সৌরকে এক সময় বসতে হল। নিজের নিশ্বাসকেও কখনও কখনও ভয় লাগে, মনে হয়, কানের কাছে কে বুঝি ফোঁস-ফোঁস করছে। হাওয়ার শিষে বিষ। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সৌর হাত দুটি বুকের কাছে জড়ো আর হাঁটু দুটি একসঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়েছিল। সামনে নয়ানজুলির ঠিক ওপাশেই কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে, মাঠের মাঝখানা দিয়ে ঠিক আলের পথ ধরে ধরে একটা লণ্ঠন দুলতে দুলতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে গেল। সৌরর মনে হল, ওই লণ্ঠন কী যেন খুঁজছিল, তাকে ইশারায় কিছু হয়তো বলছিলও, কিন্তু পিঁপড়ে মৌমাছি পাখিদের ভাষার মত আলোর ভাষাও তো সৌরর জানা নেই, তাই দপদপে শিখাটার দিকে সে শুধু কিছুক্ষণ নিষ্পলক হয়ে চেয়ে থাকতেই পারল।

আর ওই জোনাকিগুলো! ওদের যদি ছুঁতে যাই, সৌর ভাবল, ধরতে পারব না; আমার মুঠিতে অনেক যে ফাঁক। ওই জোনাকিগুলো, যারা ঝোপের ভিতরে ঢুকেই বেরিয়ে পড়ছে, আসলে কোন প্রাণী বা পতঙ্গ নয়, আমারই সুখ আর আনন্দের কয়েকটি ছোট ছোট ক্ষণ জোনাকি হয়ে জ্বলছে। আজ যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনই আমার অভ্যস্ত জীবন আর নিয়ম থেকে যখনই বেরিয়ে আসব, এখানে বা এই রকমই অন্য কোনখানে, তখনই এই জোনাকিদের জ্বলা-নেবা দেখব, আমার সুখের উজ্জ্বল কয়েকটি মুহূর্ত-বিন্দুকে ফিরে পাব, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়, তারা ধরা দিতে দিতেও দেবে না, চোখে নেশা ধরিয়েই মুছে যাবে।

মাঠের অন্য প্রান্তে কে যেন অন্ধকারের মধ্য থেকেই কাকে চিৎকার করে ডাকল; সেই ডাক মুহূর্তমধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে সৌরর কানে চারদিক থেকে এসে আঘাত করল। সৌর চমকে উঠল।

সেখান থেকে সৌর কখন উঠে দাঁড়াল, কখন আবার বাড়ির পথ ধরল, তার খেয়াল ছিল না। শহরের প্রান্তে এসে তার সম্বিত ফিরে এল। সে একটু দিশাহারাও হয়ে পড়েছিল—কয়েক মুহূর্তের জন্য। নিমীলিত চোখের ওপর হঠাৎ আলোর ছটা লাগলে যেমন হয়: প্রথমে ধাঁধা লাগে, পরে দৃষ্টি সহজ

হয়ে আসে। পাঁচটি পথ যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে তখনও সারি সারি দোকান খোলা, শো-কেস থেকে বিচ্ছুরিত আলো, ব্যস্ততা-অভিমানী নানা ধরনের গাড়ি—গম্ভীর ট্রাম থেকে ছটফটে ট্যাক্সি সবাই তাদের আপন রূপ আর চরিত্র নিয়ে আছে। শুধু কি আমিই বদলে এলাম! সৌরর অস্বস্তি একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসার রূপ নিল এবং জিজ্ঞাসাই আপনা থেকে উত্তরে পরিণত হল: না, আমিও বদলাই নি। জলে ডুব দিলে শরীরটা ভারি ঠাণ্ডা আর স্নিগ্ধ লাগে, মনে ভ্রান্তি হয়, আমার সত্তাটাই এমন সিক্ত বুঝি। একটু পরেই গা মুছে যখন শুকনো কাপড় পরে ফেলি, তখন আমরা আবার সেই ডাঙার প্রাণী। এই তো আমি ফিরে এলাম আলোয় ভিড়ে কলরবে কোলাহলে, শক্ত ইট আর কংক্রীটে গাঁথা আমার চেনা শহরে। একটু দাঁড়াই এখানে, তা হলেই আমার চোখের ঘোর কেটে যাবে, একটু সবুজ নেশা করেছি তাই পা টলছে, কিন্তু নেশা আর কতক্ষণ থাকে! সৌর খানিকক্ষণ মোহিত চোখে চেয়ে রইল আলোর খুঁটিগুলোর দিকে, ধীরে ধীরে সেই ব্যস্ত-চলন্ত পঞ্চবেণী মোড় তার চোখে একটা ফুটন্ত কড়াইয়ের রূপ নিল—সৌরকে চোখ বন্ধ করতে হল।

কিছুটা ভয়ে, কিছুটা অস্বস্তি কাটাতে সৌর একটা গলির পথ ধরল।

কিন্তু যেদিন মানুষকে ভুলে পায়, সেদিন কোন হুঁশিয়ারিতেই কাজ হয় না।

সৌর যে ভুল পথে ঘোরাঘুরি করছে, এ কি সে নিজে থেকেই টের পেয়েছিল! বোধ হয়, না। হঠাৎ খিলখিল হাসির তোড় শুনেই সে চমকে গিয়ে থাকবে।

নয়ন—নয়ন এখানে কোথা থেকে এল?

গ্যাসের আলো, তাও নিবু-নিবু, কিছু পরিষ্কার দেখা যায় না, আবছায়া কয়েকটি শরীরের ঠাম শুধু চোখে পড়ে। জড়োসড়ো একটা বেরালের বাচ্চাকে কোলের কাছে নিয়ে একটি মেয়ে পানওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছিল।

"এই, আমার মেনিকে মেরেছিস কেন রে?" খোনা-খোনা গলা, ঠিক যেন নয়নের।

"কে বলেছে, মেরিছি!"

"মেনিই বলছিল।" একটি মুখ আনত হয়ে পড়ল, বোধ হয় মেনিকে চুম খাবে বলে।

নয়ন কি না ভাল করে পরখ করবে বলেই সৌর দাঁড়িয়ে গেল। পান কিনল দু পয়সার।

মেয়েটিও তাঁকে দেখছিল।

আর তখনই সৌরর ভুল ভাঙল। না, নয়ন নয়। সৌর পিছন ফিরে চলতে শুরু করে দিল। কয়েক পা এগতেই পায়ের গোড়ালিতে একটা ঢিল পড়ল। মেয়েটিই ছুঁড়ে থাকবে। খিলখিল হাসিও শোনা গেল। হাসছিল পানওয়ালাটাও। সে চেঁচিয়ে ডাকছিল সৌরকে, আর একটা পান খেয়ে যেতে।

পান তো নয়, ওই মেয়েটিই—যে কক্ষনো নয়ন নয়—পানওয়ালার মারফত ডাকছে। ঢিলও ছুঁড়েছে। এর পরে কী! ওই বেরালের বাচ্চাটাকেই লেলিয়ে দেবে না তো? ও যদি আসে, যদি সৌরর পায়ে জিভ ঠেকিয়ে চাটতে শুরু করে দেয়?

আরও তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সৌর একজনের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আশ্চর্য, সে লোকটা কিন্তু তাড়া করে এল না, সৌরকে গাল দিল না পর্যন্ত।

লোকটা বসে পড়েছিল। অপাঙ্গে সৌরর দিকে চেয়ে জড়িত গলায় বলল, "কী বাপা! পিয়াকে গাঁও চলি রে?"

লোকটা মাতাল।

সদর-রাস্তায় এসে তবে সৌর মুখের ঘাম মোছার সময় পেয়েছিল। কী হল, সে অবাক হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিল, এ-পথে কেন এলাম? এ-পথ যে ভুল, তা কি জানতাম না! জানতাম, তবু এসেছি। এই পথই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। আর, সৌর এ-ও জানল, এইবারই শেষ নয়। এ-পথ তাকে আরও অনেকবার টানবে, আনবে। অনেক মেয়ের গলাই তার নয়নের পাখির বলে ভুল হবে, সে থামবে, ভুল টের পেয়ে পালাবে। কিন্তু আবার ফিরে এসে অনেক মুখের মধ্যে নয়ন আর পাখির মুখ খুঁজবে।

এ-পাড়ার পথে পথে ঘোরাঘুরির শেষ সৌরর এ-জীবনে নেই।

অনেক রাত্রে ছাদে উঠে সৌর তাকিয়েছিল। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা—সে কি সারা বিকেল আর সন্ধ্যা মাইলের পর মাইল ঘুরেছে বলে? কিন্তু মাথাতেও কেন যন্ত্রণা, পৃথিবীতে এত স্থান থাকতে বেছে বেছে তার মগজেরই কোষে কোষে কেন মৌমাছিরা চাক বাঁধল! তাদের গুঞ্জনের বিরাম নেই কেন, তাদের হুলেই বা এত জ্বালা কেন!

প্রবল পিপাসা আকণ্ঠ উঠে এসেছিল। সেই পিপাসাই সৌরকে বুঝিয়ে দিল, তার জ্বর এসেছে।

চোখের সামনে তখনও সকালের দৃশ্য ভাসছে। বাড়ির ও-পাশের দিকটা নিস্তব্ধ, অন্ধকার—পাখি নেই, নয়ন নেই, মালা নেই, তবু থেকে থেকে ঘুঙুর বাজছিল। কলকাকলী, বেসুরো গানেরও বিরতি ছিল না। ওরা নেই, না-থেকেও আছে।

সৌর স্পষ্ট দেখছিল, মালার গলার ফাঁস খুলে ওরা ওকে তুলে দিল ঢাকা একটা গাড়িতে। নয়ন আর পাখিকেও ওরা আলাদা একটা খোলা ট্রাকে তুলে দিল। সামান্য মালপত্র যা-কিছু আগেই উঠেছিল।

আশেপাশের ছাতে লোক ধরছিল না।

নয়ন বসেছে মাথায় কাপড় তুলে—রোদ ঠেকাতে, মুখ ঢাকতেও হতে পারে। পাখি ড্যাবডেবে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। তার এতটুকু সঙ্কোচ ছিল না।

গিন্নীরা ছেলেমেয়েদের ঠাস ঠাস করে চড় মেরে নীচে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন, তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন।

দেখছিলেন বাবুরাও। বাজারের থলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

চিত্তবাবুকেও সৌর দেখতে পেল। তাঁকেও ওরা তুলে দিয়েছিল। খোলা ট্রাক, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চিত্তবাবু বসে বসে ঢুলছিলেন। এদিক ওদিক কাতও হচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। চিত্তবাবুর নেশার ঝোঁক তখনও বুঝি কাটে নি।

ট্রাক স্টার্ট দিল, একটা পুলিস পিছনেই দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় ওদের পাহারা দিতে। চিত্তবাবু ঝিমুচ্ছিলেন, ওঁর তন্দ্রার আবেশ ছুটে গেল। গাড়ি চলতেই টলে পড়ে জড়িয়ে ধরলেন পাহারাওয়ালার পা। তার মুখের দিকে চোখ তুলে অস্পষ্ট গলায় বলে উঠলেন, "কী হল বাবা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

ট্রাকটা চলছে। গলির মুখে বাঁক নিচ্ছে। চিত্তবাবু আর পাহারাওয়ালা অদৃশ্য হল। নয়নের ঘোমটা-তোলা মাথাও আর দেখা যায় না। পাখির অপলক চোখ দুটিও আড়ালে চলে গেছে। একেবারে। তাকে পণ রেখে যারা কড়ি খেলত, হার-জিতের মীমাংসা না করেই সেই মেয়ে দুটি চলে গেছে। পণ্য-পুরুষটি পড়ে আছে। অন্ধকার ছাতে, একলা। তার জ্বর এসেছে।

সৌর ওখানেই প্রবল পিপাসা আর চিন্তার যন্ত্রণা নিয়ে বসে পড়েছিল।

*   *   *

"এ কী! এত জ্বর? গা যে পুড়ে যাচ্ছে!"

খুব মৃদু গলা, মৃদুতর স্পর্শ।

অনেক কষ্টে চোখ খুলল সৌর, কিছু দেখতে পেল না, হাত বাড়িয়ে সেই স্পর্শটুকুকে তপ্ত কপালে চেপে ধরল।

"নীচে যাও নি, কিছু খাও নি, কখন ফিরলে? ছিঃ, এত জ্বর নিয়ে এই খোলা ছাতে ঘুমতে আছে?"

সৌর কিছু বুঝতে পারছিল না, দেখতে পাচ্ছিল না, উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। নরম দুখানি হাত ওকে ধরে ফেলল।

শুকনো বিমূঢ় গলায় সৌর বলল, "নীচে যাব। জল খাব।"

"উঠতে হবে না, আমি জল আনছি" বলল সেই স্বর। সৌরকে সাবধানে শুইয়ে দিয়ে একটি ছায়া-ছায়া দেহ-রেখা নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি-ঘরে অদৃশ্য হল।

দিনান্তলিপি থেকে: পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করে সতী কৌতুক বোধ করত। বলার কথা যখন ফুরিয়ে যেত কিংবা খুঁজে পাওয়া যেত না, তখনই সতী, আমরা প্রথম যেদিন কথা বলি, সেদিনকার রাত্রির কথা তুলত। জিজ্ঞাসা করত, সত্যি কথা বল তো, আমাকে ছুঁয়ে বল, সেদিন কী ভেবেছিলে তুমি? আমি বলতাম, কিছু ভাবি নি। আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সতী বলত, মিছে কথা, আমি যখন জলের গ্লাস নিয়ে ফিরে এলাম, তখনও তুমি জেগে ছিলে। তোমার চোখের পাতা বন্ধ ছিল, কিন্তু পায়ের বুড়ো আঙুল নড়ছিল।

কী করে জানলে?

ঝুঁকে পড়ে আমি দেখছিলাম যে।

আর কী?

আর আমি তোমার পাশে জলের গ্লাস নামিয়ে চলে আসছিলুম।

তখন কী হল? (আমি জানতাম, তবু জিজ্ঞাসা করতাম, সতীর মুখে শুনতে ভাল লাগত। পুরনো রেকর্ড কি লোকে বাজিয়ে বাজিয়ে শোনে না? সতীর গলা মিষ্টি ছিল, সতীর বলার ভঙ্গি সুন্দর ছিল।)

তখন আমার আঁচলে টান পড়ল। ফিরে চাইলাম। দেখি, তুমি টানছ।

আর?

জানি না। আচ্ছা, কী করে টেনেছিলে বল তো? তখন পর্যন্ত তুমি তো আমার মুখখানাও ভাল করে দেখতে পাও নি।

দেখতে নাই বা পেলাম, তোমার ছোঁয়া তো পেয়েছিলাম।

প্রথম দর্শনে প্রেমের কথা শুনেছি, তোমার প্রেম কি প্রথম ছোঁয়াতেই?

হয়তো তাই।

তোমার মনে তখন কী হচ্ছিল?

বলা মুশকিল। সেকালের উপন্যাসের এক-একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা থাকত না! বোধ হয় তারই একটা ভাবছিলাম, যেমন ধর, "করুণাময়ী তুমি কে?"

সতী বলত, আমি বসে পড়েছিলাম। আমাব শাড়ির প্রান্ত তখনও তোমার মুঠোয়, সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, ছিঃ! আস্তে আস্তে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বললাম, ঘুমোও। তুমি বললে, ঘুম আসছে না যে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুব কী কষ্ট হচ্ছে? কষ্ট?—তুমি বলেছ, না, তবে খুব খালি-খালি লাগছে। আমি কারণ জানতে চাই নি, আমি জানতাম কেন।

ও। আব কী হল?

সতী আর জবাব দিত না, আমার বুকে মুখ লুকত। অনেক পরে, বুকে মুখ রেখেই চোখ তুলে বলত, অসভ্য! তোমরা সব পার। আচ্ছা, চেনা নেই, নাম জান না, এমন একটি মেয়েকে কী করে কাছে টেনে নিয়েছিলে বল তো?

আমি আশ্রয় খুঁজছিলাম।

আশ্রয়?

হ্যাঁ। ঝড়ে দাঁড় ভেঙে গিয়েছিল, পাল-ছেঁড়া আমি নৌকো ভেড়াতে পারি এমন পাড় খুঁজছিলাম।

আমিই সেই পাড়?

তুমিই সেই।

কী করে চিনলে?

ছোঁয়া দিয়ে।

সতী বলত, ও। (এই 'ও' অব্যয়টা ওর মুদ্রাদোষ, আমি জেনেছিলাম।) চুপ করে থাকত। আমিই আবার বলতাম, আমার অবস্থাটা কেমন ছিল জান সতী? সেই পথিকের মত, যাকে দস্যুরা তাড়া করেছে সর্বস্ব কেড়ে নেবে বলে, সে ছুটেছে, রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে প্রথম যাকে পেল, তার কাছেই তার শেষ সম্বল গচ্ছিত রাখল। আমার সব খোয়া যেতে বসেছিল, স্বপ্ন, বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা—সব। যেটুকু তখনও বেঁচে ছিল, তোমার কাছে জমা দিলুম।

তোমার আশা আর ভালবাসা?

তাই।

ভাল করে জানবার আগেই এত বিশ্বাস?

জানা হয়ে গিয়েছিল। আর বেশী পরখ করবার তখন সময় কই?

সৌরেশ আজ ভাবলেন, আশ্চর্য, আমি আবার ভালবাসতে পারলাম। আছাড় খেয়ে পড়েও পর-মুহূর্তেই উঠে দাঁড়ালাম। ধুলো-বালি ফেললাম ঝেড়ে। আমি আবার ছুটব।

সেদিন রাত্রে সতী কখন চলে গিয়েছিল জানি না। আমি আর কী করেছি, জানি না। কিছু মনে নেই। শুধু একটা বিকারভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে ছিল।

সকালের রোদ ছাদে এসে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙেছিল। তবু যতক্ষণ পারি, চোখ বুজে ছিলাম। চোখ মেললাম কেন? বোধ হয় সকালবেলার চড়ুই পাখির ডাকে। ওরা আমাকে দেখছিল, কিচ-কিচ করছিল। আমি হাত তুললুম, ওরা উড়ল। যেন এই ইশারার অপেক্ষায় ছিল।

চোখ মেলে আমি কী দেখলাম? গোটা কয়েক বাসী ফুলের পাপড়ি। কুড়িয়ে কী পেলাম? চুলের একটা কাঁটা। কাঁটাটা নাড়তে গিয়ে আমার হাতে ফুটল, আমি ব্যথা পেলাম। আর তখনই আমার মনে গ্লানি এল। দু হাত দিয়ে চোখ কচলে মুখ রগড়ে রগড়ে আমি হাত দুটি রোদ্দুরে মেলে ধরলাম। হাতের তেলোয় কাজলের অনেকখানি কালি। ছি!

ছি—আমি ভাবলাম—ছি! অচেনা একটি মেয়ের আমি ছোঁয়া নিয়েছি, অচেনা একটি মেয়েকে ছোঁয়া দিয়েছি।

তখনই তাকে দেখলাম।

সে স্নান সেরে ছাতে এসেছিল। ওর খোলা-মেলা ভিজে চুলে অপর্যাপ্ত মুক্তি। ও তারে কাপড় শুকতে দিচ্ছিল। আমি রাত্রে ভাল করে দেখতে পাই নি, তবু ওকে চিনলাম। এই সেই। আমার লজ্জা হল, আমি আবার চোখ বুজে ফেললাম।

আমি পায়ের শব্দ শুনছিলাম। ও এদিকটাতে তারের নাগাল না পেয়ে ওদিকে চলে যাচ্ছে। ও হাঁটছিল। ওর পায়ের চাপ আমি টের পাচ্ছিলাম আমার গোড়ালিতে, হাঁটুতে, কোমরে, বুকে, গলায়। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমার শরীরের ওপর দিয়ে হাঁটছে কেন? আমাকে কেন খেঁতলে

দিতে চায়? আবার চোখ খুললাম আমি, ওকে দেখতে পেলাম না। কী জানি, কতদূর সরে গেছে, কিন্তু ওর পায়ের শব্দ শুনছিলাম। সেই মৃদু-নরম পা ফেলার ছন্দ আমাকে ঘিরে ফেলছিল। ওকে চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই ওর পায়ের শব্দই ওর অস্তিত্ব হয়ে উঠেছিল, আমাকে গ্রাস করছিল।

রোদের তাত বাড়ছিল। আমার বন্ধ চোখের পাতায় ছুঁচ বিঁধছিল। কাপড় মেলে দেওয়া তো শেষ হয়ে গেছে, তবু ও নীচে নামছে না কেন?

এবার চুরি করে চাইলাম। ও আলসের ও-ও চুরি করে চাইছিল। আমি হাসলাম। ও-ও হাসল। ওকে ইশারায় ডাকলাম, এল না। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে চুলের কাঁটাটা দেখালাম। ও হাত বাড়িয়ে সেটা নিল, ঘাড় নিচু করে খোঁপায় পরল।

বাসী ফুলটা ফিরিয়ে দেওয়া তখনও বাকী ছিল। কিন্তু সেটা খুঁজে পেলাম না।

আমি কালো রোগা কিন্তু সুশ্রী মেয়েটিকে দেখছিলাম। কাল এত কথা বলেছে, আজ কিছু বলবে না নাকি? কাল স্পর্শ দিয়েছে, আজ বোঝা-যায়-না-যায় এমন হাসি দিয়েই বিদায় নেবে?

আমি থরথর কাঁপছিলাম, পাগল হয়ে উঠছিলাম, পাশ দিয়ে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।

সারা সকাল তার চিন্তা, সৌরেশ আরও ভাবলেন, আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল বলেই তো আমি আমার অনুভূতিকে চিনতে পারলাম। ভালবাসা। এর নামই ভালবাসা। নইলে পথে চলতে চলতেও সেই কালো রোগা মেয়েটিকে আমি দেখতে পাব কেন, তাদের দোতলায় যখন বসে আছি, তখনও তার পায়ের শব্দ শুনব কেন? সে যেন আমার রক্তের নদী হেঁটে পার হয়ে যাচ্ছে, আমি ছলাত ছলাত শব্দ শুনছি।

আমাকে যে ডাক দেবে, তাকে বার বার ডেকে ফিরেছি। সেদিন জানলাম। ডাকতে হয় না, সে নিজেই আসে। যাদের মধ্যে তাকে খুঁজেছি তাদের মধ্যে সে ছিল না, কিন্তু এই কালো মেয়েটির মধ্যে সকলেই আছে।

সারা দিন এই ভাবনায় সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল, শান্তি ছিল। সৌর ভেবেছিল, এই ভাবনা নিয়েই তার বেশ কাটবে। তার ভালবাসাকে সে সনাক্ত করতে পেরেছে, আর কিছু চাই না।

একটু অনুশোচনাও ছিল কালকের রাত্রের অসংযমটুকুর জন্য। যে ভালবাসার প্রতীক্ষা করেছি, তা যখন এল তখন তার মর্যাদা রাখতে পারলাম না। তাকে ছুঁয়ে, ছিঁড়তে চেয়ে অমর্যাদা করলাম। এ-ভুল আর হবে না।

বিকালের দিকে আবার সেই জ্বরটা যেন ফিরে এল। সেই ছাদ সৌরকে কেবলই টানল। অন্ধকার নেমে নেমে শুধু প্রত্যক্ষ জগৎ নয়, ওর মনের ভিতরটাকেও যেন কালো করে দিল।

"আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি," সৌর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে আর্তনাদ করল, "আাম কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

পড়ার টেবিলের সামনে সৌর বসে ছিল। টেবিলটা কে যেন গুছিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজপত্রগুলো টেবিলেই ছড়ানো থাকে, সেগুলো যে কোথায় অন্তর্হিত হল কে জানে! তার মধ্যে টুকরো ছেঁড়া অনেকগুলো কবিতার লাইন ছিল যে!

একটা বই টেনে নিল সৌর, তার পাতার ভাঁজে পাওয়া গেল সেই চুলের কাঁটাটা। অবাক হয়ে সৌর ভাবল, এটা তো আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আবার এখানে এল কী করে! সে-ই কি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে! এই টেবিলটা তবে গুছিয়ে দিয়েছে সে-ই, এই কাঁটাটা তার চুলের। বইটিকে মুখের কাছে নিয়ে এল সৌর, নিশ্বাস নিল, যেন ঘ্রাণ পেল সেই মেয়েটির। পকেটে চিনেবাদাম ছিল, ছাড়িয়ে নিয়ে চিবতে চিবতে মনে হল, তার স্বাদ পাচ্ছি। তার চেয়েও অদ্ভুত এই যে, সৌর থেকে থেকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, এই যে সে বসে আছে, কে যেন তাকে অপলক চোখে দেখছে। সে যখন ঘুমবে তখনও দেখবে। অনেক রাত্রে পা টিপে টিপে সৌর ছাতে এল। এখানে সে থাকবে, যদি নাও থাকে আসবে।

সারাদিন সৌর ভেবেছে, ভাবনাটুকু নিয়েই সে বেশ থাকতে পারবে, কেননা ভাবনা হল ভালবাসার মন। সেদিন সেই মুহূর্তে ছাতে একা অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সৌর অনুভব করল, ভালবাসার শরীরও আছে—স্পর্শে, ঘ্রাণে, শ্রুতিতে, স্বাদে, দর্শনে।

পিছনে ছায়া পড়ল, সৌর ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এস, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।' সে পাশে এসে দাঁড়াল, মমতামৃদু স্বরে বলল, "না, তুমি ভাবছিলে নয়ন আর পাখির কথা।"

সৌরেশ সৌরকে বললেন, 'তুমি কমবয়সী, অনভিজ্ঞ। তাই জান না, সতী তোমাকে কী দিয়েছিল। জানলেও, নাম জান না।'

'জানি। সুখ, শান্তি।' একটু ভেবে সৌর জুড়ে দিল, 'আর আনন্দ।'

'আনন্দ?' সৌরেশ হেসে উঠলেন, সেই হাসি শুধু সৌরই শুনতে পেল। বিদ্রূপের ভঙ্গিটা তাকে বিঁধল। আহত গলার সে বলল, 'কেন? সুখ নয়? শান্তি নয়? আনন্দ নয়?'

সৌরেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'তিনটের কোনটাকেই তুমি চেন না, তাই এক নিশ্বাসে তিনটি কথাই উচ্চারণ করলে। তিনটি ছাত্রকেই ব্র্যাকেটে এক নম্বর দিলে। যদি অভিজ্ঞতা থাকত তোমার তা হলে টের পেতে, সুখে শান্তি নেই, শান্তিতে নেই আনন্দ। শক্ত ঠেকছে?'

নির্বাক সৌর শুধু মূঢ়ভাবে মাথা নাড়ল।

'বেশ বল, সুখ বলতে তুমি কী বুঝেছিলে?'

'সতীকে পেয়েছিলাম, সেই সুখ।'

'শুধু সেইটুকু?'

'না,' খোঁচা খেয়ে সৌরর মুখ খুলে গেল, 'না, শুধু তাই নয়। আমার জীবনের চেহারাই বদলে গিয়েছিল যে।'

ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গ, সৌরেশ তখনও হাসছিলেন।—'জীবন কী?'

'বেঁচে থাকা।'

'না। প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকার যোগফল জীবন। তার পর বল।'

'বেঁচে থাকার স্বাদ বদলে গিয়েছিল।'

'শুধু স্বাদ?'

সৌর গদগদ গলায় বলল, 'আর রঙ আর স্পর্শ। আর গন্ধ আর মোহ। সব আমাকে ছেয়ে ফেলেছিল, ভরে তুলেছিল।'

'ছেলেমানুষ', সৌরেশ স্বগত বললেন, 'ছেলেমানুষ।' সৌর সুখ, শান্তি আর আনন্দের মধ্যে তাই তফাত করতে জানত না। সময়ের দহে আমরা মৃণালের মত ডুবে থাকি, দহে যদি ঢেউ না থাকে, তাকেই বলি শান্তি। পাঁক থেকে আলোয় পৌঁছতে মৃণালের গায়ে কাঁটা ফোটে, সেই রোমাঞ্চকে বলি সুখ। কিন্তু আনন্দ আরও ওপরে—সে আলোয় আকাশে ফুলের মত ফুটে থাকে।

'আনন্দই কি তবে জীবনের লক্ষ্য? কিন্তু শুধু ফুটেই যে ফুরিয়েগেল,

সে কোন্ লক্ষ্যে পৌছল? ফুটে ওঠা একটা ক্রিয়া। রূপ আর সৌরভ একটা অবস্থা। ফুরিয়ে যাওয়া একটা পরিণতি মাত্র। প্রথমটা সৃষ্টি, দ্বিতীয়টা স্থিতি, তৃতীয়টা লয়। তিনে মিলে একটা নিয়মের বৃত্ত, যার মধ্যে অস্তিত্ব আবর্তিত। অস্তিত্ব নিজেই যদি নিজের অর্থ না হয়, তবে তাঁর দ্বিতীয় কোন অর্থ নেই।

'অস্তিত্ব যদি অর্থহীন তবে আমরা বাঁচি কী নিয়ে? ইচ্ছা নিয়ে, আশা নিয়ে, বাসনা নিয়ে। শান্তির আশা, সুখের বাসনা। শান্তি আবার জলের মত সাদা, স্বাদহীন। সে যদি একঘেয়ে হয়ে ওঠে, আমরা তখন তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে কয়েকটি সুখ আর দুঃখের কণা সৃষ্টি করি। সাদাকে ভাঙলে অনেক রঙ পাওয়া যায়, শান্তির ভাঙা ভাঙা টুকরো সুখ আর দুঃখের কণাগুলিরও তেমনি নানা রঙ—বেগুনী, কমলা, হরিৎ, পীত, লোহিত, নীল। সাধ মিটলে তাদের আবার জোড়া দিয়ে দিয়ে অখণ্ড শান্তি তৈরি করতে চাই।

'এত কথা জানা সৌরর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সৌর শুধু নেশাই করেছিল। বিকাল হলে জ্বর আসার নেশা। ছাদে একলা দাঁড়িয়ে থাকার নেশা।'

ঠিক একা নয়। সে আসত। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, এমন কি সৌরর নিজেরও চোখ দুটি যখন ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে, তখন। এসে সৌরর পাশে দাঁড়াত। তার আঁচল হাওয়ায় উড়ে সৌরর গায়ে লাগত। সৌর তার গন্ধ পেত। চুলের? চামড়ার? জিভের লালার, নিশ্বাসের? না। অস্তিত্বের। শুধু উপস্থিতিরই একটা গন্ধ আছে।

'তারা-দেখা শেষ হল?'

'হ্যাঁ।'

'চিনেছ?'

'চিনেছি।'

'বল তো কোন্‌টা মৃগশিরা আর কোন্‌টা পুষ্যা?'

'নাম জানি না।'

'তবে যে বললে চিনেছি।'

'নাম না জানলেও চেনা যায়। যেমন—'

'যেমন আমাকে, না? আমার নাম সতী।'

'সতী, তোমাকে আমি মিছে কথা বলেছি। আমি তারা শুনতে ছাদে আসি না।'

'জানি। তুমি নয়ন আর পাখিদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকতে আস। চমকে উঠলে?'

'না। তুমি আরও কত জান, তাই ভাবছিলাম। জানলে কী করে?'

'দেখে দেখে।'

'তার মানে আড়াল থেকে তুমি আমাকে লক্ষ্য করেছ। ওদের নাম জানলে কী করে?'

'তোমার খাতার পাতা থেকে।'

'চুরি করে পড়েছ?'

সতী উত্তর দিত না।

সৌর বলত, 'আর-কেউ জানে?'

'কেউ না।'

'শুধু তুমি?'

'শুধু আমি।'

'ও।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত সৌর।—'সতী, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

'কৃতজ্ঞতা?'

'কৃতজ্ঞতা। আমাকে নানা পথ টানছিল, আমি স্থিতি পাচ্ছিলাম না, তুমি আমাকে ফিরিয়ে এনেছ। ঘরমুখী করেছ।'

'এবার স্থিতি পাবে।'

'পাব।' প্রগাঢ় গলায় উচ্চারণ করত সৌর, তারপর হঠাৎ যেন অস্থির হয়ে বলে উঠত, 'এই!'

'কী?'

'মুখ ফেরাও না।'

'কেন?'

'একটিবার, একটু!'

'কী হবে?'

'তোমাকে দেখব। তোমাকে ভাল করে দেখতে দাও না কেন?'

'এই তো দিয়েছি।'

'না, এতটুকুতে কিছু হয় না। এই রাতটা অন্ধকার, এই ছাতটা অন্ধকার, আমি শুধু আবছাভাবে তোমাকে দেখি। তুমি কালো, অন্ধকারে কালোর সঙ্গে মিশে যাও। কাছে এস।'

'এলাম।'

'মুখ তোল। চোখ খোল।'

'হয়েছে ?'

'না, আর-একটু। তোমার গন্ধ নিতে দাও। ছোঁয়া পেতে দাও। এই গন্ধ কার ?'

'আমার।'

'এই ছোঁয়া ?'

'আমার।'

'আর গন্ধ আর ছোঁয়া যার সেই তুমি ?'

'তোমার।'

* * *

আবার সকালে যন্ত্রণার মধ্যে সৌরর ঘুম ভাঙত। ও-পাশের বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে, নয়ন নেই, পাখি নেই। সতীও নেই, সতী কখন গেল ?

নীচে নেমেও তাকে সৌর খুঁজে পেত না।

মধ্যবিত্ত যৌথ সংসারে সকালগুলো কা-কা করে চেঁচায়, কলতলায় আছড়ে-পড়া কাঁসার বাসনে ঝনঝন করে ওঠে, বাসী মুড়ি হয়ে হাওয়ায় ছড়ায়, আর কলাই-ওঠা পেয়ালা থেকে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়। সকালের মুখে অনেক দাঁতনের ফেনা, চোখে পিঁচুটি। লাট-করা ভাজ-ভাঙা শিথিল শাড়ির থসথস আঁচলও আছে, কিন্তু তার মধ্যে সতী কই ?

দিনে তাকে দেখা যায় না। দেখা গেলেও চেনা যায় না। সে কি ওই কালো মেয়েটি যে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে কলঘরে গিয়ে ঢুকল ? সে বেরিয়ে এসে কাপড় মেলে দিতে ছাদে গিয়ে ওঠে—সৌরও পিছে পিছে যেতে চায়, কিন্তু সাহস পায় না, যদি সে না হয় ? যদি সে-ই হয়, কিন্তু ভুলে গিয়ে থাকে ? যদি তার চোখে ভ্রূকুটি ফোটে ? রাত্রে যে অনেকখানি মোহ, মধুরতা আর প্রশ্রয় নিয়ে ধরা দেয়, দিনের আলোয় সে যদি বদলে গিয়ে থাকে ?

তার মনটাকে সৌর তো চেনেই না, দিনের বেলা তার শরীরটাও বুঝি কঠিন আর রূঢ় অথবা ভীরু আর বিব্রত হয়ে থাকে ?

তার চেয়ে এই ভাল, সৌর নতুন বইয়ের পাতা নাকের কাছে এনে তার ঘ্রাণ নিক, নরম পাউরুটিতে দাঁত বসিয়ে অধরের স্বাদ ফিরিয়ে আনুক। বিকল্প আঘ্রাণে আর দংশনে সে তবু আছে, দিনের রূঢ় রোদ্দুরে দেখা শরীরের কোথাও নেই।

* * *

তারপর গম্ভীর রাত্রির ইশারা তো আছেই। সে সাড়া দেবে, পা টিপে টিপে উঠে আসবে, ধরা দেবে।

'এই!'

'কী?'

'নিশির ডাক কাকে বলে, জান?'

'কাকে?'

'একটা ডাবের জলে মানুষের আয়ুকে পুরে বাখা যায়, জান না?'

'না তো।'

'আমার আয়ুও তুমি নিয়েছ। এই!'

"বল।'

'দিনের বেলা তোমাকে পেতাম না বলে আফসোস ছিল। এখন নেই। কেন, জান?'

'কেন?'

'দিনেও তোমাকে পাই বলে। কী করে, জান? ছেলেমানুষী ভাবনার কথা তোমাকে বলতেও লজ্জা হচ্ছে। এতদিন নিজেকে বড় একা লাগত। এখন আর লাগে না। মনে হয়, তুমি আছ। তুমি দেখছ। সিগারেট ধরালুম, মনে হল, তুমি দেখলে। চায়ের দোকানে গেলুম, তুমি আমার পাশে গিয়ে বসলে, চলতি বাসে উঠতে গিয়েও পারলুম না। অপ্রস্তুত হয়ে এদিক-ওদিক চাই, তুমি দেখে ফেল নি তো? তাই মনে হয়, আমি একা নয়, অন্তত একজন তো এই মুহূর্তে আমার কথা ভাবছে! তুমি সব সময়ে কি আমার কথা ভাব?'

'ভাবি।'

'আমার সান্ত্বনা সেই।'

'সান্ত্বনা?'

'না, যন্ত্রণাও। কত রাত অবধি তোমার জন্যে এখানে জেগে থাকি, তুমি আসতে দেরি কর। তখন কষ্ট হয়, যন্ত্রণা পাই। আবার দেখ, সেই যন্ত্রণাও ভাল লাগে। ছটফট করার মধ্যে কত সুখ, তুমি জান?'

'জানি না ?' গভীর-অতল চোখ তুলে সতী বলত, 'জানি না ?'

সেই ভঙ্গিটা সৌরর মনে হত—চেনা। কার, কার,—কার যেন ? পাখির। পাখি ওইভাবে চোখ তুলে চাইত। এইভাবে কথা বলত।

'নয়নের কথা ভাবছ ? পাখির ?'

সৌর চমকে উঠে বলত, 'না—না। সতী, নয়ন আর পাখি হারিয়ে গেছে।'

সতী আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিত সৌরর চুলে। নুয়ে পড়ে বলত, 'তুমি, ওদের খুব ভালবেসেছিলে, না ?'

'ভালবাসা ?' সৌর ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, 'কী জানি! ভালবাসা হয়তো দিই নি। হয়তো কাউকে দেওয়ায় যায় না, ভালবাসা নিজের মধ্যেই থাকে। ওদের যদি ভালবাসা দিয়েই ফেলব সতী, তবে তোমাকে আবার সেই ভালবাসা দিলুম কী করে ?'

'আমাকে দিয়েছ ?'

'দিয়েছি।' অতি-ক্ষীণ গলায় বলত সৌর, তারপর ঘুমিয়ে পড়ত।

সৌরেশ বললেন, 'বুঝলাম। সৌর, এই আশ্রয় তোমার কতদিন ছিল ?'

'মনে নেই। হয়তো দেড়মাস—দু মাসও হতে পারে।'

'সেই আশ্রয় ভাঙল কেন ? সৌর, তুমি কি ভয় পেয়েছিলে ?'

'ভয় কেন ?'

'তবে লজ্জা ? কাপুরুষতা ? সৌর, এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই, অকপটে বল, তোমাদের ভালবাসার বীজ সতীর শরীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল, অবয়ব নিচ্ছিল, সেই দায়িত্ব নেওয়ার সাহস কি তোমার ছিল না ?'

'মিথ্যে কথা।' সৌর সরোষে বলে উঠল 'মিথ্যে কথা। আমার সাহস ছিল, ইচ্ছা ছিল। আমি—আমরা বিয়ের সংকল্পও স্থির করে ফেলেছিলাম। আমি আগামীকে মেনে নিতে তো তৈরিই ছিলাম।'

'তবে ?' সৌরেশ নির্মম প্রশ্ন করলেন, 'তবে তুমি পালালে কেন ? কেন বারো বছরের মত নিরুদ্দেশ হয়েছিলে ?'

সৌর ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, 'সব ফাঁকি, সেটা একদিন জেনে গেলাম যে। গোটা জিনিসটাই আমার কাছে প্রহসনের মত লাগল।'

'সৌর, খুলে বল।'

পড়ার টেবিলে বসে সৌর লিখছিল। কী! কিছু না, একটি নাম শুধু, সতী—সতী—সতী। যে এই টেবিলটা গুছিয়ে দিয়ে গেছে, এই টেবিল-ঢাকা কাপড়টায় তার স্পর্শ রেখে গেছে। সৌর টেবিলের মসৃণ ঢাকনায় হাত বুলিয়ে সেই স্পর্শের একটুখানি তুলে নিল।

ফুলদানিতে একগুচ্ছ তাজা ফুল। সৌর একটি ফুল তুলে নিয়ে নাকের কাছে আনল, চোখে ঠেকাল।

পিসিমা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, সৌর জানত না। পিসিমা কথা বললেন বলেই জানল।

"বই-টইগুলো আজ তো দিব্যি গোছানো রে! কে গুছিয়ে রাখল?"

অসতর্কভাবে সৌর বলে ফেলল, "কী জানি! হয়তো সতী।"

"সতী!" পিসিমা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন।—"সতীকে তুই চিনিস?"

"না।" সাবধান হয়ে সৌর অনায়াসে মিথ্যে কথা বলল, "না। তবে দেখেছি কয়েকবার। কালো একটি মেয়ে, কিছুদিন হল এসেছে—তোমাদের কেমন আত্মীয় হয়, না?"

"হ্যাঁ। ওই তো সতী। দূর-সম্পর্কে আমার ভাসুরঝি। মাস দুই হল এসেছে। মেয়েটি ময়লা হলেও সুশ্রী।"

সৌর ভিতরে ভিতরে ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। এর পরে কী বলবেন পিসিমা তাও যেন সে আন্দাজেই বুঝে নিয়েছিল, কী জবাব দেবে তা-ও সে তৈরি করে নিচ্ছিল মনে মনে।—বিয়ে? এখনই কি পিসিমা? পরীক্ষাটা দিই আগে, পড়াশোনা শেষ করি।

কিন্তু পিসিমা তার চেয়েও মারাত্মক কথাটা যদি বলতে এসে থাকেন! সতীর শরীরের ভিতরে যা ঘটছে যদি তাঁর চোখে সেটা ধরা পড়ে গিয়ে থাকে? সেই প্রশ্নের কী জবাব দেবে সৌর? ঠিক করতে পারল না বলেই সৌর তার হাতের আঙুলগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। আঙুল আপনা থেকে কাঁপছিল। হাত তুলে নিয়ে সৌর আস্তে আস্তে আঙুলগুলো কামড়াতে থাকল। এতে যদি কাঁপুনি থামে!

"মেয়েটি ময়লা হলেও সুশ্রী," পিসিমা বলছিলেন, "কিন্তু কী অদৃষ্ট দেখ্, ওর কপালে সুখ নেই।"

"কেন নেই পিসিমা?" সৌর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ও কি—ও কি বিধবা?"

পিসিমা বললেন, "বিধবা কী রে! বিয়েই তো হয় নি।"

"তবে?"

পিসিমা বললেন, "ওর দেহে অসুখ আছে।"

দেহের উল্লেখে সৌর কেঁপে উঠল। নির্জীব গলায় জিজ্ঞাসা করল, "কী অসুখ পিসিমা?"

"মাথার। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন ছিটছিট ভাব। অনেক চিকিৎসা হয়েছে—"

"সারে নি?"

"কিছু সেরেছে। তবু এখনও গোলমাল আছে। ঘুমের ঘোরে কোথায় উঠে চলে যায়, দিশা নেই। মেয়েটা কবে যেন বেঘোরে হাত-পা ভেঙে মরবে।" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিসিমা বললেন, "চিকিৎসার জন্যে ওকে এনেছে। এ-সব ব্যাপারে ভাল ডাক্তার আছে নাকি তোর খোঁজে?"

আর তো শুনছিল না সৌর, ওর নিজের মাথার মধ্যেই গ্রন্থিগুলি খুলে গিয়ে গিয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মাথায় ছিট আছে সতীর, সে কি তবে ঘুমের ঘোরেই মাঝরাতে ছাদে চলে আসে? যাকে ছুঁয়েছে সৌর, কাছে টেনে নিয়েছে, সে তবে অচৈতন্য শব ছাড়া কিছু না?

সৌর আর ভাবতে পারছিল না, মাথা ঘুরছিল। এক অদৃশ্য গহ্বরে অনর্গল জলস্রোত পড়ছে, সেই প্রপাতের শব্দ শুনছিল। কিছুই তবে কিছু না? সৌর ভাবছিল, আর-কিছুই যদি কিছু না, তবে এই টেবিলটাও তো নেই, আমি তবে প্রাণপণে আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছি কাকে? এই দেওয়াল-ঘেরা ঘরটাও তবে নেই, আমি তা হলে বসে আছি কোথায়, বসে আছিই বা কেন? বসে থাকব না, জিভ আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল, তাই মুখে সৌর উচ্চারণ করতে পারল না, মনে মনে বলল, 'বসে আমি থাকব না।'

* * *

সেই দিনই শেষ রাত্রে সৌর নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

সৌরেশ বললেন, 'শুনলাম। কিন্তু সৌর, তুমি আসলে ভীরু, কাপুরুষ।'

'কাপুরুষ কেন?'

'নইলে ওভাবে কেউ পালিয়ে যায়?'

'পালাব না?' সৌর আহত-বিস্ময়ে বলে উঠল, 'পালাব না? আমার একমাত্র ভালবাসা যে মিথ্যে হয়ে গেল।'

সৌরেশের হাসিতে সৌর বাধা পেয়ে থেমে গেল। সৌরেশ বলছিলেন, 'ভালবাসা? ভালবাসা তুমি কাকে বলছ সৌর?' একবারও কি তোমার মনে হয় নি, তুমি লম্পট আর কামুক?'

'কামুক?'

'কামুকই তা। দেখ ও-সব ভালবাসাটাসা তোমার বাজে কথা, নিজেকে ওই বলে ঠকিয়েছ। সতী মেয়ে—রক্ত-মাংসের পুষ্টি আর উচ্ছ্বাস নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তুমি রোধ করতে পার নি। নারীমাত্রেই তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু, এ-কথা স্বীকার করতে তোমার সঙ্কোচ ছিল, তাই প্রবৃত্তির নাম দিয়েছিলে ভালবাসা। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে সৌর, তুমি এবার যাও।'

'তুমি এবার যাও।' সৌরেশ আবার বললেন স্থির গলায়, 'রাত শেষ হয়ে আসছে। আমি এবার একটু একলা থাকি, ঘুমোই।'

সৌরেশ সৌরকে ফিরে যেতে বললেন। অনেক দূর তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, এবার যাও। অনেক কথাই তোমাকে এতক্ষণ ধরে বলেছি, কথা বলেছ তুমিও, এখন আমি একটু একলা থাকি। আমাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দাও।

ছোট টুলু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সৌর, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? আমি এখন যে কথা বলব, নিজের সঙ্গেই বলব। সৌর, তোমার বয়স হয় নি, তুমি সে কথা বুঝবে না। সাক্ষী রেখে তা বলাও যায় না। 'আমি আমাকে নিয়ে থাকব', কথাটা হয়তো আত্মরতির মত শোনাল—শোনাক না।

আবার এ-ও বলতে পারি, আমি এই রাতটাকে নিয়ে কিছু সময় কাটাব। এতক্ষণ ওকে দূরে রেখেছি, বসে বসে ও বুঝি ক্লান্ত হয়ে গেল, এবার এই রাতকেই কাছে ডেকে নিই। নইলে সময় হয়ে এসেছে, হতাশ হয়ে এই রাত হয়তো আমাকে ছেড়ে যাবে। আমি তখন কী নিয়ে থাকব? আমি কি থাকব?

ওই শোন, অস্থির হয়ে টিকটিকিটা ডেকে উঠল। এতক্ষণ ও অপেক্ষা করছিল। সামনের মাঠ-পাড়ে নীলাভ গাছের সারি একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। টকটক-করা ঘড়িটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। আমার কাছে ওদেরও কিছু দাবি আছে।

সৌর, তুমি যাও।

নিরুদ্দেশ হয়ে যে গিয়েছিল, সে সৌর; দশ-বারো বছর পরে ফিরে এল যে, সে সৌরেশ। তাকে সহসা কেউ চিনতে পারে নি। তার মাথায় টুপি—চুল নয়, চুলের বিরলতা ঢেকে রেখেছিল। তার চোয়ালের চামড়া আরও খরখরে, রঙ আরও তামাটে। নাকটা আর বেশী উঁচু-নীচু হয় নি বটে, কিন্তু নাকের ঠিক পাশেই একটা কাটা দাগ জুটেছিল। কয়েকটা মিলিয়ে-আসা বসন্তের

চিহ্ন, কতগুলো বছর কেটে গেছে তাই বলছিল। গালের হাড়ে একটু ঔদ্ধত্য ফুটে ছিল, আর চিবুকের ছাঁদ, ঠোঁটের ভঙ্গি মিলিয়ে ঈষৎ-কঠিন মানসের ইশারা দিচ্ছিল।

কেউ চিনতে পারে নি।

ব্যাগ নামিয়ে রেখে সৌরেশ টুপি খুললেন, পা ছুঁয়ে যখন প্রণাম করলেন, পিসিমা তখনও তাকিয়ে ছিলেন।

"চিনতে পারছ না?" সৌরেশের স্বরও মেঘ-মেঘ, ঠিক আগের মত নেই।

কিন্তু পিসিমা যেই সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "ওমা, টুলু, তুই!" অমনিই অনেকগুলো বছর যেন নিমেষে অন্তর্হিত হল, সৌরেশ লজ্জিত হয়ে তাকালেন নিজের দিকে, টুলুকে কি তবে আমারই ভিতরে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি, আমি কি ছেলেধরা?

আরও অনেকে ভিড় করে এসেছিল, দেখছিল, ফিসফিস করে কথা বলছিল, তাদের কাউকে সৌরেশ চিনলেন না। এরা কেউ কি সেদিন ছিল, অন্য কারও মধ্যে ছিল, অন্য কেউ হয়ে ছিল? মনে পড়ে না তো। কার কোলে একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল, সৌরেশ হাত বাড়াতেই একটি ছেলে পিছিয়ে গেল। এরা কেউ সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীতেই হয়তো আসে নি। আর ওই যে কিশোরী মেয়েটি সৌরেশের চোখে চোখ পড়তেই যে লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরাল, সেদিন ও কতটুকু ছিল?

ব্যাগ খুলে সৌরেশ বিস্কুট বের করলেন, আর মিষ্টির হাঁড়ি তো বাইরেই ছিল।

সৌরেশ ঘেমে উঠছিলেন। ওরা কী দেখছে, ব্যাগটাকে, না আমাকে, না মিষ্টির এই ভাঁড়টাকে? কোন্‌টাকে নিয়ে ওদের কৌতূহল বেশী? মিষ্টি তো কেউ ছুঁল না! এ-সব পশ্চিমা মিষ্টি তাই ওরা কেউ খায় নি, সন্দিগ্ধ সৌরেশ ভাবলেন, তাই ওরা নখ দিয়ে দানাগুলো শুধু খুঁটে খুঁটে দেখছে, মুখে তুলছে না।

ব্যাগের ভিতরে কী আছে তাই দেখাতেই সৌরেশ যেন সেটাকে খুলে পায়জামা, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি বের করলেন।

না না, ওরা তাও দেখছে না তো, সৌরেশ ভাবলেন, তবে ওদের একাগ্র লক্ষ্যের বস্তু কি আমি? আমি কেন? না, অতীত থেকে উঠে এসেছি। জাল ফেলে বড় মাছ ডাঙায় তুললেও ওরা এই রকমই বিস্মিত হত, ঘিরে ধরত, কেননা মাছটা জলের তলায় ছিল, তাকে আগে দেখা যায় নি। আমিও

তেমনই অতীতের জল থেকে উঠে এসে বর্তমানের ঘাটে দাঁড়ালাম। যে অতীত ওরা চোখে দেখে নি, শুধু তার দু-একটা ঘটনার কথা শুনেছে, ওদের কাছে আমি সেই অতীতের প্রতীক। কেন? সে-সময়ের আরও তো কতজন রয়েছে, কিন্তু তারা ওদেরই চোখের সামনে একটু-একটু করে বদলে গেছে বলে তারা সেকালের অংশ হতে পারে নি, এই শিশুদের কাছে আমিই প্রথম অতীতটাকে টেনে এনে হাজির করলাম। আসলে ছিলুম না বলেই এত পুরনো লাগছে, নইলে সময়ের মাপে কত আর—দশ-বারো বছরের বেশী তো না! ওদের নিজেদের বয়সই তো ওই।

আবার মজা এই, সৌরেশ বিচার করে দেখলেন, ওদের কাছে আমি যেমন সাবেক কালকে নিয়ে এলাম, আমার চোখ দিয়ে যদি দেখি তবে কিন্তু এই ফিরে-আসা অন্য রূপ পাবে। আমি আমার বর্তমান থেকে আমার অতীতে ফিরে এসেছি। এই বাড়ি, এর চুন-বালি, কাঠের হাতল-দেওয়া সিঁড়ি, নোনা-গন্ধ আর উই-খাওয়া কড়িকাঠ, দেওয়ালের সিঁদুরের ছোপ-ছোপ দাগ—এ-সবই আমার চেনা, এই সবই তো আমার সেকাল।

সৌরেশ খেতে বসেছিলেন, পিসিমা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

"খুব রোগা হয়ে গেছিস।"

"তুমিও তো বুড়ো হয়ে পড়েছ।"

"তাই। কম দিন তো হল না। পনের বছর না?"

"না। এগারো।"

মুখে গ্রাস তুলছিলেন সৌরেশ, ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছিলেন। স্নান করে এসে শরীর স্নিগ্ধ, চুলগুলোও তেমন কটা নয়, অনেক রূঢ়তা যেন ঝরে পড়েছে।

"হ্যাঁ, এগারোই তো। সেই যে সেবার—" পিসিমা মনে মনে অন্য কয়েকটা ঘটনাকে পাশে রেখে হিসাব মিলিয়ে নিলেন—কোন জন্ম, বিবাহ বা মৃত্যু—"সেবারই তো তুই গেলি।"

একে একে এ-পরিবারের আরও অনেকের গল্প করলেন পিসিমা। কে পাস করে ভাল চাকরি করছে; কার বিয়ে হয়েছে, অনেক টাকা পণ নিয়ে কিন্তু বউ পছন্দ হয় নি; কার বউ সুন্দরী কিন্তু ছেলেপুলে হয় নি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব। পাড়ার ধিঙ্গি-হয়ে-ওঠা মেয়েদের কথাও বাদ দিলেন না।

সৌরেশ শুনছিলেন, সব হয়তো শুনছিলেন না। অথবা একটা খবরের জন্য উৎকীর্ণ হয়ে ছিলেন।

"এখন এখানেই থাকবি?"

"এখানে—মানে কলকাতায়। বাসা খুঁজে নিয়ে চলে যাব। বদলি হয়ে এসেছি। তুমি জান পিসিমা, আমি আজকাল চাকরি করি।"

"ভাল চাকরি?"

"চলে যায়।"

"তুই তো লিখিসও। তোর কত লেখা বেরোয়!"

"তুমি পড়?"

"পড়ি কই আর, ওরা বলাবলি করে, শুনি। আমার চশমাটা বদলে দিবি টুলু, তোর সব লেখা তা হলে পড়তে পারি।"

সৌরেশ বললেন, "দেব।"

এমন অস্বাভাবিকভাবে খুশী হয়ে পিসিমা বলে উঠলেন 'দিবি?'—যে সৌরেশের খটকা লাগল। চশমা বদলে দে। তোর লেখা পড়ব। প্রার্থনা আর প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয়টা কি ঘুষ?

অনেক পরে অনেক সঙ্কোচ জয় করে সৌরেশ বলতে পেরেছিলেন, "পিসিমা, সতী কোথায়?"

"কোথায় আবার, এখানেই। হতভাগী কোন্‌খানে যাবে? আছে বুঝি কোন একটা ঘরে। ও লুকিয়েই থাকে।"

সৌরেশের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। আছে সতী, এই বাড়িতেই কোথাও আছে, ছোট এই খবরটুকু সৌরেশকে গ্রাস করে ফেলছিল। তাই লজ্জা দ্বিধা জয় করে সৌরেশ বলে ফেললেন, "পিসিমা, সতীর সঙ্গে আমি দেখা করব।"

* * *

"এস।"

দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, সতীকে প্রথমে দেখা যায় নি।

"এস" এই ডাকটুকুকে লক্ষ্য করে সৌরেশ এগিয়ে গেলেন।

জানলার শিক ধরে যে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সতী। রুক্ষ চুল, কৃশ, বিশীর্ণ—কিন্তু সৌরেশ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ঠাহর করতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

"এস," সতী বলল আবার, "ভয় নেই, আমি আর পাগল নেই, সেরে গেছি।"

"কী খুঁজছ? তোমার চিহ্ন? না, সে নেই। আসেই নি।"

"আসেই নি?" প্রতিধ্বনি করতে গিয়েও সৌরেশের গলা কাঁপল।

"না। আসতে পারল কই? আসতে ওরা দিল কই?" সতীর গলা ধরা-ধরা, সেটা ঢাকতেই সে যেন চাপা গলায় হেসে উঠতে গেল, "যাই বল, এলে ও খুব লজ্জায় পড়ত কিন্তু। মা পাগল, বাপ ফেরার।"

সৌরেশ জানলা অবধি এগিয়ে এসেছিলেন। মুখের একাংশে আলো পড়েছিল। সৌরেশ হাত বাড়িয়ে সতীর কপাল থেকে রুক্ষ দু-একগাছি চুল পিছনে ঠেলে দিচ্ছিলেন। সতী সইছিল। সতী বাধাও দিচ্ছিল। "আজও তোমাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না", সৌরেশ বলছিলেন, অভিযোগের সুরে। "আমি পাচ্ছি," সতী বলল মৃদু গলায়, "তোমার কপালের রগ বেরিয়েছে, তোমার কণ্ঠার হাড় উঁচু, তুমি অনেক বদলে গিয়েছ।"

"তার মানে আমার চেহারা?"

সতী বললে, "তুমিও।"

অথচ সৌরেশ এ-কথা শুনেও বললেন, "তুমি তা-ই আছ।"

পিসিমা অবাক হয়েছিলেন। "সতীকে বিয়ে করবি, বলিস কী তুই! ওর অনেক বয়স জানিস?"

"জানি। অনেক বয়স আমারও।"

"ওর আর কী আছে?"

"যা আছে, আমার কাছে তাই ঢের।"

"ওর মাথায় ছিট ছিল জানিস? রোগটা যদি আবার দেখা দেয়?"

"দিক। ও আবার সারবে।"

"আর," পিসিমা এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে বলেছিলেন, "ওর জীবনের সব ঘটনা জানিস?"

"জানি। পিসিমা, আমার কিছুতে আপত্তি নেই।"

* * *

['দিনান্তলিপি' থেকে: প্রথম প্রথম নেহাত মন্দও লাগে নি। দেখলাম, সব ভাঙাই জোড়া লাগে, দাগ হয়তো একটু থাকে, তাকে দেখাও যায় না। সেই আমি, যার নিরুদ্দেশ জীবনের প্রথম কয়েক বছর পথে পথে কেটেছে, ঠিকাদারের আড়কাঠি হয়ে যে গভীর বনে কাটিয়েছিল দশ মাস, পাথরের কোয়্যারিতে ঝুপড়িতে রোদে শীতে বর্ষায় মাসের পর মাস কাটাতে যার

বাধে নি। সে আবার ঘর বাঁধল, আশ্চর্য! হয়তো বাঁধতে হবে, তার বিধিলিপি এই ছিল। সতী যে আমারই প্রতীক্ষা করে ছিল।

মন্দ লাগে নি সতীকে—চেলিতে, চন্দনে, ফুলের সাজে, অলঙ্কারে আর মালায়। ও যে অকস্মাৎ পরম রূপবতী হয়ে উঠেছিল বলতে পারব না, তবে ওকে নববধূর বেশে যেমন দেখিয়েছিল, তাকে এক কথায় বলতে পারি: করেক্ট। যেমন দেখানো উচিত।

এই বাসায় এলাম। বারান্দায় এই লতাটা ঝুলিয়ে দিয়েছে সতী, ঘরগুলো ওর রুচি দিয়ে সাজিয়েছে।

আমি মজাই পেয়েছিলাম, আমার ভালই লাগছিল। সতী নিজেই সব করত, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কোথায় কোন্ নীলামে কী মেলে, সব খবর রাখত সতী, টুকিটাকি আসবাব কিনে আনত। জিজ্ঞাসা করত, 'ভাল হয় নি?' আমি বলতাম, 'খুব ভাল।'

আমি তখন হয়তো এই বারান্দায় চাল ছড়িয়ে পায়রাদের খেতে দিচ্ছি। খারাপ কিসে এই নিস্তরঙ্গ জীবন—সকালে ওঠা থেকে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা, অনেকগুলি নিয়ম আর সংযম?

ছোট্ট একটি ঘোমটা থাকত সতীর কপালে। পরিমিত, সংবৃত। সুন্দর একটি সিঁদুরের ফোঁটা ও যত্ন করে পরত। আমার ভাল লাগত। আমি দেখতাম। ছাতে অন্ধকারে যার অভিসার ছিল, এ যদিও ঠিক সে নয়, তবু তার এই রূপই বা মন্দ কী!

আমার নেশার মত লাগছিল। আকৈশোর অস্বাভাবিক জীবনের আতিশয্য দেখে যার ধাঁধা লেগেছে, সে দিনকতক স্নিগ্ধ প্রদীপের আলোয় চোখ জুড়িয়ে নিক।

সকালে পোষা কুকুরটাকে নিয়ে পার্কে দৌড় করাতে যাই, ফিরে দাড়ি কামাই, স্নান সারি, অফিসে দৌড়ই। তার পর বারান্দা আছে, ঈজি-চেয়ার আছে। সন্ধ্যার পর বেরনো বড় হয় না। দেখেছি, সতী ওতে বড় খুঁত খুঁত করে।

সতী আমাকে ঘর চিনিয়েছে। এই ঘরের ইট-চুন-সুরকির দেয়াল গড়েছে কোন মিস্ত্রী, কিন্তু এই দেয়ালের ভিতরে অদৃশ্য আর-একটা দেয়াল আছে, সেই দেয়াল সতীর রচনা। ঘাসে ঘাসে ফড়িং ওড়ে, অনেকে ছুটে ছুটে তাদের ধরে, কাচের বয়েমে রাখে। সতীও আমাকে ধরে এই ঘরে পুরেছে।

সতী একবারই ছুটেছিল, আমাকে ধরতে। একবারই সে নির্লজ্জ হয়েছিল। আমার বাইরের ঝোঁককে ভিতরে ঘুরিয়ে সে শান্ত হয়ে গেছে। সতী শান্ত সুন্দর নম্র ভীরু। সতী এখন বধূ, অনায়াসেই লজ্জিত। সতী গর্বিতও। সতী মা হবে। একবার হতে গিয়েও পারে নি, তাই আবার হতে চেয়েছে। হতে চলেছে। সতীর ইচ্ছাকে আমি বাধা দিই নি। সতীকে আমি বাধা দিতে চাই না।]

এই পর্যন্ত লিখে, সুখে ঔদাস্যে সৌরেশ হয়তো হাই তুলেছিলেন।

উপসংহার

না, পুরনো কান্না নয়, নতুন কান্না।

সৌরেশ চমকে উঠলেন, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে একটি ভয়, একটি অনিচ্ছা, একটি অসহায়তা ভূমিষ্ঠ হল।

এই ভয় একদিন সাহসে পরিণত হবে, অনিচ্ছার রূপান্তর ঘটবে তীব্র জীবনতৃষ্ণায়, অসহায়তা পরিণত হবে একটা প্রতিবাদে আর একটা জ্বালায়।

তারপর আবার সাহস মিলিয়ে যাবে, প্রতিবাদ থামবে, আর জ্বালা জুড়িয়ে জীবন হবে নিস্তরঙ্গ দীঘি।

সৌরেশ যা হয়েছেন।

সৌরেশ যা হয়েছেন, এই শিশুও তাই হবে, করকোষ্ঠী বিচার না করেই সৌরেশ বলে দিতে পারেন—এখনই। নবজাতকের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

আমরা মৃত্যু থেকে উঠে আসি বলেই জন্মের মুহূর্তে আমাদের অস্বস্তি এত। জলের মাছ ডাঙায় পড়লে যেমন করে। তারপর জীবনটা সহজ আর স্বাভাবিক যখন হয়ে ওঠে, তখন মৃত্যুর মধ্যে ফিরে যেতে ভয় পাই। আলোয় থাকলে আলোই অভ্যস্ত হয়, অন্ধকারে থেকে থেকে অন্ধকার।

আমাকে এই ভয় জয় করতে হবে—সৌরেশ উচ্চারণ করলেন স্পষ্টস্বরে, যেন অনুপস্থিত, অন্তত অদৃশ্য, কোন শ্রোতাকে শোনালেন।

সতী চুপ করেছে। তার কান্না করুণ গানের মত এক সুরে বাজছিল, এখন থেমেছে। এতক্ষণ যেন অনেক দূরে, অন্ধকারে কয়েকটি তারে সে অনিশ্চিত হাতে ছড় টানছিল, ফরমাস পুরল, সে থামল।

সে ঘুমিয়ে পড়ল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সৌরেশ বারান্দা পার হয়ে গেলেন। তাঁর ভয় করছিল—এ-ভয় স্নায়ুজ।

বন্ধ দরজায় সৌরেশ টোকা দিলেন। দরজা খুলল। ফাঁক পেয়েই বন্দী খানিকটা আলো ঠিকরে পড়ল বাইরে। নতুন কান্নাটা এখন আরও স্পষ্ট। ভিতরটা আবছায়া দেখা যায়। সতীর বুক অবধি চাদরে ঢাকা, চোখ দুটি নিমীলিত, ছোট বুকে ছোট ছোট ঢেউ। ঠোঁটের কোণে কষ-কষ রক্তের দাগ। মুখ পাণ্ডুর।

পিসিমা এসে দরজা আড়ালে করে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখেই হয়তো ভয় পেয়ে আলোর রেখাগুলো পিছিয়ে ফের ঘরে ঢুকল।

"খবর কী?" সৌরেশ জিজ্ঞাসা করলেন ফিসফিস করে।

পিসিমা বললেন, "খবর ভাল। ছেলে।"

সৌরেশ তবু বোবা হয়ে কালা হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন।

"দেখতে তোর মতই হবে," পিসিমা আস্তে আস্তে বললেন। ওর কাঁধে হাত রাখলেন, "বংশের ধারাটা রইল।"

আর ওই কথাটায় সৌরেশ চমকে উঠলেন। মাথা হেঁট করে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। কনকনে হাওয়া লাগল মুখে চোখে। সৌরেশের মনে হল, দম বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

ঘটুক না, ক্ষতি কী! বংশের ধারা তো থাকবে। বৃত্ত সম্পূর্ণ। মৃত্যু তো সতীরও ঘটেছে। এইমাত্র ও-ঘরে তার শান্ত-শয়ান শব দেখে এলাম। এর পর যে সতী উঠবে, চলাফেরা করবে, সে অন্য একজন। জননী, ধাত্রী।

এই সন্তান সৌরেশ চান নি। সতী চেয়েছিল।

তিতির পাখির মত যে স্মৃতির ফাঁক উড়ে এসে এতক্ষণ তাঁকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল, সৌরেশ তাদের বিদায় দিলেন। তোমরা যাও। আমি একটু একা হব। আমার নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকী আছে।

যেখানে সৌরেশ এসে থেমেছেন, ওই শিশু সেখান থেকে চলবে। ওই শিশু কে? এইমাত্র যে হল, যে দেখতে তাঁর মত—পিসিমা বলেছেন।

"ও আমার মত," সৌরেশ অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন, কিন্তু আমি কার মত?

আর সেই মুহূর্তে সৌরেশ নিজের প্রতি, জীবনের প্রতি তীব্র একটা ধিক্কার বোধ করলেন।

আমি কার মত? এই প্রশ্নের উত্তর জানতেই তো আজ সারা রাত এখানে কাটিয়ে দিলেন। উত্তর পান নি।

যে ধ্রুবতারা আকাশে জ্বলছিল, সৌরেশ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কার মত? আমার পিতৃ-পিতামহের মত? তবে আমি হলাম কেন? হুবহু একই যদি হবে, তবে আমার অর্থ কী?'

ধ্রুবতারা উত্তর দিল না, এখন সময়কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সৌরেশ বললেন, বুঝেছি। বিন্দুমাত্র অর্থ নেই। আমরা একই জায়গায় থাকি। তুমিই শুধু বদলাও। এক-একবার এক-একজনকে চাও। কিংবা আলাদা-আলাদা মুখোশ পরিয়ে একই মানুষকে অনেক মানুষ করে তোল।

বৃথাই আজ উজান স্রোত ঠেলে ঠেলে ক্লান্ত হয়েছেন সৌরেশ। মিছিমিছি ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন টুলুকে। মনোবিজ্ঞানী ডাক্তারের মত সৌরকে জেরায় জেরায় বিব্রত করেছেন। ওদের দুজনের কেউ তো সৌরেশ নয়। যদিও সৌরেশ ওদেরই পরিণতি। 'ওদের পরিণতি আমি, কিন্তু আমার পরিণতি কী?' সৌরেশ এখন আর কাকে পাবেন, তাই জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে। সেই প্রশ্ন বিষাক্ত একটা পিঁপড়ের মত সৌরেশকে দংশন করল। বিবর্ণ, পাংশু সৌরেশ কাঁপা কাঁপা হাতে দিনান্তলিপির শেষ অংশ লিখতে বসলেন :

["তিনবার লিখেছি—আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত। ক্লান্তি এই শেষ রাতে আমার সত্তার সওয়ার হয়েছে, সত্তা ওকে ফেলে দিয়ে ছুটতে চায়, ক্লান্তি পড়ে না। আমাব পরিণতি কী, একটু আগে জিজ্ঞাসা করেছি নিজেকে কিন্তু এখন জানি, এই ক্লান্তির পরিণতি মৃত্যু-ইচ্ছা। সে আমার সত্তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এক গহ্বরে ফেলে দিতে চাইছে।

এ-লেখা এর পরে যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এই বিচিত্র ইচ্ছাটির কথা জেনে অবাক হবেন। হঠাৎ আসে নি। এই ইচ্ছা মনের গোকুলে গোপনে বেড়েছে।

যুক্তি দিয়ে একে বোঝানো যাবে না। প্রায়-প্রৌঢ় যে-পুরুষ অনেক লড়াই করে বেঁচে এল, সে এখন জানে-প্রাণে মারতে চায় কেন? আপাত-দৃষ্টিতে তার এই মুহূর্ত তো শান্তির—জীবনের ভুল-ভ্রান্তি সব চুকে গেছে। তার এই মুহূর্ত পরিপূর্ণও, বৈষয়িক অর্থে নির্ভাবনা : পুন্নাম নরকের ভয়মুক্ত ; প্রসবে শ্রান্ত কিন্তু নির্ভার, সুখ-সুপ্ত পত্নী—তার এবারকার মাতৃত্বে লোকলজ্জা নেই। তবে?

'এই তবে-র জবাব আমি তো জানি না। ঘুম পায় কেন, এই প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে? পায় বলেই পায়। কিংবা অবসাদে। অবসাদে যেমন ঘুম পায়, আমাকেও তেমনই মৃত্যুতে পেয়েছে।

অবসাদ সাপের বিষের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার রগে-রগে, আমার রক্তের কণায় কণায়। আমি ঢলে পড়ব।"]

এইটুকু লিখে সৌরেশ আর এগোন নি, বড় বড় হরফে একটি উদ্ধৃতিমাত্র দিয়েছিলেন—"নাউ মোর দ্যান এভার সীমস্ ইট রীচ টু ডাই।" কাগজের বাকী অংশ সাদা ছিল।

সৌরেশ লুকনো একটা শিশি বের করেছিলেন দেরাজ থেকে ; লেবেলটা পড়ে নিয়ে শক্ত মুঠোয় ধরে সেই শিশিটাকেই উদ্দেশ করে বলছিলেন, 'আত্মহত্যা কি আমার রক্তে? আমার মা-বাবা দুজনেই আত্মহত্যা করেছিলেন মনে পড়ছে। তাঁদের মরবার কারণ ছিল একটা কিছু নিশ্চয়ই। এখন মনে পড়ছে না। হয়তো কোন কারণই ছিল না। আসলে মরবার কারণ থাকে বলে তো লোকে মরে না, বাঁচবার কারণ থাকে না বলেই মরে। আমার বাঁচবার কারণ নেই। আমি তাই মরব।'

হাতের শিশিটা থর থর করে কেঁপে উঠল, ঈষৎ পানের ফলে কণ্ঠস্বর যেমন জড়িত হয়, সেই রকম কণ্ঠে সৌরেশ বলে গেলেন, 'আশার পূরণেও নৈরাশ্য আসে। যুধিষ্ঠিরের যেমন এসেছিল। কুরুক্ষেত্রে জয়ের পর বাঁচার আর-কোন হেতু তিনি খুঁজে পান নি বলেই মহাপ্রস্থানের পথ ধরেছিলেন। তাঁর আর-কিছু করার ছিল না। তিনি সব পেয়েছিলেন। আমি কিছু পাই নি। আমারও কিছু করার নেই। এইখানে আমাদের মিল।'

হাওয়ার ঝাপটা লেগে সৌরেশের শরীর কেঁপে গেল।—'আমি কী হতে চেয়েছিলাম? জানি না। কী হতে পেরেছি? জানি। কিছুই হতে পারি নি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সৌরেশ বললেন, 'হায় রে!'

'হায় রে,' সৌরেশ আবার বললেন, 'আমি কয়েকটি সংস্কার আর অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। যে অভ্যাস সকালে উঠে দাড়ি কামায় (ব্রাশ ঘষে ঘষে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা তৈরি করা ছাড়া যে কাজের সবটাই বিরক্তিকর), বাজারে যায়, অফিস করে, বাড়ি ফেরে। আবার সকাল, আবার বাজার। আবার অফিস, আবার বাড়ি। বাজার, অফিস, বাজার, বাড়ি। তাও কি আগের মত তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারি! গর্দানে মাংস বেড়েছে, ঘাড় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাইতে পারি না। আর ভুঁড়ি। প্রথম যখন পেটে চর্বি জমে, ভুঁড়ি হয়, তখন এটাকে কী ঘৃণাই না করেছি! এখন গা-সহা হয়েছে, এখন

ওই ভুঁড়িটাও আমি। আমি না হলেও আমার একাংশ। এর পর আমার প্রভু হবে। এখনও তবু নড়া-চড়া করতে দিচ্ছে। কিছুকাল পরে তাও দেবে না। পাকস্থলী ছাড়া দেহের কোন যন্ত্রের কোন দাবি থাকবে না, এখানে দাঁড়িয়ে সে-দিনটিকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তবে কেন বাঁচব?'

কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'ভালবাসার জন্যে', সৌরেশ চটে গিয়ে ঠক করে শিশিটা রেখে দিয়ে টেবিলে চটাস করে একটা চাপড় মারলেন। যেন "ভালবাসা" কথাটাকে মশার মত করে মারবেন। বললেন, "ফুঃ! ভালবাসা বলে কোন বস্তু আছে নাকি? সবই প্রবৃত্তি। সতী শুনলে আঘাত পাবে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা অন্য যে-কোন মেয়ের সঙ্গে হতে পারত। যে-কোন। এনিথিং ইন্ এ স্কার্ট। ছিঃ! না, সাত বছর বয়সে শিশুর যেমন দাঁত নড়ে, ভালবাসায় বিশ্বাস আমার তেমনই কবে নড়ে গিয়েছে, মনেও নেই।"

সৌরেশ বলতে শুরু করেছিলেন জোরে জোরে, কিন্তু আপনা থেকেই তাঁর গলা গাঢ় হয়ে এল—'ভালবাসায় বিশ্বাস খুইয়েছি বলেও তো আমি মরতে চাই। ভালবাসা আমি দেখি নি, পাই নি। তবু যতদিন বয়স ছিল ততদিন ভেবেছি, ভালবাসা এখানে নেই কিন্তু অন্য কোনখানে আছে। আমি পাই নি, ওরা পেয়েছে। আমিও একদিন পাব। এখন তো জানি কোনদিনই পাব না। আর পাবই বা কবে? বয়স নেই, সময় নেই।

'থাকলেও পেতাম না। ভালবাসাই যে নেই। যাকে ভালবাসা বলি, তা কয়েকটি গ্রন্থির ক্রিয়া, কয়েকটি স্নায়ু-পেশীর প্রতিক্রিয়া। আর কিছু নেই। কুকুর যেমন অন্য কুকুরের গন্ধ পেলে ডেকে ওঠে, সাড়া দেয়, আমাদের রক্ত-মাংসও তেমনই কুকুরস্বভাব, অন্য রক্ত-মাংস কাছাকাছি পেলেই ডেকে ওঠে, সাড়া দেয়।'

দীর্ঘ স্বগতোক্তি করে সৌরেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, অতএব টেবিলে কনুই রেখে করতলে মুখ ঢেকে রইলেন কিছুক্ষণ। অবশেষে পিঁপড়েও শুনতে পায় এমন গলায় বললেন, "আমি এ-সবই জেনেছি। জেনেছি বলেই তো মরতে চাই। এ-জগতে আমার শেখার আর-কিছু নেই। যে ক্লাসের পড়া শেষ হয়ে গেল, সে-ক্লাসে কি কেউ সাধ করে পড়ে থাকে?"

যে-জড়তা এসেছিল তাকে ঝেড়ে ফেলবেন বলেই উঠে দাঁড়ালেন সৌরেশ, জানলার সামনে বুকের ওপর দুই হাত জড়ো করে দাঁড়ালেন। একে একে

অনেক মুখ মনে পড়ে গেল, অনেক নাম, যাদের কাছে জীবনের মানে শিখে নিয়েছেন। টুকরো টুকরো শিক্ষার যোগফল আজ মৃত্যুর সাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোহিতদা আর লতিকাদি আর মায়া। লতা বউদি, শচীপতি, বিজন, নয়ন, পাখি আর মালা। আর সতী। নিজের মধ্যে সকলের ছাপই দেখতে পেলেন। কেউ বেপরোয়া ইচ্ছা, কেউ কামনা, কেউ ক্লৈব্য বা অক্ষমতা, কেউ বিদেহী রহস্যের প্রতীক। কেউ ভীরু, কেউ ক্রূর সমাজের বলি। কেউ করুণার কাঙাল, কেউ এতটুকু বাসার।

বাসনা, ভীরুতা, সাহস, লোভ, লাম্পট্য আর মোহহীনতা, নিস্পৃহতা, কাঠিন্য আর আশা, ওদের কাছ থেকে তিল-তিল নিয়েই তো সৌরেশের মন গড়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিতৃষ্ণায় দেহ শক্ত হল সৌরেশের। তাঁর মনও তবে তিলোত্তম, তাঁর নিজের নয়?

কোন্‌টা তাঁর? সেটা পরখ করতেই যেন সৌরেশ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহ? এই চেহারা? এ-ও তাঁর নয়। মুখের ছাঁদে আর রঙে, নাকের গড়নে আর ধরনে তাঁর মা আর বাবার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে; কে জানে, হয়তো আরও কত বিস্মৃত-সুদূর পিতৃপুরুষের! সব পরের কাছ থেকে পাওয়া আব নেওয়া। না, এই চেহারা—যে-মুখ তিনি সাবান দিয়ে ঘষেন, যে-চুল ব্রাশ করেন পরিপাটি করে, একটি একটি করে যে পিঠের ঘামাচি মারেন—তাঁর নয়। তিনি শুধু তাঁর বলে মেনে নিয়েছেন।

"কিছুই আমার নয়," শিশিটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে সৌরেশ বললেন, "না মন, না চেহারা। সব যেন চাঁদা আর চ্যারিটি। ওরা অনেকে মিলে যা তৈরি করে দিল, আমি বিনাবাক্যে তাই নিজের বলে গ্রহণ করেছি। এতক্ষণ জ্বলছিলাম, বলছিলাম, জীবনে সত্যিকার কিছুই পাই নি। বিশেষ কিছু হতে তো চাই নি। সাধু না, সন্ত না, কৃতী না, যশস্বী না। সামান্য যা সাধ ছিল, তাও পূর্ণ হয় নি: আজ জেনেছি আমি 'আমি'ও হতে পারি নি।"

দ্রুত ব্যস্ত হাতে সৌরেশ শিশিটার ছিপি খুলতে লাগলেন।

* * *

তবু পরদিন সকালে সৌরেশের ভূলুণ্ঠিত দেহ আবিষ্কৃত হয় নি। দিনের প্রথম কোমল রোদ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে তাঁকে আস্তে আস্তে ঠেলছিল। উঠতে বলছিল। বিস্মিত ব্যথিত চঞ্চুই পাখিরা চেয়ে ছিল। তারাও উঠতে বলছিল।

জানলার বাইরের নিমফুলের হঠাৎ-গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সৌরেশকে চোখ মেলতে বলছিল।

ঘুম ভেঙে সৌরেশ সবিস্ময়ে হাতের মুঠোর শিশিটার দিকে চেয়ে রইলেন। ছিপিটা দেখছি শেষ পর্যন্ত খোলা হয় নি! আমি তবে মরি নি!

"আমি মরি নি," সহসা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সৌরেশ, আবার অবাক হয়ে ভাবলেন, "কিন্তু আমার মরবার ইচ্ছেটা মরল কখন? আমি আমিও হতে পারি নি, এ-কথা জেনেও যদি মরে না গিয়ে থাকি, সে কি এই কারণে যে আমি এ-ও বুঝেছিলাম; আমি বলেই কিছু যখন নেই তখন মারব কাকে? মারার কোন মানেও নেই। আত্মা যদি না থাকে তবে কাকে হত্যা করব? অকিঞ্চিৎকর এই শরীরটাকে? মজুরি পোষাবে না।"

ফুর ফুর করে হাওয়া এল ঘরে, টুকরো টুকরো অনেক কাগজ উড়তে লাগল। হঠাৎ পরিবেশটাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হিমে-ভেজা চকচকে পাতায় পাতায় আলো নাচছে। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ। আর চাঞ্চল্য। ওদিকের ঘর থেকেও সাড়া আসছে। বারান্দায় কারা হাঁটছে! বাইরের রাস্তায় চলার উল্লাসেই একটা গাড়ি হর্ন দিল। ফিরিওয়ালা চিৎকার করে সওদা হাঁকছে। ব্রণ খুঁটতে গিয়ে কেটে গেল; সৌরেশের মুখে এক ফোঁটা টকটকে রক্ত। জীবন টকটকে। এক ফোঁটা ঘাম বুকের রোমকূপ থেকে উঠে আস্তে আস্তে গেঞ্জির তলা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। একটা নিঃশব্দ ছারপোকা হাঁটছে যেন। ঘাম ওপরের ঠোঁটে, গোঁফের কিনারেও। নোন্‌তা। জীবনেব স্বাদ নোন্‌তা। একবার ও-ঘরে যাই। ওদেব দেখে আসি, সতী কেমন করে বাচ্চাটাকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। মমতার স্তূপ। নতুন বাচ্চা। সৌরেশের মত। ও-ও কিছু হবে না। কিন্তু হয়েছে। কিছু হয় না, কিন্তু হতেই থাকে। সংসারের নিয়ম।

সন্দেহ নেই এই সংসার বড় ছোট, অপরিসর, কৃপণ। স্বাদহীন, হয়ত নিরর্থকও। আমরা তাই বৈচিত্র্য খুঁজি, বদলাই। আমার সেই পরিবর্তনটাও এক হিসেবে হত্যা। যারা ফাঁসিকাঠে ঝোলে, হত্যাকারী কিন্তু তারা একাই? আমাদের অগোচরে আমরা সবাই হত্যাকারী, সকলের করতলই মৃত্যুর রক্তে সিক্ত। এই যেমন আমি। আমি সৌরেশ, যে হত্যা করেছে তার শিশু-স্বরূপ টুলুকে, পরে কিশোর সৌরকে, সে এখন প্রবীণ পিতা। এই পিতাকেই আমি শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম।

জীবন কি তবে হত্যার পর হত্যা দিয়ে গাঁথা—ভয়ঙ্কর একটি নৃমুণ্ডমালা? কী জানি! কিন্তু মধ্য অঙ্কে যবনিকা ফেলে সর্বনেশে সাধ আমাকে পেয়ে বসেছিল কেন? আমার বিচার যদি ঠিক হয়, তবে তো আরও অনেক হত্যা করব, এই আমার নিয়তি। পিতামহ-সৌরেশ, একদিন এসে এই পিতা-সৌরেশকেও হত্যা করবে—এই বিধিলিপি। সেই পিতামহের ছায়াপাত কি ইতিমধ্যেই ঘটে নি, আমার মনে, আমার মুখের রেখায়? তার হাতেই তো একদিন মরব, তবে আর নিজেকে নিজে মেরে কাজ কী! হয়তো কাল রাত্রেই আমার অবচেতনায় এই সত্যটা ধরা দিয়ে থাকবে, তাই শিশিটা আর মুখের কাছে তুলি নি।

হয়তো এই বিচারবুদ্ধি দেখা দেয় বলেই আমরা শেষ পর্যন্ত একটা আপোস-রফা করি বেঁচেই চলি।

"বেঁচেই চলি," সৌরেশ অতি ধীরে উচ্চারণ করলেন, "অর্থাৎ মরে থাকি।"

সৌরেশ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনের রাস্তাটা ছোট সর্পিল গলি। খানিক গিয়ে থেমেছে। কিন্তু ওখানে যদি যাই, দেখব থামে নি, বাঁক নিয়েছে, আবার খানিক দূর অবধি গিয়েছে। আবার বাঁক। বাঁকের পর বাঁক।

"যদি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই," সৌরেশ আপন মনে বললেন, "তবে শেষ পাব না, চলতেই থাকব। দিগন্তের পারে দিগন্ত দেখব। কিন্তু থামা হবে না, কেন না কোথাও পৌঁছব না। আমরা কোথাও পৌঁছই না," সৌরেশ নিজেকে বোঝালেন, "পৌঁছনো নেই বলেই পৌঁছনোর প্রয়াস আছে। চলা আছে। চলারও অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ খোঁজা আছে।"

হাতের মুঠিতে তখনও শিশিটা ধরা ছিল। সমস্ত জোর একত্রিত করে সৌরেশ সেটাকে সামনের বাগানে ছুঁড়ে দিলেন।